# দর্পন

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৬

# আমাদের কাছে আপনার টাকা আপনারই থাকছে, সুদ-এ দ্রুত বাড়ছে, ভাবতেও সুখ !
# কিন্তু সেই টাকা সুখী-সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গ'ড়ে তোলার কাজে লাগছে এ'গৌরবের তুলনা কোথায় ?

আপনার টাকা কৃষি-ঋণ হয়ে যাচ্ছে কৃষকের কাছে। জমি থেকে এক ফসলের আয়গায় তিনটি ফসল উঠছে, ফলন বাড়ছে বহুগুণ।

আপনার টাকা খাটছে বিভিন্ন চা-বাগিচায়। উৎপাদন বাড়ছে, রপ্তানি থেকে আরো বেশি বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পথ খুলে যাচ্ছে। ২৫০০০-এরও বেশী চা-শ্রমিকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

আপনার টাকা ঋণ হিসেবে পৌঁছুচ্ছে তাঁতী-জুতোর-কামার-কুমোর-কারুশিল্পী, গ্রামীণ কারিগরদের কাছে। তাঁদের পরিবারের ভরণ-পোষণ ছাড়াও গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

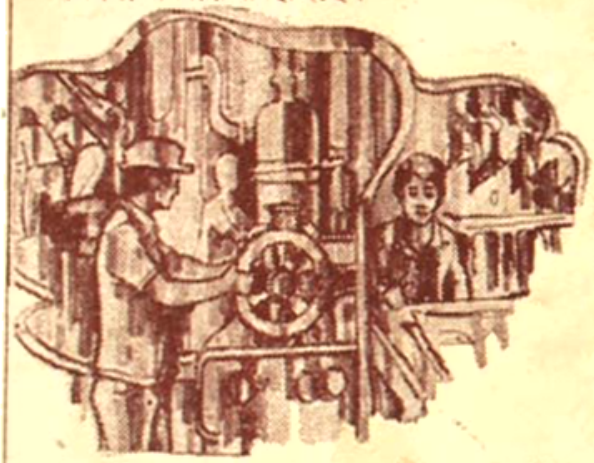

আপনার টাকা মূলধন যোগাচ্ছে ছোট-মাঝারি নানা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের। কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। অনেক লোকের রুটি-রুজি ছাড়াও, নতুন কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই যে বহুমুখী প্রচেষ্টা, যার উৎস ও শক্তি আপনার টাকা, তা পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। আপনার টাকা থেকে আকর্ষণীয় সুদ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধির সুফলও আসবে আপনার কাছে বাড়তি পাওনা হিসেবে। শুধু তাই নয়, সুখী-সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গ'ড়ে তোলার কাজে আপনি নিজেও যুক্ত রয়েছেন এই পরম গৌরবের পরিমাপ কি টাকার অঙ্কে হয় ? আপনিই বলুন না !

*আমাদের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে আরো টাকা জমান—আরো তাড়াতাড়ি সুখী-সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গ'ড়ে তুলুন !*

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পূর্ণ বিবরণের জন্য আমাদের হেড অফিস অথবা যে কোন শাখা অফিসে খোঁজ নিন।

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive-UIB/67/78

# আনন্দময়ীর আগমনে

শরৎ এল তার অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে।
শারদীয় উৎসবের আনন্দঘন দিনগুলির জন্য
উন্মুখ হয়ে থাকে সকলে। বরাভয়দায়িনী মায়ের
আবির্ভাবে সব বাধাবিঘ্ন অপসারিত হোক,
দুঃখ দারিদ্র্য মুছে যাক, আপনার সকল আশা
ফলবতী হোক, জীবনে আসুক নিরাপত্তা আর
সুরক্ষা, এই শুভক্ষণে এল আই সি-র
এই একমাত্র কামনা।

লাইফ ইন্সিওরেন্স
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

জীবনবীমার কোনো
বিকল্প নেই!

deCunha/LIC/2 BN

# আনন্দময়ীর আগমনে....

পুজোর মাস কয়েক আগে থেকে পড়ুন এই

সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটা, যার দিব্যি দুই ভাই তাড়া এ বছর আর কেউ আনন্দে দুঃখানা তুলি নেচে উঠবেন বলে মনে হয় না। কলকাতার নিষ্পাপ মধ্যবিত্ত এবং পবিত্র শ্রমজীবী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে মূল্যবৃদ্ধিচক্রের এমন আকাল পুজো নেই মধ্যে আর আসেনি।

এবার পুজোর কার্নিভাল আবার কার্নেভিনা হয়ে উঠবে। কলকাতা শারদোৎসবে বহু ও দূরাঞ্চল থেকে এসে পড়বেন অগণিত মানুষজন, আসবেন বিদেশীরাও—প্রশ্ন কেন? ১৬৯০ থেকে [ জোব চার্নক ] ধরলে কলকাতার বয়স সবে ৩০০ হতে চলেছে। লণ্ডনের ইতিহাস—শুরু খ্রষ্ট-পূর্বাব্দে: আর রোম-টোমের কথা উঠলে কলকাতা তো কবে-কা যোগী তবু কেন এই "চলো কলকাতা" পাগলামি? শীতের সাইবেরিয়া থেকে আসে সোনালী ঠাসের দলবল। এত চুলো থাকতে কেন যে বেছে বেছে কলকাতায়—এর উত্তর রহস্যাবৃত। "চলো কলকাতা" পাগলামির উত্তর কিন্তু এক কথায় দেওয়া যায়। এবং তা হল এমন শহর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.....

সপ্তাশ্চর্য ভারতবর্ষে শহর তো বিস্তর। কিন্তু কলকাতা কলকাতাই। প্রাদেশিকতার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে মাথা উঁচু রেখে বলা যায় লণ্ডন, প্যারী, পেত্রোগ্রাদ, ভিয়েনা কি রোমের মতই এই আর এক শহর শতাব্দীর পর শতাব্দীর আগুন হাকে পোড়াতে পারে না।

যার সুরু নেই অন্তিপরিধির মধ্যে: গ্রীক উপকথার সেই ফিনিক্স পাখিটি এ যেন.....

* কলকাতা পুরসভার শারদ অভিবাদন গ্রহণ করুন। *

# দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৬

## সূচীপত্র


কবিতা / হিউই আলী / শক্তি চট্টোপাধ্যায় শেখ আমাইরা নবারুণ ঘোষ
শৈলেনচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫—৭
কথা / গণতন্ত্রের মিঠাই / অমার্য মিত্র ৮-
গণতন্ত্র কি বিপন্ন / অরুণাভ রায় ৯
পশ্চিমবঙ্গের অবলুপ্তপ্রায় বিরোধী দল / শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
অস্থিরতার রূপক / কবী চক্রবর্তী ১৩
স্বাধীনতা ও শিক্ষক / মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৫
জমানের পর ভরল সাম্রাজ্যবাদের পতন / তপন বসু ১৭
প্রবন্ধ : বিস্মৃতিভূষণ / হরিসাধন সেন ২৩
আত্মা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান / শ্রীবিকাশ ২৮
১৮৫৭-র বিদ্রোহ কি শিক্ষক সিপাহী বিদ্রোহ / অশোক চট্টোপাধ্যায় ৩৩
ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে টানাপোড়েন / রূপেন রায় ৩৮
চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ / মিহির আচার্য ৪৭
সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ পদক্ষেপের পথে মহাচীন / শ্রীপতি বন্দী ৫০
ভারতের অর্থনীতি ঘুন / কালীপদ বিশ্বাস ৫৯
আইন মানবি মানব / অচিন্ত্য চক্রবর্তী ৬৩
প্রভুজী চন্দ্রযান ও অন্য / চিত্র ঘোষাল ৬৭
আবার হিমালয় : এবার ডুয়ার্সের পথে / অরুণ ঘোষ ৭০
রাজনীতি ও অবদমনবাদ / নারায়ণ চৌধুরী ৮২
পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ / সুব্রত সেন ৮৭
আমাদের অগ্রগতির পূর্ব পর্বগুলি / গুরুদাস ভট্টাচার্য ৯০
ভয় ও রাজনীতি ( একটি সাইকিয়াট্রিয়ার গল্প ) / সিপ্রিয়ান এক্কোয়েনসি ১২
তিন দুনিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্ববিরোধ / রবীন্দ্রনাথ মল্লিক ৯৭
ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের স্থান / কল্যাণ ঘোষ ১০৭
সৎ সিনেমার স্বপক্ষে / বুদ্ধদেব রায় ১০৯
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গতি ও দুর্গতি / সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩


প্রচ্ছদচিত্র/বীরেন মজুমদার ● রেখাচিত্র / বিভাই যে ● রাখচিত্র / অমল চক্রবর্তী

# মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সবত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় মর্ম ও বিস্তারের অপচয় বন্ধ করুন চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সরকার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা স্নায়ুপীড়নকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সংযমী আচরণে উদ্বুদ্ধ করা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আবেদন, শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

P27652

দর্পণ
শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৬

## গণতন্ত্র

রিউই অ্যাশী

যখন ওরা গণতন্ত্রের কথা বলে
আমি অবাক না হোয়ে পারি না।
পুঁজিপতিদের বেশে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাবে
গণতন্ত্রী বলে, কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ অনুন্নত দেশকে
শোষণ কোরে ওরা একচেটিয়া পুঁজির অধিকারী সাজে,
ওরা যা মূল্য ধরে অনুন্নত দেশগুলো বাধ্য হয় তাইই দিতে দিতে।
ধনিয়ার কৃষক অথবা শ্রমিক যদি মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে
সমাজ মানুষের জন্য এবং যদি সর্বহারা শ্রেণীর শাসনের কথা
ভুলে যাওয়াই হয়, তবে গণতন্ত্র সেখানেতে বাঁচে কেমন কোরে?
ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি জোর দেওয়া হয়
এবং আমাদের দেশে যদি 'মুক্ত ও গণতন্ত্রী সমাজের' কথা
বলা হয়, গণতন্ত্র কথাটি যদিও শোনা যায়
বহুদিন হোতেই, যদিও কথাটি শোনা যায়
সেই প্রাচীন গ্রীসেই
তবুও সত্যটি আজ শোষকী কথাই,
শোভা পায় তাহার মুখেতেই।
আসলে গণতন্ত্র হারিয়েছে তার প্রকৃত অভিধান।

আজ আমি চারদিক কাউন্টির দুটি কমিউন বিদেতে দেখেছি,
প্রতিটি মানুষ সেখানে শান্তভাবে একসাথে
দিনের কাজ কোরে যায়—কেউই করেনা তাদের মনুষ্যত্বকে,
তাদের প্রেরণা পায় তারা তাদের নিজ অন্তর হোতেই।
কাজ তারা কোরে যায় গ্রীতি প্রেমের
পরিকল্পনা মাফিকই। ভবিষ্যতের জন্য
পরিকল্পনা করে তারা এবং কাজ করে তারই কালের জন্যে।
মনে তাদের কোনো উদ্বেগই নেই, নেই কোনো উদ্বেগের
কোনোই কারণ।
ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা ওরা ভাবেনা কেউই।

পাশ্চাত্যের যান অনুযায়ী তারা নয়তো।
তবুও প্রচণ্ড ঘটিয়েই। জীবনে জোয়ার টানিয়ে তারা,
জোরদারে তাদের অবস্থান—
এ নিয়ে আদৌ মাথা ব্যথা নেই তাদের,
তাদেরো জোয়ার আছে তারা, তেমনই যা ভাটা।
তাদের মধ্য দিয়ে আসি তাতারার রেলগাড়ীর দিনে,
মধ্য লাইন দিয়ে একের পর এক
মালবাহী ট্রেন যাচ্ছে-আসছে উত্তর-পূব জোরে।
জাতীয় সড়ক ধরে ধাবমান ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্রেলার
চলছে বিরাম পরিহারেই। সারা দেশ জুড়ে বিকশিত হোচ্ছে
বাজার শিল্প মূলের মতোই। কিন্তু রবীর টাকার থলি
জোগাও যাবে না দেবা। ধনের অধরাতে কোনো অবসরভোগী
অপরের প্রভু নাচেরা।

এখানে সবাই জানে কৃষিই হোলো মূল বনিয়াদ,
এবং একে জোরদার করাই তাদের মূল কাজ।
গণতন্ত্রকে নিয়ে তারা রচে না আলোচন-আলোড়ন,
কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে তাকে তাদের মধ্য দিয়েই,
গণতন্ত্রকে মূর্ত জোরে তোলে তারা বাস্তব অভিধায়।
প্রত্যেকেই একটা দায়ে কাজ করে তারা
সকলেরই রক্তে, এবং তাদের শাণিত জোরে তোলে তারা
এদেশ তাদেরই নিজের দেশ এবং
ভালোভাবেই জানে তারা এ দেশকে তুলে ধরতে হবে
তাদের অনেক উর্ধ্বেই। এক দায়েই মিলিত হয় তারা
আলোচনা করে তারা বাজার পরিচালনায়—কিভাবে এবং
জোথায় হবে কৃষিফার্ম, কে জোরবে জোর কাজ, কেই বা
উপযুক্ত সেই কাজেতে। সবার স্বার্থে কেই বা হবে নেতা,
তাদের মধ্যে দিয়ে অন্ত নেয় গণতন্ত্র এবং প্রকৃত-নির্দিষ্ট গণতন্ত্র।
এ যেন গজিয়ে ওঠে ঘাসের মতোই পৃথিবীর মহাকাশ জোড়েই
এবং এই গণতন্ত্রে কোন প্রশাসকই রক্ষা পায় না
গ্রামে কাজ জোরতে, তাদের পুরস্কারেরও সেখানে পাঠাতে
শিল্পপা মন করেক বছরের তরে। কারণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
দেখে নেবে তারা জনগণের শাসনধারা জনগণেরই তরে।

• রচনাকাল : ২৮শে আগষ্ট ১৯৭৫
• স্থান : চ্যাংরি [উত্তর জোশেই]
• কবি চিটাই অ্যালী মিউনীসিপ্যালিটি কমিশনার (২রা ডিসেম্বর ১৮৯১) উনি ১৯২৭ সাল থেকেই চীনে বসবাস করছেন।

অনুবাদ : মিয়াই মাস্তা

## একদল সংগ্রামী মানুষ

শেখ আমানুল্লা

চায়ের বাজনা বেজে উঠলেই
একদল মানুষ আনন্দে মাচতে থাকেন
( কিন্তু তাদের তো নাচবার কথা নয় )
আর একদল মানুষের বুক শুকিয়ে যায়
যেন মনে হয় কানের কাছে গর্জে উঠছে
কোন বন্দুকের গর্জন।

কিন্তু বুক শোকানো মানুষগুলো পালিয়ে
যেতে চায় না কোথাও।
তারা সে সময় মিছিলে মিছিলে
গর্জে ওঠে।
দুর্গোনমন্থিনী সে মিছিলের নাম দেয়।

চায়ের বাজনার তালে তালে যখন
মালপাহী মানুষের থালাগুলো
একদল মানুষের সামনে এসে হাজির হয়
তখন ঐ সব সংগ্রামী মানুষগুলো
উপোসেই দিন কাটায়।

তারা পথে ঘাটে বন্দরে
ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যায়।
দুহাত মুঠিবদ্ধ করে এগিয়ে চলে
কেবলা তাদের চোখে ঘুমে ক্লান্ত পথ
মহিষাসুরকে বধ করার।

## ভালোবাসা

**সৈলেনচন্দ্র ভট্টাচার্য**

ছায়া রেখে
অনন্তর কোল-পাত ভরো দারা বছর
তুমি কি পাতা গাঢ়া ফুল রেখনি কখনো
তবু বছর আলোয় মুহূর্ত এসি আসে যেনো

ছায়া যাবে তো আলোর উল্টো দিক
তবুও ছায়া রেখে অন্ত-উত্তেজনায়
স্থানভাস সরিয়ে রেখে
মাথা অস্তি লতা চুলে আঙুল চালাও তুমি

তুমি কি কখনো
বলো, ভালোবাসায় যারা আক্রমণ রেখনি
আবার আবার ছায়ায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছ
ছায়া সরে সরে যায়—

কিন্তু তুমি ভালোবেসে আছ
আপাতত দুস্তর ব্যবধানেও
তোমার সে'
রক্তের মধ্যে কেমন টম টম দিয়ে থাকে

## ধর্মপুত্র

**অবারুণ ঘোষ**

দুরাশক্ত যুধিষ্ঠির প্রতিভূ পাণ্ডুর তনয়,
ধৃতরাষ্ট্র রাজা,
রাজ্যপাট দুর্যোধনে আপনি বন্টায়।
তথাপি কুরুক্ষেত্র!
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্প দৃঢ়।
অন্তর্মুখে তবু হয় নিষ্পাপ ক'টি প্রাণ
মহাপ্রাণ পাণ্ডবের সন্তান শিকার,
বস্ত্রহরণ-পাপাচার কৌরব সভায়,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সব পতাকির ভারবাম নীরব দর্শক।
রাজ্যলোভে অর্ধাঙ্গিনী দুয়ার শিকার,
এমন লাম্পট্য। তবু,—
ধর্মপুত্র হয়েছেন মহিমায় আধার।

## জঙ্গলে চৈতালি ঘুণি

**শক্তি চট্টোপাধ্যায়**

চৈত্রের ঘূর্ণিতে ঘুমো, কাকর উত্তেজে—
জেগেছে বন্দীকপুল পালের তলে,
তবুও পালের পাতা মেন প্রস্তাবিত
বেঁচিয়ে চলেছে মড় তলের রেখে।

পালের তলল চণ্ডীমণ্ডপের মতো—
কীর্তন শোনাবে বলে উঠোনো উঠানো,
মেখেছেগুপাতা দিয়ে লতাকলাপ,
এমুড়ো ও-মুড়ো মেলো, বসবে ব'লে জোড়া।

চণ্ডীমণ্ডপের মতো পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যে ভাষে
দেবতার বাসস্থান, সে রকমই, পালের তলে
তথায়ে প্রবেশ করে, মনে হবে, পাথর দেবতা
আদিবাসীদের কোনো চাষা-পক্ষ থেকে আছ দুধ
পান করে, খেই পেলে, মুরগিটির কাছে তার
যখনই যাবায়, যায়—কোনরূপ আশা তো নেই!

আকাশের নিচে আজ দেবতা সহজভাবে ব'সে
মানুষের সীমা ভেঙে, তিনি আজ সুকোন তলে
যে-পারে সে খুঁজে পায়, বহুলোক খুঁজেছেই তা

# গণতন্ত্র কি বিপন্ন

## অন্নদাশঙ্কর রায়

এমারজেন্সী উঠে যাবার পরে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। ভেবেছিলুম দুঃস্বপ্নের দিন বিদায় নেবে। নতুন লোকসভা আর নতুন করে এমারজেন্সী জারি করবেন না। তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানের পুনঃসংশোধন ঘটাবেন। পরের বার পূর্বতন সরকার ফিরে এলেও এমারজেন্সী জারি করতে পারবেন না। এমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে আরেক দফা সংবিধান সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। সংশোধন যদি আবশ্যক হয় তো স্বাভাবিক সময়ে আলাপ আলোচনাপূর্বক হবে। তার জন্যে ভোটারদের কাছ থেকে ম্যান্ডেট নেতে হবে। আবহাওয়া ভোটার। আমাদের মত নিতে হবে।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! আড়াই বছর যেতে না যেতে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলো। আবার সাধারণ নির্বাচনের ডাক পড়ল। অনেকেই বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও তাঁর সরকারের কথায় রাষ্ট্রপতির এমন করা সংবিধান সম্মত হয় নি। কারণ উক্ত সরকারের পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে শুরুতর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। অমনতরো লোকসভা ভেঙে দেওয়া ও সাধারণ নির্বাচন ডাকার সিদ্ধান্তটা কি একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নয়? সংখ্যালঘু সরকারের যদি এতোবড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবিধান সম্মত অধিকার থাকে তো সংবিধানটাই ত্রুটিযুক্ত।

এর বিপরীত যুক্তিও অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে। সংবিধানকে এমন ভাবার সংশোধন করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যে-পরামর্শ দেবেন সে-পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবেন। তাঁরা সংখ্যালঘু না সংখ্যাগুরু সংবিধানে এমন কোনো বাছবিচার লিপিবদ্ধ হয়নি। সরকার যদি আইন বহির্ভূতভাবে গঠিত হয়ে থাকে তবে তার পরামর্শও আইনসঙ্গত। রাষ্ট্রপতি বাচ্চা।

এ যুক্তি তবে আপনি পক্ষ বলছেন, তা হলে আগে একটা সরকারকে আগে গঠন করতে দেওয়া হলো কেন? রাষ্ট্রপতি কি জানতেন না যে ওটা একটা সংখ্যালঘু সরকার? জানতেন ঠিকই। কিন্তু তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে শুধু পেছনে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রায় সত্তরটা ভোট আছে। পরে দেখা গেল ইন্দিরা কংগ্রেস তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে রাষ্ট্রপতি পড়ে যান বিষম কাঁপরে। বেচারা আরো বেড়ে যায় যখন চরণ সিং সরকার লোকসভার ভোটে হেরে যাবার আগে অগ্রিম পদত্যাগ করেন।

বহু লোকের ধারণা রাষ্ট্রপতির উচিত ছিল শ্রীজগজীবন রামকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানো। তাহলে তিনি যেমন করে পারতেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তিনি এখান থেকে ওখান থেকে ভোট কুড়িয়ে এনে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার খাড়া করলেও পরে পরিণতি বলতাবেড়ে যেত যাহ আর পাইকটির আমবাটোয়ারা নিয়ে। যেমন হয়েছিল শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আমলে। শ্রীজগজীবন রামের ভাগ্যও তিনিই নির্ধারণ করতেন যিনি করলেন শ্রীচরণ সিংয়ের আশা। আলোর জন্যে হোক মনের জন্যেই হোক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই আসল আমবাটোয়ারা। তবু তবু দুর্নামের ভাগী হচ্ছেন শ্রীনভীব রেড্ডী।

তবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বোধহয় ধারণা ছিল যে সাধারণ নির্বাচনের আগে যে পুরুতা সৃষ্টি হবে সেটা পূরণ করতে হলে নতুন এক কেয়ারটেকার সরকারের দরকার হবে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে তেমন কোনো বিধান নেই। রাষ্ট্রপতিকেও তেমন কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। ইংলণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলের এক্ষেত্রে খাটে না। সেখানে সাধারণ নির্বাচন একবারের বেশী হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁর পছন্দমতো আরেকটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করলে পর্দে উঠতেন তাঁরাই যাঁরা এখন চরণ সরকারের বিরুদ্ধে গজরাচ্ছেন। বুদ্ধির খেলায় চরণ সাহায্যই জিতেছেন মনে হচ্ছে। আপাতত চারটি মাস তাঁরাই দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করবেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে কত কী ঘটতে পারে দেশে ও বিদেশে। যদি একটা যুদ্ধটুদ্ধ বেধে যায় তাহলে তাহলে হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কে? তার সে অথরিটি আছে? চার মাস ধরে পদত্যাগ কি একটা সুস্থ অবস্থা? এই চার মাস আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, হে ভগবান, আমাদের রক্ষা কর। যেন কোথাও কোনো অঘটন না ঘটে।

সাধারণ নির্বাচনের পরে সংবিধানের সংশোধন একটি বিষয়ে অপরিহার্য। ভবিষ্যতে পুরুতা দেখা দিলে কেয়ারটেকার সরকার কে গঠন করবেন ও কাদের নিয়ে করবেন? রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কতটুকু? বাধিত কতটুকু?

পুরুতা যে বিশ্লেষক এটা শুধু রাজনৈতিক অর্থে নয়। এক্ষেত্রিক অর্থে। যখন লোকসভায় আস্থাই নেই তখন সরকারের উপরে তার কর্তৃত্বও নেই। তাহলে তার কর্তৃত্ব আছে? রাষ্ট্রপতির? না তাঁরও না। সরকারই সর্বময় কর্তা। চার মাসের জায়গায় আট মাস হলেই বা কী কে করতে পারে? সাধারণ নির্বাচন যদি বার বার পেছিয়ে যায় তাহলেই বা উপায় কি? সাধারণ নির্বাচনে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তবে বিকল্প সরকার গঠনে কে? কেউ না পারলে এই কেয়ারটেকার সরকারই অনির্দিষ্টকাল থেকে যাবে। একে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও কি রাষ্ট্রপতির আছে? তার চেয়ে আরো ভাবনার কথা এই সরকার যদি ক্ষেচ্ছায় পদত্যাগ করে। করেওছে তো একবার। তবে কেয়ারটেকার হিসাবে পদত্যাগ এর আগে করেনি। এখন যদি কেয়ারটেকার হিসাবে পদত্যাগ করে তা হলে রাষ্ট্রপতি দুশ্চিন্তে পড়বেন। কাকে ডাকবেন কেয়ারটেকার সরকার গঠন করতে? কাকে ডাকবেন না? সংবিধানে বিধান নেই। ইতিহাসে নজীর নেই। টংলণ্ডে কনভেনশন নেই।

তাহলে কি তিনিই সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবেন? নিজেই নিযুক্ত করবেন মন্ত্রীমণ্ডল? সেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য থাকবে না? মন্ত্রী মনোনয়নের অধিকার থাকবে না? ভারতের রাষ্ট্রপতি কি হবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতির বা ফরাসী রাষ্ট্রপতির মতো ক্ষমতার অধিকারী? সেটাও শপথ, তবে আমাদের সুপরিচিত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী নয়। চোখ বুজে গ্রহণ করলে পরে হয়তো তপের চেয়ে ফোরই বেশী ধরা পড়বে। যারা গণতন্ত্রের উপর আস্থাবান মন তাঁরা ওটাকেই পরে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করবেন। রাষ্ট্রপতি হবেন স্বৈরশাসক। জনগণের অধিকার খর্ব হবে। তা যদি হয় তবে তাকে গণতন্ত্র বলা হবে কেন? আমাদের লক্ষ্য জনগণের পূর্ণ অধিকার। শুধু অধিকার নয়।

এবার সাধারণ নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসা যাক। কংগ্রেস যদি অবিচ্ছিন্ন থাকত তাহলে আর কারো সঙ্গে কোয়ালিশন না করে সে একাই সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত কংগ্রেসের কোনো এক-খণ্ডের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কি সম্ভবপর? হেরেমি, ভারত যদি দুই ভাগে বিভক্ত না হতো তাহলে তারও দরকার হতো না আর কারো সঙ্গে কোয়ালিশনের। কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত ভারত যদের কোনো এক খণ্ডের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ কি সম্ভবপর? একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বোধহয় যে-কোনো একটি দলের পক্ষেই উচ্চাশা। হয় আগে থেকে জোট বাঁধতে হবে, নয় পরে কোয়ালিশন করতে হবে। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিশনই হবে। তবে তার সঙ্গে আর কী বলতে পারব না।

মোটামুটি এই পর্যন্তই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে একপক্ষের বৈদেশিক নীতি একটুখানি ঝুঁকবে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে। অপরপক্ষের একটুখানি পশ্চিমের দিকে। অবশ্য দুই পক্ষই জোটনিরপেক্ষ। তাছাড়া একপক্ষ একটুখানি ঝুঁকবে মুসলমান ও হরিজনের দিকে। অপরপক্ষ একটুখানি বর্ণহিন্দুর দিকে। অবশ্য দুইপক্ষই ধর্মনিরপেক্ষ।

গতবারের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখে আমার ধারণা জন্মেছিল যে ভারতে ইংলণ্ড আমেরিকার মতো টু-পার্টি সীস্টেম বিবর্তিত হয়ে উঠবে। সেটা আমার ইচ্ছাময়ী চিন্তা। অর্থাৎ আমি চাই বলেই তভাবে চিন্তা করি। দেশের লোকের মন যেভাবে অগ্রসর। সেটা বিবর্তিত হচ্ছে সেটা একপ্রকার মাল্টিপার্টি সীস্টেম। এদেশে কোনো কংগ্রেস ও জনতা পালা করে শাসন করবে না, ভোটসংখ্যা যেমনই কমবেশী হোক। রাষ্ট্রপতীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতীয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা ছোট পদোকে হাত মেলাবেন। আমাদের সেইভাবে লোকসভার নির্বাচনের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। আমার এক রাষ্ট্রপতী বন্ধুর হিসাবে এবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতীয়ের আসনসংখ্যা হবে একশো।

কিন্তু যেখানে আমাদের ও সাধারণের অধার বিতর্ক সেখানে যখন টু পার্টি সীস্টেম উঠছে না তখন মাল্টিপার্টি সীস্টেমও কি টিকবে? যে কোন পথী তা নির্বাচনের সময় বোঝা যায় না। বোঝা যায় ভোটগণনার ভোটাভুটির বেলা। হলফনামা দাখিল হয়েই হয়, কিন্তু এসব নির্দিষ্টভাবে নয়। নির্বাচকদের কাছে মাননীয় প্রার্থীরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকসভায় আসেন সেখানকার আলোচনায় সে প্রতিশ্রুতি তুলতে বেশীদিন লাগেনা। এর প্রতিকার কী? ভোট দেবার সময় ভোটে কী ভেবে বুঝবে যে নির্বাচনপ্রার্থী পরে দল বদল করবেন না, প্রতিশ্রুতি তুলবেন না? আইন অনুসারে এটা করণীয় নয়। একজনের আসন কেড়ে নেওয়া হয়না। ইংলণ্ডে সর্বনাশের থেকে একটা অক্ষর বেছে নিয়ে দলের পাশে ছুড়ে দিলে সেই কেন্দ্রের ভোটারে বলতে পারা যায় যে, ইনি অমুক 'এস' আর উনি অমুক 'আই'। নির্বাচকরা সরল মনে বিশ্বাস করে যে টুইডেলডাম আর টুইডেলডীর মধ্যে মতপার্থক্যটা যে কার্যকরণগত সত্যিকার প্রভেদ থাকতেও পারে।

টু-পার্টি সীস্টেম যোগে উদ্ভব না। মাল্টিপার্টি সীস্টেম টেকে কি না দেখা যাক। সীস্টেম বলতে কিছুই যদি না টেকে তবে গণতন্ত্র বলতেও কিছুই থাকবে না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য হয়, গণতন্ত্রের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। যাদুর খোঁজে পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে স্ট্যাবিলিটি। সেই সঙ্গে মোবিলিটি। বিচ্ছিন্ন মোবিলিটি কোনো কাজের কথা নয়। আবার বিচ্ছিন্ন স্ট্যাবিলিটিও অবাঞ্ছিত। ইংলণ্ড এর একটা সামঞ্জস্য করেছে। ভারতও কি পারবে? এবারকার সাধারণ নির্বাচন এর কী উত্তর দেয় শোনা যাক।

# পশ্চিমবঙ্গের অবলম্বনহীন বিরোধী দল

## শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলার সামনে আর একটি নির্বাচন এসে গেল, যার ফলশ্রুতি সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য, রাজ্যের দিক থেকে ত বটেই, জাতিগত ভাবেও। এ অবস্থায় জনগণ বা ভোটারদের কাছে খুব চাইতে আশ্চর্য মনে হচ্ছে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা বা ভূমিকার অপরেখার অভাব; তাদের চালচলন এখনও পর্যন্ত প্রায় অবলম্বনহীন হারানো ছেলের অবস্থা।

এদব দলের নেতারাও নিজেদের দীকার করছেন যে আজ তাঁরা যে অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন, তা তাঁদেরই কৃতকর্মের বা বহুলাংশে কিছু না করার ফল। সুতরাং দোষ ধরতে গেলে তাঁদের নিজেদেরই দোষের অংশীদার হতে হয়। জাতীয় স্তরে নীতিহীনতা অবশ্যই এঁদের মধ্যে প্রকট। সবচাইতে আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে দুচার জন যারা একটু আধটু আদর্শনৈতিক নীতিবোধের-কথা মাঝেমধ্যে উল্লেখ করছেন, তাদের পক্ষপক্ষ বা তার চর আখ্যা দিয়ে একঘরে করার প্রচেষ্টা। পুরো আবহাওয়াটাই সুবিধাবাদের দোষে দুষ্ট এবং সেই সুবিধা না পাওয়ায় হতাশা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু নেতিবাচক রাজনীতির ফল এছাড়া আর কিই বা হতে পারতো!

এক একটি দলকে আলাদা করে এই আলোচনা চালালে এটা প্রকট হতে বাধ্য। ১৯৭৭ সালে জনতা সি পি এম সহযোগিতায় ফলে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হলো। জনতা ভাবলো, লোকসভায় জনতা পাওয়া তাকে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও উৎরে দেবে। তাই জাতীয় নেতৃত্বের উপদেশ উপেক্ষা করে, রাজ্য জনতা নেতারা, বিশেষ করে অশীতিপর প্রফুল্ল সেন সি পি এম বিরোধী শক্তি হিসেবে একলা চলে যাওয়ার মাৎ করতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই ত আর চাঁদ ধরা যায় না। জনতা বিপুলভাবে হারলো। সহযোগিতা হলে নির্বাচন-উত্তরকালে বিরোধী অবধারিত হলেও প্রফুল্লবাবুর পক্ষে সি পি এমকে খানিকটা ঘরে রাখা সম্ভব হত যে সুযোগ তিনি স্বেচ্ছায় হারালেন।

গত দুবছর তিনি তাই খেপাচ্ছেন। বার বার বিফল চেষ্টা করলেন বিরোধী দলগুলোকে তাঁর বলিষ্ঠ (?) নেতৃত্বের আওতায় এনে সি পি এমকে আঘাত করার জনতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাধা সত্ত্বেও। ফল হল বিরোধী পক্ষে হতাশা, সি পি এম-এর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি ও তাঁর নিজের সুবাদের ক্ষতি। যদি প্রফুল্লবাবু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাধা না পেতেন, তাহলেও তিনি খুব সফল হতেন কিনা বলা শক্ত; কারণ ১৯৭৭ বা ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবাংলা ১৯৭৭ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। লোকের মনোভাব পালটেছে, বিশেষ ভাবে ১৯৭৯ সালের পর থেকে এবং পশ্চিমবাংলার লোকের মনে প্রফুল্লবাবু কোনওদিনই আর এক জন কংগ্রেসী থেকে। আলাদাভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ পান নি।

এর আরও একটা বিশেষ দিক আছে। প্রফুল্লবাবু কোনও দিনই সংগঠনের লোক ছিলেন না, যদিও পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের বিকাশে অন্তরিক থেকে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। সেই পুরোনো কংগ্রেসী যুগেও সংগঠন দেখতেন ও চালাতেন অতুল্য ঘোষ। সুতরাং জনতা নেতা হিসেবে ১৯৭৭ সালে আসরে নামলেও প্রফুল্লবাবু গত দু বছরে জনতার সংগঠন তৈরীর দিকে একটুও নজর দিলেন না। ফলে লোকের মনে জনতা মানে নিছক কিছু নেতা ছাড়া আর কোনও চিত্র ফুটে উঠলো না। সাংগঠনিক বিভ্রান্তি বাড়াতে অবশ্যি প্রফুল্লবাবুর বিদেশ অবস্থানও কম নয়।

এরপর আসা যাক কংগ্রেসের কথায়। এটা সত্যি যে ১৯৬৯ ও ১৯৭৮-এর দল ভাগাভাগি সংগঠনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও ক্ষতি করলো কতিপয় নেতার ভূমিকা। কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতার বাহক ছিল সত্যি। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে, বিশেষ করে বিগত দুই শতকে, কংগ্রেসের গতিশক্তি জোগাতো পার্লামেন্ট এবং সরকারে থেকে সুযোগ সুবিধা দিতে পারার ক্ষমতা। তাতে ছিল না কোনও আদর্শগত প্রশ্ন বা বালাই। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এর ধাক্কাও কংগ্রেসের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু ঐ পার্টিই ক্ষেত্রে পুরো অধিষ্ঠান ছিল। তাই না সিদ্ধার্থ রায়ের পক্ষে ১৯৭২-এর ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। মূলতঃ পুলিশকে পেছনে না

থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের শিক্ষা বা মানসিকতা কোনও দিনই কংগ্রেসে গড়ে ওঠে নি ১৯৭৭-এর পর।

কিন্তু ১৯৭৭ সালে যে অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কেন্দ্র থেকে আর কোনও সাহায্য আসার সম্ভাবনা রইল না। অবস্থা বুঝে এক বীর নেতা সম্পূর্ণ না চাকা দিয়ে ১৯৭৮-এর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের সময়। আরও অনেকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সে পথ নিলেন। দলের কিছু অনুগামী নেতা লাগাম ধরার চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন দলীয় রাজনীতির মোড় ফেরাতে। কিন্তু পারলেন না। তার প্রধান কারণ দলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। কংগ্রেস যখন সরকারে ছিল তখন সাধারণতঃ তাতে দুটো গোষ্ঠী থাকতো—যারা সরকারে থেকে সুযোগ সুবিধা করে নিতে পারে আর যারা বাইরে থাকতো। পরিচ্ছন্ন হবার পর অবশ্য দাঁতালো বহু নেতা ভদ্র গোষ্ঠী। এমন কি সাংগঠনিক কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো, বিশেষতঃ অর্থের অভাবে। রাজ্য কমিটির টেলিফোন কাটা হলো বিল না মেটাতে পারায়। সাধারণ ভাবেই দলের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়লো।

এই হতাশার আর একটা কারণ, বিশেষত দিল্লি কংগ্রেসের পক্ষে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বিধা, দ্বিমত চিন্তা এবং ইতিবাচক কর্মপন্থা নিরূপণের অক্ষমতা বা অদূরদর্শিতা। এই অবস্থায় রাজ্য নেতারা এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন। জনতার প্রস্তুত নেবার কথায় ভুলে পার্টির আশা বা প্রতীক ছেড়ে নামলেন সকারেত্ত নির্বাচনে। একই সময়ে তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বলিষ্ঠতার অভাব কংগ্রেস (ই) ঐ নির্বাচনে নামলো নিজ প্রতীক নিয়ে একলা, এবং অন্য সব বিরোধী দল থেকে বেশী আসন পেলো।

দলে দলে প্রবেশ কংগ্রেসের অনেকজন বাসী নেতা আস্তাকুড়ে ইস্তিফা পাঠাতে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি একবার মাথা হেলালেই ওঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর পদসেবা করতে পারেন। এবং যখন বারে বারে তাঁরা প্রত্যাখাত হলেন, বিশেষত প্রবেশ কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে, তখন তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি ইন্দিরাজীর কাছে তাঁদের আবার পেশ করলেন। এখনও খুব সুবিধের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তবে সুযোগ বুঝে তাঁরা যে প্রবেশ কংগ্রেসের ঘুটো মৌকো ডুবিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের পাশাপাশি চড়তে পারেন না যারা বিপত্তি সত্ত্বেও এটা হলফ করে কেউ বলতে পারেন না বা রাজী নন। এটা একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতি। কিন্তু যাদের রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা ও আদর্শই ছেড়া পার্টিতে এবং ক্ষয়ভাসীন দলে বা তার আশেপাশে থাকা, তাদের পক্ষে এটা মোটেও অশোভন নয়, কারণ ভাসিদটা বাঁচার। এবং এঁদের অনেকেরই হয়ত অনেক কিছু লুকোবার থাকতে পারে। যদি এতে দলের খুব নেতৃত্ব আশ্চর্য ও দুঃখিত হয় বা মনে করে তাদের ছোবানো হলো, তাতে তাঁদের কী যায় আসে। কথায় বলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

লোকসভা নির্বাচনের মুখোমুখি এসে সি পি এম বিরোধী ছোট বড়ীয় পেছনের কথা এই ই। কংগ্রেস, কংগ্রেস (ই) ও জনতা নিজ নিজ ভাবে নিশ্চয়ই মনে করে একলভাবে সি পি এম কে এ অবস্থায় ছোট পর্যুদস্ত করা অসম্ভব। আর তা না করতে পারলে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। যদি ধরে নেয়া যায় এই তিনটি দলেরই এক শ্রেণীস্বার্থ, তবে নামনের নির্বাচন হয়ত তাদের শেষ সুযোগ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়াস ও অঙ্গীকার ফুলে ধরার। এখন অনেক কংগ্রেস নেতাও স্বীকার করেন বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, তাদের ও জনতার শক্তির উৎস বন্ধ করে দেবার প্রচেষ্টা। সাধারণভাবেই গ্রামাঞ্চলের বিত্তহীন চাষী এবং আর্থিক ও সামাজিক শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয় গরীব শ্রেণীর লোকেদের ওপর তাদের আধিপত্য, এই ছিল একদা কংগ্রেসের এবং পরে দুই কংগ্রেসের প্রধান অবলম্বন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় উল্টে দেবার চেষ্টা করছেন বোধও এই শক্তিসমূহের মোকাবিলা করে। বোধও বা তাদের মতে সরকোতা করে, এবং এই কাজে সাফল্য দুই কংগ্রেস বা জনতার রূপে নিয়ে আসবে। গ্রামের এইসব শক্তিমান লোকেরা দুটো নির্বাচনে এই তিন দলের অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই নূতন করে ভরসা পায়নি। এবং লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে তারা সাধারণভাবেই সি পি এম বা ফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতার পথে যাবে কিনা। কারণ তাদের চাই একজন ক্ষমতাবান, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে হলেও।

কিন্তু এই তিন দলের একজোট হয়ে সি পি এমকে মোকবিলার সম্ভাবনা কখনই দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ এই ধরনের সমঝোতার ঝুঁকি অনেক। দলে ইন্দিরা গান্ধী, জনজীবন হাম, ও চ্যবনকে অন্যান্য রাজ্যে এর অনেক রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি করতে হবে। কিন্তু কিছু একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা এখনও উড়িয়ে দেয়া যায়না। ইন্দিরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করতে পারেন পশ্চিম বাংলায় তাঁর বহুভাষাপন্ন লোকদের কিছু সুবিধা দিলে—যেমন, তাদের বিকল্পতা না করে প্রবেশ কংগ্রেসের একটা বড় অংশ তার দিকে ঝুঁকবে, এবং যারা এখনই ঝুঁকে আছে তারা দলত্যাগী হয়ে তাঁর দলে যোগ

থেকে তাহলে খুব ভুল করবেন না। হয়ত এটাই তিনি করতে চাইছেন এবং এখানে অনেক নেতাকে বাদে খত ছিটিয়ে সেই ব্যবস্থাই তিনি করবেন। অতঃপর প্রফুল্লবাবুর প্রতি একই ঘৃণা দেখিয়ে তিনি রাজ্য জনতার আরও বিশ্বাস আনতে পারেন বা আনবেন। এটা ঠিক প্রফুল্লবাবু আদি কংগ্রেস নেতা হিসেবে এই ভাবে না দিলে এখানে জনতার নামটাও লোকে ভুলে যেতে পারে।

স্বভাবতই কংগ্রেসের এক শ্রেণী এখনও মনে করছে যে সর্বভারতীয় সমঝোতায় যাওয়ার পিছিয়ে সি পি এম তাদের অনেকজনকে একটু সুবিধা করে দিতে পারে। কিন্তু সি পি এম-এর রাজ্য কমিটি তাতে রাজী নয়। তার কারণও যথেষ্ট। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস ও সি পি আই ও পরে সি পি এম একে অপরকে প্রধান শত্রু হিসেবেই রাজনীতি করে চলেছে। এই সেদিনও ত প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও কর্মসূচী ছিল একই সময়ে একনায়কত্ব ও সি পি এম বিরোধী।

আর একটি বিরোধী দলের কথাও উল্লেখের যোগ্য। সেটা হলো সি পি আই। দলের তাত্ত্বিক কংগ্রেস ও এরাজ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বে আসার পরেও লোকের মনে, বিশেষত সি পি এম-এর চোখে, পার্টির ভাবমূর্তি কিছু বদলায় নি। বিশ্বনাথবাবু রাজ্য কাউন্সিলের সেক্রেটারি ঠিকই, কিন্তু তার দলের বড় অংশ, বিশেষত কলকাতা কমিটি, এখনও তাঁর ও কংগ্রেস (ই) ছেড়ে সি পি এম-এর কাছে যাওয়ার বিরোধী। এর ঐতিহাসিক কারণও একটা আছে। পার্টি ভাঙাভাঙির পর থেকে যেভাবে দুদলই একে অপরের সম্পর্কে বিষেষ ছড়িয়েছে নিজেদের মধ্যে, তাতে চট করে মনের মিল হওয়াও শক্ত। সেই কারণেই গত দুবছরেও দু দলের সম্পর্কে কোনও মূল গত বৈষম্য দেখা যায়নি। বিশ্বনাথবাবুর গঠনমূলক সমর্থন ও সমালোচনা ও সি পি এম-এর উষ্মার উদ্রেক করেছে। রাজ্য বিধান সভায় সি পি আইয়ের প্রতিনিধিত্ব দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং একলা হলে লোকসভা নির্বাচনের ফলও যে ১৯৭৭ এর থেকে কিছু ভাল হতে পারে সে আশা করার যথেষ্ট কারণ নেই। তাই তাদের সমঝোতায়।

# অস্থিরতার দশক

## ফণী চক্রবর্তী

সত্তরের দশক মুক্তির দশক না হয়ে হারাল ডিস্ট্রেবিলাইজেশনের দশক, বাংলায় এই অবস্থাটিকে মোটামুটি ভাবে বলা যায় সার্বিক অস্থিরতা।

সংসদীয় গণতন্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি সবই যেন একটা আবর্তের মুখে। সব কিছুতেই অনিশ্চয়তা, কেউ যেন জানেনা কাল কি হবে বা পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাবে। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে শুধু তিনটি শিল্পই এগিয়ে চলেছে—বৃহৎ ধরণের কাগজ, সিনেমা এবং সিমারেট আর অপসংস্কৃতির একটা জোয়ার এসেছে। ক্ষিষ্ণু সমাজে তাই হয়।

জানিনা এই অস্থিরতার ভিতরে মুক্তির বীজ সুপ্ত আছে কিনা। সমাজের প্রগতি কোন সরল রেখাতে চলেনা, তার ধারা বক্রগতি হতে বাধ্য। তাই হয়ত মাও-সে-তুং বলতেন "A thing is awlays in two" অর্থাৎ সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যেন আর এগোতে পারবে কি না তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমেরিকার মত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাশালী করা হবে, না তিনি শুধু ব্রিটিশ মনার্কের মত টুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবেন। ভারতবর্ষের প্রতিভূ রাষ্ট্রপতি—তিনি যেন ধনবাদীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর ভূমিকা নিয়ে যে বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্বন্ধে তিনিও সজাগ। তাই দেখতে পাই তাঞ্জোরবাড়ুর তিরুপতি মন্দির দর্শন করার সময় তিনি বক্তব্য রাখলেন যে তিনি হলে যা করেছেন তা জাতির সার্বিক স্বার্থেই করেছেন এবং একমাত্র "বিবেকের" নির্দেশেই চালিত হয়ে করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই সঙ্কট মুহূর্তে তিনি যা বললেন তার ধরণ মিল রয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের বক্তব্যের সঙ্গে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সঞ্জীব রেড্ডির রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের বিরোধিতা করে এই "বিবেকের" দোহাই দিয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ প্রায় বৈরাজ বললেই চলে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে, আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী উন্নতির প্রশ্ন আজ বিশ বাঁও জলের নীচে। তাই সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সুদূরপরাহত।

এই নড়বড়ে অবস্থায় কোন সরকারই কোন সুঠাম অর্থনীতি গ্রহণ করতে পারেনা। কোন মৌলিক বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা নীতির কথা অবান্তর। এবং যদি কোন নেতা বা পার্টি এই কথা বলে তা হবে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার সামিল।

এই রকম অস্থিরতা বা নড়বড়ে অবস্থা ভারতের তথা কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে দুঃখ, দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যজনক। বেশীদিন এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে জাতির আত্মবিশ্বাসে চিড় খেতে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত দেশের বিপুল ধারার অর্থনৈতিক উন্নতি সুদূরপরাহত হবে। এবং বিদেশীদের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা দিন দিনই বেড়ে চলবে। নতুন কৌশলে শোষণ এবং নয়া ঔপনিবেশিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকবে। কাঁচামালের যোগানদার তারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে কব্জায় আনার জন্য দুটি বৃহৎ শক্তির খেলার অন্ত থাকবেনা।

বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া ও আফ্রিকার যে সমস্ত দেশ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করেছে সেখানে এই দুই বৃহৎ শক্তির খেলা চলে আসছে প্রায় তাদের জন্মকাল থেকেই, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই খেলা এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে নেপথ্যেই ছিল এবং তারতের রিলিটারী এবং মুদ্রাকেন্দ্রিক দেশের পরিবর্তে অনুযায়ীই কাজ করে আসছে। কিন্তু বর্তমানের এই অস্থিরতা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তাহলে তাদের পক্ষেও তারসাম্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠতে পারে।

### সম্ভব্য সমাধানের বিশ্লেষণ

(১) ভারতীয় সংবিধানের নানা রকম সংশোধন হয়েছে। গত বিশ বছরে হয়েছে সতেরটি কিন্তু এই দশকে হয়েছে কম করেও আটাশটি। তার ভিতর মারাত্মক সংশোধন হয়েছিল কেন্দ্রের ক্ষমতাকে ভারসাম্যে রেখে বৈরাচারিতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

জনতা ক্ষমতায় এসে এই বৈরাচারিতার জোর খুঁড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজেদের অন্তর্কলহের জন্য এই পার্টি বেশীদূর এগোতে পারল না এবং ক্ষমতায় থাকতে পারল না।

(২) আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য হল এই দশকে তিন তিনটি লোকসভার নির্বাচন। আমাদের সংবিধান প্রণয়িতারা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের সুপারিশ করে গেছেন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে। রাজ্যে

অধিবেশন বসে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন করে তার সমাধানের জন্য রাজ্যপালের সুপারিশে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার বিধি আছে, কিন্তু কেন্দ্রে ঐ জাতীয় অবস্থা ঘটলে কি করা যাবে সে সম্বন্ধে লিখিত কোন নির্দেশ নেই। ১৯৭১ সালের আগে অবশ্য রাজ্যেই পাঁচ বছরের ভিতরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়েছে। এবারে পশ্চিমবাংলাতেই দশবছরে চারবার বা তারোধিক বার নির্বাচন হয়ে গেছে।

(গ) এই সত্তরের দশকেই প্রথম আন্তর্জাতীয় অস্থায়ী অবস্থা জারী করা হল, খরচের আসলের বহুগুণ করা হল এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বৈরতন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হল। উপরে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতার লোভে রাজনৈতিক দলগুলির—বিশেষ করে কংগ্রেসের—ভাঙাগড়া এবং তথাকথিত জাতীয় নেতাদের অপরাজেয় ব্যবহার।

(ঘ) আর একটি বিশেষ লক্ষণ হল বহুজাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে মালটি-ন্যাশনালের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার এবং জাতীয় এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান মিলন।

তবুই প্রশ্ন ওঠে যে, স্বাধীনতার পর দেশের এই অবস্থার কারণ কি এবং কেনই বা এমনটি হল। এর কারণ নিহিত রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্নের উপর। কোন্ পথে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে না পশ্চিমীদেশগুলির বিশেষ করে আমেরিকা এবং আমাদের যে ভাবে "প্রাইভেট প্রপার্টি" বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে এগিয়ে যাচ্ছে সেই পথে।

# স্বাধীনতা ও শিশুবর্ষ

## মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে চল্লিশের দশকে যুদ্ধের বছরে সিভিক গার্ড পাড়ায় পড়ীরা তাঁর ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন—'আমরা তো করে গেলাম। দেশ স্বাধীন হলে তোদের আর কষ্ট থাকলে না।'

দেশ স্বাধীন হল। আমরা মুক্তির দেবের জোয়ারের স্বাধীনতার আবাহনী গানে কণ্ঠও দিলাম। আবার গগনাটোর কবিদাস তখনো বারোয়ারীতলায় ছুটলাম। সেখানে তখন চাটগাঁয়ের রবেশ কবিয়াল গাইছেন—

'আজোর বুঝিবা কাল
যন্ত্র নাই একখানা চাল
খালবাটি নিল মহাজনে
হইলে টেক্‌সো মইলে টেক্‌সো
ঘরবাড়ী গরু টেক্‌সো
হুরেক রকম হইল আইনে
রৌয়ে কয় কাপড় আনো
পোলায় কয় ভাত
স্বাধীন হইলায় তবু কেন
এ হরল উৎপাত!'

এই আসরেই শুনেছি, গগনাট্যের গায়েনরা পাঁচালির সুরে বলছেন—হক-চোখা ব্রিটিশ সেলেও এখন দেশী শোষকরা ঘাড়ের উপর কোঁকে বসেছে। এই শোষণের মূল জানতে হবে। সব শরীর একজোট হতে হবে।

আজ আমাদের স্বাধীনতার ৩২ বছর পরও শুনতে হচ্ছে, দেশের ৬০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ কোটি মানুষই অর্ধভুক্ত ও নিরক্ষর এবং এই সংখ্যা বাকি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এর সঙ্গে এখনও শুনছি, আমাদের দেশেই শিশুমৃত্যুর হার, শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া তিক্ষা যে একটা বংশানুক্রমিক জীবিকা হতে পারে, ফুটপাত, রেলের বাঁধ, পথের ধার ও রেল স্টেশনগুলি যে আমাদের বেহুইনদের মত আশ্রয়স্থল হতে পারে (আমুদের কুঠরি), তাতে আজকের এই বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে এসে বিজ্ঞানের বিস্ময়ও লজ্জায় মুখ কালি করে এই ভারতবর্ষে—এই কলকাতায়।

বিগত চল্লিশের দশকে বিপ্লবী কবি সুকান্ত সমকালের চোখে টীকানা দিয়ে বলেছিল—'মুক্ত স্বদেশেই দেখা হ'বে।' তার সঙ্গে আজও দেখা হয়—কখনও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, চন্দননগর কিংবা আসানসোলে বর্ণা আন্দোলনে, কেত-মজুরীর লড়াইয়ের মাঠে; ভরা, হিন্দ-মোটর কিংবা চটকল শ্রমিকদের মিছিলে, কখনও বা ট্রেনের কামরায়, ফুটপাতে হকারদের চিৎকারে। সুকান্ত চেয়েছিল—রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটার গায়ে এক টুকরো পোশাক তুলে দিতে। তার সেই উলঙ্গ ছেলেরা এখন দেড় কোটি শিশু শ্রমিকে, নয়ত আদি লক্ষ শিশু-ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। এখনই এই 'মুক্ত স্বদেশে'র মহিমা!

আজ যখন প্রতিবেশী চীন আর ভিয়েতনাম ইয়াংকি-বেকড়ের বাঁধে ছাড়িয়ে আতি তার ঠানুমাকে দেখাচ্ছে—ঐ দেখো দাদু, কত বেলুন উড়ছে আকাশে, কত রঙ্গ ভরেলো, আর পাখুরে মাটির মুখে মাখনো আলোর বর্ণ, যারা কেবল টাইমে স্টার্ট দিন দেখো, তখন আমাদের কলকাতায় বিজ্ঞানের ছিন্ন মুণ্ড বিলি হয়ে গেল লক্ষ রৌপ্য মুদ্রায়, মাকড়াতে রাস্তার কুইরির ঐ উলঙ্গ ছেলেটা তাড়া মুখটা দেখে ফিক্কিয়ে উঠলো। তোদের প্রথম ট্রায়ের আবাহনীতে, এ পুণ্য শিল্পরের প্রভাত কেরীর গানে কি ভজনি তাপা পড়তে পারে? আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারীর চটকল শ্রমিক-কবি ফ্রাংসোয়া 'কমিউনের গানে' স্বপ্ন দেখেছিলেন—

'সেদিন আসবে বেবো
যখন কোন পরিবারের শিশুরাই
মুহূর্তের জন্যও পাবে
ঢেঁড়া মরলা কুলকুলি গায়ে
সবাই পাবে দুটি হাত
আর রোজ্‌ই
বেঁচে থাকে কমিউন
বাঁচুক শিশুরা
বেঁচে থাকে বাঁচুক কমিউন।'

এই প্যারী কমিউনের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সারা দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মানুষে। কিন্তু যাদের উপর ছড়িয়ে যে আজ পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদিক দেশগুলিতে দুনিয়া বিভাগের পৈশাচিক প্রতিযোগিতা চলেছে, তাদেই বিজ্ঞানে বিশ্বাসে যে বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষ (এর মধ্যে ৭০ কোটিই আমাদের দেশে) অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে না? অথচ বিশ্ব খাদ্য-সংস্থা বলছে, ঠিকমত বন্টন হলে সারা বিশ্বের উৎপাদিত খাদ্য সকলের পেটেই ঠিকমত যেতে পারে। এই কারণেই আমাদের বিজ্ঞানাচার্য সত্যের বহু চাঁদে

মহাত্মাজী যাদের পাকি হেওয়ার কথা ভাবে বলেছিলেন—আমি আরও বেশী আনন্দিত হতাম, যদি তাঁরা বিজ্ঞান পৃথিবীর সব মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরেছে।

রাশিয়ার কৃষাণ ঘরের আমলে প্রতি বছর দু লক্ষ শিশু অসুখে ও ব্যাধিতে মারা যেত। আমাদের দেশে আজও, স্বাধীনতার ৩১ বছর পরেও কেন কোটি শিশু অনাহারে অসুখে আর অসহায় অবস্থায় রোগের কোলে চলে পড়ছে, এ প্রশ্নের জবাব এবং সেই জবাবের বিরুদ্ধে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও শোষণভিত্তিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে জীবিত মানুষের সংগ্রামই ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।

যে বছর এ রাজ্যে 'ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন' হল, সেই বছরই (১৯৭৯) ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সারা বিশ্বের শিশুদের সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি 'অধিকার সনদ' পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমাদের 'স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সংবিধানে' (১৯৫০) রাষ্ট্রের সকল মানুষের কাজ ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে 'মৌলিক' বলে স্বীকার করা হয় নি। সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য চার্টার-এ কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে—(১) জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শিশুকেই জাতিগত ও বর্ণীয় বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে হবে। তারা সবাই বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বোধের মনোভাব নিয়ে বড় হবার অধিকারী; (২) তারা সবাই সমানভাবে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, ভালো আবাস, চিকিৎসা ও খেলাধুলোর সুযোগ পাবার অধিকারী; (৩) পূর্ণ বিকাশ ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা পাবার অধিকারী; (৪) জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিশুই মানবিক অধিকারগুলি ভোগ করার অধিকারী।

দেখা যাচ্ছে, সমাজে শ্রেণীভেদও থাকবে, পুঁজিপতি-জমিদারদেরও আধিপত্য থাকবে, আবার এই সব মৌলিক অধিকার থেকে সকল শিশু ভোগ করতে পারবে, এ রকম চিন্তা করার অর্থ মুখের স্বর্গে বাস করা।

তবু এই সবের মধ্যে বাস্তব অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের কারণে শিশুবর্ষ পালনের অর্থাৎ সমাজ বদলের উপাদান বা শক্তি সরকারের কর্মসূচী ও উদ্যোগ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের হচ্ছে, এটা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিশুদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষা যতটা ও যত ব্যাপক করা সম্ভব, আমাদের মত স্বাধীন, আধা-ঔপনিবেশিক ও উন্নয়নশীল দেশে তার ছিটেফোঁটাও পড়ে না। আবার একই অর্থনীতির জোয়ালে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও, গণ-আন্দোলন ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের কারণে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এ বছরের 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' পালনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে রূপায়ণযুক্ত কর্মসূচীগুলির গুণগত পার্থক্য এক নজরেই ধরা পড়ে। অন্যান্য গণতন্ত্রী পরিচালনার সঙ্গে, বিশেষ করে গ্রামবিহীন গ্রামগুলিতে হাজার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়া, আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি-হোস্টেল গড়ে তোলা, বিনা পয়সায় বই-খাতা ও টিফিন সরবরাহ করা এবং সেই সঙ্গে বর্গা অপারেশন ও ক্ষেত মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে গ্রাম-সভাগুলিতে গড়ে ওঠা সংগঠন, গ্রামের শিশুর সকালের ঘটনা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে কি অন্য আশার কথা?

তবু সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যতটা কি বিদ্যালয় শিশু উদ্যানের, মেয়েদের শিশু-বিউটিফিকেশনের চারপাশে উন্নত শিশুদের ছ্যাংলা চাহনি আর কেরেন্ট ওঁতো লেপ্‌টে থাকা জামাকাপড় নিয়ে তাড়াতাড়ি চলচ্চিত্রে ফুটে উঠছে না? কত কোটি শিশু ঘরে সেল যারা 'শিশু' শব্দটি পড়তে ও লিখতে জানে না?

কেউ যদি বলেন বা আশা করেন, ঐ ইন্দিরা-জগজীবন-যোয়ারদী-চরণ-এর বৃহৎ পুঁজিপতি ও কুলাকের পায়েরা দেশকে শোষণমুক্ত করতে পারে, সেটা হবে কি রকম ঘ জানেন? নরম হাতে মাথা কয়েকটা হাড় সাবধানে রেখে কুকুরের কাছ থেকে নিরাপত্তা আশা করা। তাদেই এইসব হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বিশ্বের রক্ষার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতি গড়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

# ডলারের পরে রুবল সাম্রাজ্যের পতন

## তপন বসু

অত্যাচারিত বিশ্বজনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে কারও মতে শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর ঐ সময় থেকেই মার্কিনী পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ তখন থেকেই নিপীড়িত জাতিগুলি এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অক্টোপাসের শিরোমণি হলো বৃটিশ এম্পায়ার। স্বভাবতই মার্কিন পুঁজিপতিদের বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে গিয়ে বৃটিশ এম্পায়ারের পাশাপাশি অনেক কৃচ্ছসাধন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অবশেষে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর চলতি শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষার্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাজার রমরমা হয়ে ওঠে। তখন তাদের পাঁচটা আঙুলই ঘিয়ের পাত্রে ডোবানো। ওরা তখন দুহাত টেবিলে বসে মানুষের রক্তে কেনা অন্ন দুহাতে নিয়ে ওলায় আর দুনিয়া জাদাজাদি করায় মশগুল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ তখন আধিপত্যবাদের দুনিয়াতে প্রধানত অভিধি জাপান সাম্রাজ্যবাদ কাঁচা মালের খেসগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে তীব্রগতিতে অনিন্দিত প্রৌঢ়ের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। গোটা পৃথিবীটায় তছনছকারী করার চাকুক হাকাচ্ছে। তখনও পর্যন্ত ছোর দুনিয়ায় হিটলার নামক 'প্রতিভা'টিকে ইহুদী ব্যবসায়ীরা খুঁজে বার করতে পারেনি। এই ভাবে বিশ্বপুঁজিবাদের পরস্পরের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়ে এক দশক অতিবাহিত হল। পৃথিবীর অগ্নিগর্ভ অবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী পাওা আর রাজনৈতিক ঘুপ্তা যাবার যোড় হাতে নিয়ে বিশ্ব পুনর্গঠনে মন্ত। হিটলার তখন ডুবন্তকে পুরোপুরি আবিষ্কৃত। হিটলার-মুসোলিনী-ফ্রাঙ্কো-গোয়েবেলস চক্র তখন রক্তাক্ত পদক্ষেপে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে তামাম দুনিয়া জুড়ে। সেনাপতি হোমেলের তরবারির আঘাতে আফ্রিকা মহ সমস্ত আফ্রিকা রক্তস্নাত। জাপানকে অগ্রবিন্দু করে তামাম-বর্ষ সহ এশিয়াও নিদর হত্যাচারে আক্রান্ত। ইহুদী ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা খেয়ে হিটলারের পেট তখন মহাল সাপের মত ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে। এক পাও পেছুবার উপায় নেই। অতএব মরিয়া আক্রমণ, পরদেশের ভূখণ্ড অধিকার, দেশগোয়া লুঠন এই ছিল হিটলারের একমাত্র পথ। কিন্তু অভিধায় সৌভাগ্যবশত যোগেক স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রিজনশক্তির পাল্টা আক্রমণে উদ্যত হিটলারের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

অতঃপর আমেরিকার অগ্রগতি এবং মার্কিনী আধিপত্য যার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান। তাছাড়াও আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকা ও মিডিলইস্টের দেশগুলোতে পুঁজিপতি ও স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, এবং ১৯৫৬ সালে ত্রিক বৃটেনের কায়দায় ঐ সমস্ত দেশগুলোকে উপনিবেশ থেকে আধা উপনিবেশে পরিণত করে রমরমা রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে পথার আড়ালে চলে যাচ্ছে সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক লুটপাট করার জন্য ছোট ছোট তথাকথিত দুনিয়ার মালিকদের থেকে শুরু করে অক্টোপাস বিশ্বজাল বিস্তার করে আটলান্টিকে ডাকিয়ে দিচ্ছে। আটলেন্টিক চুক্তি ও বাণিজ্য পুঁজি রাইফেলই প্রথম শুরু তাদের হরতুকি দেওয়া। কিন্তু আস্তাকুরে পুরোনো কায়দায় মরচে ধরে যায় এবং উপনিবেশগুলোতে উৎপাদনে আধুনিক করে মার্কিনী পুঁজির শোষণ শুরু হয়। ১৯৫৮-৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী আমেরিকার মার্কিন কোম্পানীগুলি অধীনস্থ বিদেশের মার্কিনিবিরোধী জোশালী-শক্তির উৎপাদনের মোট মূল্য হল বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এই ৩৮৫ বছরে ২৫টি মুক্তদেশ হলনীতিবাদী দেশের মোট মজুরীর পরিমাণ হল ১০০ বিলিয়ন ডলার। অতীতে মুক্তদেশ হলনীতিবাদীরা প্রধানত নিজের জন্য খনিগুলোর ওপর এখন খাদ্য, ওষুধিউটার, নানান ধরনের যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রকল্প, সংযোগমূলক ভাওতর, প্রযুক্তিবিদ্যা, কারিগরি বিজ্ঞান প্রভৃতি খাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। ইউনাইটেড স্টেট ডাউলিন অফ দি ইকোনমিক্যাল চেয়ার অফ কমার্সের প্রতিনিধি দল পাক-এর বিবৃতি অনুযায়ী ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স আশা করে যে কারেন্ট বিজনেস্ বছরের হিসাব অনুযায়ী

আমেরিকার পরোক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ বিভাজন—

| অঞ্চল | ১৯১৯ | ১৯৭৬ |
|---|---|---|
| কানাডা | ২·৩ বিলিয়ন ডলার | ২·৮ বিঃ ডঃ |
| লাতিন আমেরিকা | ৩·৮ | |
| ইউরোপ | ৩·১ | ১৮·১ |
| অন্যান্য | ৩·৬ | ১৩·২ |
| | ৯·৮ | ৪৯·৩ |

১৯৭১-৭৮ আর্থিক বছরের হিসাব অনুযায়ী এই বিনিয়োগের পরিমাণ তালিকাভুক্তিতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮·১ বিলিয়ন ডলারে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১৭১ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯৭৮ এই ৫১ বছরের ব্যবধানে বাণিজ্যিক পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে ৯১·৪ বিলিয়ন ডলার, আর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ১৬৮ বিলিয়ন ডলার।

বিদেশস্থ শাখাগুলোতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রদত্ত ভাতা বাবদ প্রচুর পরিমাণ টাকা বরাদ্দ থাকে। কিন্তু আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের কল্যাণে টেলিযোগাযোগ, এয়ারমেল, উপগ্রহ ইত্যাদি মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার খুবই সুবিধা হয়ে যাওয়ায় প্রদত্ত বাবদ ব্যয় খুব কমই হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি এখনো পর্যন্ত কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয় প্রদত্ত ভাতা বাবদ।

আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত শাখাসিডিয়ারী কোম্পানীগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কমপিউটার ব্যবহার করে থাকে, যেমন, শেল ষ্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি অয়েল কোম্পানীগুলো। ট্যাক্সাস ফ্লিট-এর কার্যকলাপকে কমপিউটার মারফৎ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কমপিউটারের মাধ্যমে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে আই বি এম কোম্পানী অদ্বিতীয়। আই বি এম-এর আধুনিকতম আবিষ্কার হল উন্নত কমপিউটার টেপ মারফৎ দপ্তরের এপার ওপার যোগাযোগ স্থাপন করা। পাঁচ মাস বিশ্ব সমস্যা তৈরীর জন্যে জটিল গণনার ক্ষেত্রে যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশেষ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, তার নাম হল নাথার ক্রাশিং কমপিউটার। এর উৎপাদক ও সরবরাহকারী হল আমেরিকার কন্ট্রোল ডাটা কর্পোরেশন। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন ১৯৬০ সালে যে থার্ড জেনারেশন কমপিউটার সিরিজ নং ৩৬০ আবিষ্কার করে তার জন্য ১৯৭০ থেকে ১৯৭৮ অবধি খরচ হয়েছে ৫০·৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ হিরোশিমার অ্যাটম বোমা ফেলতে যে খরচ হয়েছিল তার প্রায় ১৮/১৯ গুণ। ইউ, এস, এ-র বাইরে আই বি এম সংস্থার ১৩টি দেশে ১৮টি প্লান্ট আছে। ওয়াল ষ্ট্রীটের মতে, এর বিনিয়োগের আনুমানিক পরিমাণ হল প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ স্পেন, বেলজিয়াম প্রভৃতির মত ছোট ছোট দেশগুলির গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট-এর প্রায় ১/১ গুণ। বোদ্ধা কথা হল এত পরিমাণ খরচ করেই চলেছে তৃতীয় দুনিয়া সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির কমপিউটারকে লোভী চোখের মত শোষণ করে। বিভিন্ন দেশে শাখাসিডিয়ারী থাকার ফলে কম সুদের দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদেশের অধীনস্থ সংস্থা মারফৎ বেশী সুদের দেশে সেই ঋণের টাকা চালান দিয়ে বিপুল পরিমাণ মুনাফা লোটা আর এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী কারবার। আমেরিকার ই টি আই ই টে ড পূ কোম্পানীর বুলেটিনে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "আমাদের একটি ট্যাক্সিস শাখাসিডিয়ারীতে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত ছিল। এই শাখাসিডিয়ারীটি ঐ অর্থ অন্য একটি ট্যাক্সিস শাখাসিডিয়ারীকে ধার দেয়। সেখেকে শাখাসিডিয়ারীটি একটি সুইডিশ কোম্পানীর কাছ থেকে মাল কিনতো। সেই সুবাদে ঐ ট্যাক্সিস শাখাসিডিয়ারীটি সুইডিশ শাখাসিডিয়ারীকে মাল বাবদ আগাম অর্থ পরিশোধ করে। শেষ পর্যন্ত এই অর্থ ব্যবহার করা হয় সুইডিশ শাখাসিডিয়ারীতে উৎপন্ন মাল কিনিয়ে শাখাসিডিয়ারীতে চালান করার জন্য। এই কৌশলের দ্বারা কি ফল লাভ হ'ল?" যদি কিনতাতকে ঐ অর্থের ব্যবস্থা করতে হত, তাহলে ১৮ শতাংশ হারে তাকে ঋণ গ্রহণ করতে হত। যদি সুইডিশ শাখাসিডিয়ারীকে ঐ টাকার ব্যবস্থা করতে হত, তাহলে কম করে ৯ শতাংশ হারে ধার করতে হত। কিন্তু ডেনমার্কে সুদের হার বড়জোর ৪ থেকে ৫ শতাংশ, এ ছাড়াও আছে মালের আমদানী কাস্টমস ডিউটি রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা। কোন কোন দেশে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আইন-কানুন যথেষ্ট নমনীয়। এই সমস্ত জায়গায় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাঙ্ক ও ট্যাক্স কালেকটারের সঙ্গে যোগসাজসে এরা কম কাঁকি দেয়। যেমন সুইজারল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কগুলোতে তাদের গ্রাহকদের নাম প্রকাশ করা হয় না। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীরা যেখেন সেখেকে চোরাপথে চালান করে নিয়ে আসা কালো টাকা সহজেই আইন সঙ্গত করিয়ে নেয়।

শোষণের জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিও সাম্রাজ্যবাদের এক অন্যতম প্রধান কৌশল। আমেরিকার 'U S act for trading with enemy' বলে একটা আইন আছে। এই আইন অনুযায়ী ভাটো ক্ষমতাবলে কোন

দেশ কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রকে কোন ধরণের ষ্ট্রাটেজিক মাল বিক্রি করতে পারবে না। এই সময় ধরে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও দলের একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে দেয়। লাল চীনের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ও দল যাও দে তুংকে শুভেচ্ছা জানাবার মনস্থ করেন যে, তিনি তাকে কয়েকটি ন্যাপালম বোমা এয়ারলাইনার উপহার দেবেন। কিন্তু আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই বলে আপত্তি জানায় যে, যেহেতু ঐ এয়ারলাইনারে যথেষ্ট পরিমাণে আমেরিকান ষ্ট্রাটেজিক ইলেকট্রনিক ইকুপমেন্ট আছে, সেহেতু ইউ, এস, এ আইন অনুযায়ী কোন শত্রু (কমিউনিষ্ট) রাষ্ট্রকে ঐ জিনিষ সরবরাহ করা যাবেনা। ফ্রুটেনের বালিস্টিক মাসল কোম্পানী চীনে ট্রাক্টর ও ট্রেলার পাঠাই দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, এবং ফ্রান্সের ডু চাক ফ্রান্স এর কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ট্রেলার সরবরাহের জন্য রাজী করানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চাকরী যায়। কারণ ওটি ছিল একটি আমেরিকান সংস্থার ফরাসী শাখা-সিডিয়ারী।

দুনিয়ার আর এক অতিবৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি আরও মারাত্মক ব্যাপার। ১৯৬১ সালে প্রাভিডোহকে সামরিক অস্ত্র সীমিতকরণের নাম করে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, অর্থাৎ পার্শ-১ চুক্তি তা আসলে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রাগারে আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা। এছাড়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাখাও হচ্ছে এক তাদের কৌশল। এই মেদিন অর্থাৎ ১৯ই জুলাই তারিখে পার্শ-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর সঙ্গেই সঙ্গেই ভারত মহাসাগর এলাকায় দুই বৃহৎ শক্তির রণসজ্জার তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ১৮ই জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পরই ২০শে জুলাই ভেরনেক থেকে এই বলে ঘোষণা করা হয় যে, তাদের মহাসাগর এলাকায় সপ্তম নৌ-বহরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই হল ভারত মহাসাগর এলাকায় অভিশপ্ত, অশুভ চিহ্ন, যার শিকার হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ। এর কারণটা কি? লেনিন বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদের একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট হচ্ছে কতক বিভাগের জন্য কয়েকটি বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা।" রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই অতিবৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজই করে চলেছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের লড়াইয়ের ঐতিহ্য অনেক দিনের। অর্থাৎ যখন থেকে মার্কিন যুক্তিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত তখন থেকেই সে তার সমাধি রচনা করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ইন্দোচীনে চরম শিক্ষা পাওয়ার পর থেকে সে নতুন করে সামরিক আক্রমণ পরভূমি গ্রাস ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছে। বরং বলা যায় এখন সে পুরোনো উপনিবেশগুলো কোন-ক্রমে রক্ষা করার ব্যস্ত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বপুঁজিবাদের সংকটজনক অবস্থায় এর হল কর্তৃত্বাদের রণাঙ্গনে নতুন আগন্তুক রাশিয়ার ভূমিকা কি? সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির উন-বিংশতিতম কংগ্রেসের সময় থেকেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধঃপতন শুরু হয়। ঐ কংগ্রেসেই স্ট্যালিনের ইকনমিক প্রবলেমস অব সোসালিজম টন ইউ এস আর নামক অর্থনৈতিক তত্ত্বভিত্তিক প্রবন্ধটি পাঠ করতে বাধার সৃষ্টি করা হয়। এবং স্ট্যালিনকে পরিত্যক্ত বক্তব্য রাখতে বিরত রাখা হয়। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের পথে প্রত্যাবর্তনের সূচনা। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে সরা-সরি ঘোষণা করা হয় যে, "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সোভিয়েট রাশিয়ায় শেষ হয়ে গেছে, কারণ এখানে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের চরমবিন্দুতে পৌঁছেছে। এখন প্রয়োজন হল বৃহৎ জনগণের একনায়কত্ব।" ব্রেজনিভের 'হয়ো মডেলে' বিশ্ব আপন কমিউনিষ্ট পার্টি শুদ্ধ রাশিয়ার পার্টির একধাপ ওপরে উঠে গিয়ে প্রস্তাব হয় করে যে, "কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয়মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, অন্যথায় বিপ্লবের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি হবে।"

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যখন সমাজতন্ত্রের তারতীয় জনগণের সেবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া একতরফাভাবে টাকা এবং অন্যান্য দেশের বিনিময় মূল্য ঘোষণা করেছে অর্থাৎ তার-তীয় টাকা ও অন্যান্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। বীর তিন বছর ধরে এ সম্পর্কে সরকারী আলোচনা হয়েছে কিন্তু তারতসহ অন্যান্য দেশের বক্তব্য বুঝিগ্রাহ্য হয়নি। এবং অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। মস্কো থেকে এইভাবে মাঝে মাঝেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে অর্থ, অন্যান্য সম্পদ ও উৎপন্ন মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হয়। ডলারের স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড এসডিআর টাকা ও অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় প্রথা বাতিল করে দেয়। অবশ্য তারপরেও স্টার্লিং মারফৎ আরও কিছুদিনের জন্যে এই বিনিময় প্রথা চালু ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সুচারুরূপে এই প্রথা বন্ধ করে দেয়।

কিছুকাল আগে ভারতীয় ১০০ টাকার মূল্য ছিল ৮.১৫ রুবল। বর্তমানে তাকে নামিয়ে আনা হয়েছে ৮.১০ রুবলে। গত ১৬ মাসের মধ্যে ভারতীয় আমেরিকান ডলার, ক্যানাডিয়ান ডলার, জাপান মার্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় মুদ্রা ভারতীয় টাকার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলতঃ মার্কিন ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে টাকার আমদানী প্রতি ডলারে ৩ পয়সা, ক্যানাডিয়ান ডলারের ক্ষেত্রে ২ পয়সা, সুইস ফ্রাঙ্কের ক্ষেত্রে ২ পয়সা, জার্মান মার্কের ক্ষেত্রে ৩ পয়সা, জাপ সিল্লারের ক্ষেত্রে ২ পয়সা এবং প্রতি ১০০ বেলজিয়াম ফ্রাঙ্ক ও অষ্ট্রেলিয়ান শিলিংএর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১পয়সা ও ১১ পয়সা করে কমে যায়। কিন্তু রুবলের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের কোন পরিবর্তনই ঘটেনি।

বস্তুতপক্ষে সোভিয়েট স্টেট ব্যাঙ্ক ১৯৭১ সালের পর থেকে প্রতি মাসেই রুবলের দাম বাড়িয়েছে এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন এমনভাবে ঘটিয়েছে যে, রুবলের দাম ৮.৩০ টাকা থেকে ১৪.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ক্রেমলিন থেকে অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই বিনিময় হার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অতীতেও বারবার এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার তা ভঙ্গ করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালে চুক্তি অনুযায়ী একতরফা রুবল পুনর্মূল্যায়নের সময় মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এর ফলে ভারত সোভিয়েত বাণিজ্যের ব্যাপারে শতকরা ৩ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন হবে। কিন্তু ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশব্দের মত এই বলে নতুন ঘোষণা জারী করা হয় যে, পুরাতন সময় ভঙ্গ ৭৭ পরিশোধও নতুন বিনিময় হার অনুযায়ী করতে হবে। এ নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে অনেক বিতর্ক চলে। কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রীর দীর্ঘসূত্রতা করার জন্য মস্কোর বিমান কমিশন থেকে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এক প্রতিনিধি দল এদেশে আসে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় ১৯ দিন কাটিয়েও কোন ফল হয়নি। অর্থাৎ মস্কোর একতরফা সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। মস্কো থেকে অতিথি সেবা করতে গিয়ে ভারত সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি দল মস্কো যায়, কিন্তু পরিস্থিতি অচলায়তন অবস্থায় থেকে যায়।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার পুরাতন বাণিজ্য হয়ে যাওয়া সমরাস্ত্রের ও ভারী যন্ত্রপাতির সব থেকে বড় খরিদ্দার হল ভারতবর্ষ। মৈত্রী চুক্তির নামে সামরিক চুক্তি করে সামরিক সাজসরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ক্রেমলিনের চক্রান্ত এখন অধিতীয়। ১৯৭৭ সালে মাত্র এক বছরের জন্য দিল্লীতে ৯০০ কোটি টাকার বাণিজ্যিক প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকা, ১৯৭৪ সালে ছিল ৬০০ কোটি টাকা, ১৯৭৩ সালে ৫০০ কোটি টাকা, ১৯৭২ সালে ছিল ৪১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ বছরের ব্যবধানে বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে মূল্যের হিসাবে দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। এছাড়া ১৯৭৮ সালে প্রোটোকল ছাড়াই কাঁচামাল রপ্তানীর বিনিময়ে ১ বিলিয়ন টন অপরিশোধিত সোভিয়েট তৈল আমদানীর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে সোভিয়েটের প্রায় ৫০ কোটি রুবল মুনাফা হচ্ছে। রাশিয়ান খনিজ তেলের জন্য সোভিয়েটের প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকেই অনেক বেশী দাম দিতে হয়।

নিউক্লিয়ার ও কেরোসিনের দাম নিয়েও সোভিয়েট ব্লাকমেলের দুর্নীতি রীতিমত উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষের পাটের বাজারে যখন খুবই মন্দা চলছে তখন রাশিয়া ৩০% কম রপ্তানী শুল্ক দিয়ে পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করতে ভারতকে বাধ্য করে। সোভিয়েট থেকে আমাদের যেসব আমদানী জাত দ্রব্যের মূল্য সব সময়েই আন্তর্জাতিক বাজারের চাইতে বেশী হয়। এক টন নিকেলের জন্য রাশিয়া আমাদের কাছ থেকে দাম নেয় ৩০০০০ টাকা। আর ইউরোপীয় বাজারে এর দাম ১৫০০০ টাকা। একতরফা বিনিময় হার পরিবর্তনের জন্য ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বার্ষিক খাতে আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০ কোটি টাকায়। গত ৩ বৎসরে রুবলের অবমূল্যায়নের ফলে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে শতকরা ১৫%।

ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য-চুক্তির বাজে নয়য় যারা অনুযায়ী কোন পক্ষই একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কিন্তু একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের যেসব বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পের ১৫%, লৌহ-ইস্পাত শিল্পের ৩৫%, ভারী শিল্পের ৮০%, কয়লা উৎপাদনের ১০%, তৈল শোধন শিল্পের ৯২%, তৈল উৎপাদনের ৮৫% নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ভারত সহ অন্যান্য তৃতীয়বিশ্ব দেশগুলিতে সোভিয়েট সহায়তায় প্রকল্পগুলোর নাম হ'ল টুইচ ট্রেড সিস্টেম। এর অর্থ হল সিদ্ধি প্রকল্পগুলোতে উৎপাদিত বস্তু কেবল মাত্র রাশিয়ার জন্যই প্রস্তুত। যেমন, তিলাই, বোকারো ইত্যাদি প্রকল্পগুলোতে উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণ একমাত্র রাশিয়া। এর আর এক নাম হল টার্ন কী সিস্টেম। মানে হয়ে যাক কিনে বিশ্ববাজারে দামাদামে

P 29652

থেকে পরস্ত প্রথম মুখোমুখি সৃষ্টি করা ছাড়াও পেন্টাগনের আর একটা পদ্ধতি হল, এই সমস্ত কোলাবরেশন অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহিত সমস্ত উচ্চশক্তির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের রাডারবাহিনীর পরিবর্তে নীতিমত আকাশচুম্বী এবং সহায়ক প্রকল্পগুলোতে উৎপাদনের জন্য আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম শিল্পজাত দ্রব্যই সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে আসা। তাতে প্রস্তুত নিশ্চিহ্নের উপর "মেড ইন সোভিয়েট ইউনিয়ন" ছাপ মেরে বিদেশের বাজারে চড়া দরে বিক্রি করা হয়। কিছুদিন আগে আংকটাড-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই ধরনের খোলাখুলি অভিযোগও করেন।

পরিচিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে অনেক অধিবেশন-এর পাটচক্রা বেঁধে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর ওপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব-বৃদ্ধির কথা সকলেরই জানা। ব্রাসিলোইকে সল্ট-১ চুক্তি করে অন্যান্য দেশগুলোকে নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু করে রাখার পর-বার্কিন বৌথ উদ্যোগের পরিধি আরও বৃদ্ধি পেয়ে গত ১৮ই জুলাই তারিখে ভিয়েনায় সল্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১৯৮১ সালের ভেতরে সল্ট-৩ চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য মিলিত সভার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, "সল্ট ৩ চুক্তিতে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলার ও তেজস্ক্রিয় এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ করার অঙ্গীকার করা হবে।"

রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেনাপতি জোসেফের ন্যায় সাম্প্রতিককালে সেনাপতি কিসিঞ্জার ওয়াশিংটন ও পেকিংকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেলগ্রেড সম্মেলনে পরোক্ষে সোভিয়েট রাশিয়াকে দোষারোপ করা হয়। অর্থাৎ মাইকেলের মত আফ্রিকান ইউনিটি, আরব লীগ ও অন্যান্য ছোট বিদেশের গোষ্ঠীগুলিতে ভাঙন ধরানোর জন্য রাশিয়ার উপর আক্রমণের চেষ্টাও আজ সকলের কাছেই পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম-আফ্রিকা পশ্চিম-এশিয়া, ইন্দোচীন, আফ্রিকার পূর্ব, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়া ইত্যাদি স্থানে রাশিয়ার ক্রিয়াকলাপ তার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাঁড়ামি প্রমাণ করে দিয়েছে। কুশেভ তত্ত্বের, অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাবাদের" পথ অতিক্রম করে ব্রেজনেভ তত্ত্ব এখন "অর্থনৈতিক সহযোগিতা-প্রতিযোগিতাবাদের" পথ অনুসরণ করে চলেছে।

পুঁজিবাদের পথে প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, ১৯৭৭ সালে প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাবলিশন বিল" বাতিল করে বলা হয়, "জনজীবনের ওপরে এ বিলের মারাত্মক মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে।" জনগণের অভিযোগ, "একটা নিজস্ব গাড়ি অথবা একটা নিজস্ব বাড়ী থাকলে মোটেই সেটা দোষের হয় না।" ফলিত কল পার্টি ও সরকার কর্তৃপক্ষ খুব ভালই বোঝে যে, সমাজের একটা অংশকে গাড়ী ও বাড়ীর মালিক করতে গেলে তাদের মাস মাইনার আকাশ পাতাল কারাক সৃষ্টি করতে হবে। তথাপি কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একেই বলে সাবেকী পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিতভাবে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরী করা।

চলতি বছরের ২৮শে জুন থেকে ২৯শে জুন অবধি মস্কোয় এম পি ই এ-র গঠনতন্ত্রের সংশোধনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সুইচ টেক অথবা টার্ন কী পদ্ধতিতে বিদেশে এবং বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ও অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহতগতি পরিচালনা করে চলেছে। বিশ্বের অনেকগুলি ধনী রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে চীন সরকার এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত এই যে, বন্ধুদের মধ্যে ছাড়া এ বিষয়ে আমরা অন্য কারো সঙ্গে কোন রকম আলোচনায় রাজী নই।" এম পি ই এ-র অর্থাৎ "Mutual co operation for economical assistance" নামক সংগঠনটির বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমেরিকার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে এরা সব সময় সন্ত্রস্ত।

সোভিয়েট রাশিয়ার সা ছা ত্য বা দে সোমাস্থরিত হবার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, বাজার দখলের জন্য যেন তেন প্রকারেণ ধরিয়া থাকবার। বিগত বছরে সোভিয়েট বোমারু বিমান বিনা প্রয়োজনে দক্ষিণ ইয়েমেনে মারাত্মক ভাবে বোমা বর্ষণ করে মেরে আট হাজার পার্বত্যপ্রিয় ইয়েমেনবাসীকে হত্যা করেছে। আফগানিস্থানে নূর মহম্মদ তারাকির সহায়তায় রাশিয়ার পরোক্ষ আক্রমণ এখন প্রত্যক্ষ আক্রমণে পরিণত হয়েছে। যার শেষ পরিণতি হল, এই আগষ্ট তারাকি সরকারের মন্ত্রাভাবে ব্যতিব্যস্ত ও হুমায়ুন বাদ দিয়ার দুর্গের সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আকাশ থেকে সোভিয়েট বোমারু বিমান ওপেলিকপ্টার এম এম-২৪ নিজস্ব ভাবে বোমা বর্ষণ করে বাদ-দিয়ার দুর্গটিকেই ভস্মসাৎ করে। হেড মাস্টারিনে দুয়ারে সকের প্রত্যেক মধুতে কাম্পুচিয়া দখল করে সোভিয়েট রাশিয়া এক আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। চীন-ভিয়েতনাম সীমান্তে যুদ্ধ আক্রমণ করবার ফলে চীন ভিয়েতনামী জনগণের দীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

সাধন সীমাহীন বলশেভিক চুক্তিরের মহাযোগের অধিকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। কল সমাজবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া ও তাজানিয়ার জনগণ দলগত সংগ্রাম শুরু করেছেন। নতুন সীমার অধিকার রক্ষা করা নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি যে সংগ্রাম শুরু করেছে, আজ তা দুই বৃহৎ শক্তির সামুদ্রিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেছে। দলগত সংগ্রামের আগুনের মধ্য দিয়ে তার নিয়েছে সিভিলিয়াই প্রজাতন্ত্র।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মত কল সামাজিক আধিপত্যবাদীদের সম্পর্কে পরিচয় দিতে গেলে অনেক কিছুই বলা এবং ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধের আসল বক্তব্য, যত পরিসরে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমুক্তির প্রশ্নে বিশ্ব সম্পর্কে অনুলি নির্দেশ করা। যখন কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা সোভিয়েতবাদীদের করতলে চলে যায় তখন সেই রাষ্ট্রের চরিত্র সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া। এবং তার উপর নির্ভরশীল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পরিণত হয় তার উপনিবেশে। যেমন, ভিয়েৎনাম, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি।

লেনিন বলেছেন, "তখন সমাজতন্ত্রী হলেও সুবিধাবাদের অনিবার্য পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদে। লেনিন আরো বলেছেন সাম্রাজ্যবাদী পরিবারের নতুন আগন্তুকের কাছ হল অন্য হিস্যাদারদের কাছ থেকে বড়টা পরিমাণ অংশ সম্ভব ছিনিয়ে নেওয়া।" এবং এরাই যুদ্ধ ও শান্তির সব থেকে বড় বিপদ।

অতএব লেনিনের মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে বর্তমান বস্তুগত বিশ্বপরিস্থিতিকে মেলালে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া যে মুক্তি, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির সবথেকে বড় শত্রু একথা না বোঝার অবকাশ থাকে না।

লেনিন একথাও বলেছেন, : "বুর্জোয়ারা পথ চলার সময় পথের ধারে নিজেদের কবর খুঁড়তে খুঁড়তে চলে, এবং তার পতন অনিবার্য।" অতএব প্রমাণিত তথা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনও অনিবার্য।

# প্রসঙ্গ ঃ বিভূতিভূষণ

## রণজিৎকুমার সেন

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫০ 'পথের পাঁচালী'র সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ সমাদর ও সম্মান লাভ করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৫০ সালের দীর্ঘবিলম্বিত ভাবনার সার্থক ফল এই 'পথের পাঁচালী' ও তার পরিপূরক গ্রন্থ 'অপরাজিত'। নিশ্চিন্দিপুরের জীবনে যে-কাহিনী অপু-দুর্গা দিয়ে শুরু, জীবন-রহস্যের মধ্য দিয়ে অপুর পুর কাজলের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি। দীর্ঘ বছরের অবসানে সেই 'কাজল'ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় বিভূতি-পুত্র তারাদাসের যোগ্য লেখনী স্পর্শে। গ্রন্থ ছিল বিভূতি-ভূষণের কাছে দেবী ভগবতী। তাই অপু একদিন খড়্গপুরে গিয়ে পল্লীদেবীর কাছে যখন প্রার্থনা জানালো : 'অন্য কিছু চাইনে, এ গাঁয়ের বন-জোপ, নদী, মাঠ, ঘাস-বাসাবের ছায়ায় অবোধ উদ্ভ্রীব বয়সের আমায় যে সেই দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি, তাকে আর একবার ফিরিয়ে দেবে দেবী ?' তখন অপুর মুখ দিয়ে আমরা যেন শুনতে পেলাম বিভূতিভূষণেরই আকুতি বড় স্পষ্ট শুনতে পেলাম! বস্তুতঃ, পল্লীপ্রকৃতির শ্যামল ছায়ায় মানুষ হয়ে চিরকাল প্রকৃতির কোলেই বিচরণ করে কাটিয়েছেন তিনি . নাগরিক সভ্যতার স্পর্শ তাঁকে কোনোদিন বিভ্রান্ত করতে পারেনি। এদিক থেকে 'পথের পাঁচালী' ও তার স্রষ্টা অভিন্ন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন বইখানি প্রকাশিত হ'লো—২রা অক্টোবর ১৯২৯, লেখিকা বিভূতিভূষণ তাঁর ডায়রীতে লিখলেন :

—'আজ বই বেরুল। এতদিনের লালন পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত।—আজ এই নির্জন নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হলো যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নাধারা রাত্রি, তার ফুল-ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সেই অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের ঘরে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার লক্ষ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর। আজ বিশ বছরের দূর-জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাই আজা, ভেলাবুড়ো ফল-জোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে জানাতে চাই : কুলি নি · কুলি নি! যেখানেই থাকি, কুলিনি! তোমাদেরই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদূর অনাগত দিনের বিচিত্র ও বিচিত্র সুর মধ্যে তোমার ছোটো এক-তারার উদার, অনাবৃত বঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ সংযোগের থাকে।'

বিভূতিভূষণের উপলব্ধি অপুরই উপলব্ধি। তাই 'অপরাজিত'-তে অপু যখন মনে করে—'জীবন খুব বড় একটা রোমাঞ্চ, বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমাঞ্চ। অতি বৃদ্ধবয়স, চীনদেশ, একঘেয়ে কাজের রোমাঞ্চ!' তখন তা লেখকের নিজের বাণী হয়েই আমাদের মনের তারে এসে বাজে। এই বাজের দ্বারা তাঁর আরও যে চারখানি গ্রন্থে ঝঙ্কার দিয়ে আছে, তা হচ্ছে 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী'।

বস্তুতঃ জীবনের অন্যান্য অনুভূতির মতো বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতিও ছিল একটি অনুভূতি। এই চেতনা যার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি জীবনকে কিছুতেই বৈষয়িক দৃষ্টিতে বিচার করেন না, জীবনের মূল্যায়নই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রকৃতি ও মন' শীর্ষক প্রবন্ধের কিছু-অংশ উদ্ধৃত করা যায়। বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'জীবনের সার্থকতা' অর্থ উপার্জনে নয়, পুষ্টি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়, সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করার আনন্দের মধ্যে।—মানুষের মন যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের মন দিয়ে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অন্যে চেয়ে অন্য মহানের চেয়ে মহান বিশ্বসত্তা প্রতি অণুরেণুকে যত আয়ত্ত করে তুলতে পারবে, সে শুধু নিজের উপলব্ধি করবে না, নিজের মধ্য দিয়ে সে পরাজীবন সঞ্চিত অন্ধকারতল ও জড়তাকে প্রতিভার এ বিশ্বসৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে সে সত্য সত্য কালের মানুষ।'

এ যে তাঁর সাহিত্যেরই কথা, তা নয়, এ তাঁর জীবনেরও কথা। চিরকালের যাযাবর বিভূতিভূষণ প্রকৃতির বুকে বুকে ঘুরে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি সেই অনুপ্রাণনা তাঁকে অন্তর্মুখীনতার নিমগ্ন করেছে। তিনি বলেছেন : 'আমাদের এই বিশ্বসৃষ্টি সমাজের দেহী মন দিয়ে আমরা তো উপলব্ধি করতে পারি-নে! শুধু-অন্তরালের মন দিয়ে সেই এক এবং অদ্বিতীয়

পরমাত্মা তাঁরই কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন। একদিন এ তত্ত্ব শেষ হয়ে যাবে—এদিন ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটবে।'

তাঁর এই অধ্যাত্ম চেতনা সম্পর্কে অনেকের মনে হয়তো তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সাধির এই জীবনের উপর যে আরও এক মহত্তর জীবন আছে এবং সে জীবন যে অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ এক অসীম চেতনালোকের আকর,এবথা ভারতীয় দর্শন থেকে বিভূতি-ভূষণ নিজে অত্যন্ত সহজভাবেই আত্মস্থ ক'রে নেবেছিলেন। ১৩০৩ সালের ২৮শে ভাদ্র চব্বিশ পরগণার তাঁর জন্ম; পৈতৃক-বাস মনোহরে। এমন পরিবারে জন্মেন যে বিভূতিভূষণ—যেখানে যথেষ্ট প্রাচুর্য আছে। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ হয়ে কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তি বেছে নেন। শিক্ষকজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন তিনি 'অনুবর্তন' উপন্যাস। বাংলার অন্তরপ্রকৃতিকে রূপায়িত করবার মতো লেখনী নিয়েই জন্মেছিলেন বিভূতিভূষণ। কোথাও তাতে বাদ থাকে নি। তিনি ছিলেন মূলত: কবি, কবি হয়েই রয়েছিলেন। হৃদয় ছিল তাঁর অধ্যাত্মবাদ ও পরলোক বিজ্ঞানে তন্ময়। এই তন্ময়তার ফলস্বরূপ পাই তাঁর 'দেবযান' উপন্যাসকে। যে দৃষ্টা জ্যোতিস্বরূপ ও ঊর্ধ্বময়, উপন্যাস আকারে দেবযানে তাঁরই আভাস দিয়েছেন বিভূতি-ভূষণ। তাঁর অবসর বিনোদন চলতো উপ-নিষদের আলোচনায়। ভারতীয় দর্শনের তিনি ছিলেন উপন্যাস-ব্যাখ্যাতা। বিভূতি-ভূষণ বলতেন : 'গতিই জীবন। গতির থেমে যাওয়াই মৃত্যু।'

তাঁর এ জাতীয় বিভিন্ন রচনা ও বক্তব্য পাঠ করে তখন কেবলই মনে হতো—রবীন্দ্রনাথের পর সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যে এতবড় দার্শনিক চিন্তা অন্যত্র বিরল। বিভূতিভূষণের এই দিকটি আমার দর্শন-অনুসন্ধিৎসু মনকে এবং সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেছিল। অন্যদিকে প্রকৃতি-বর্ণনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আমার পূর্বে একবা সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত মাসিক বসুশ্রী পত্রিকায় 'বিচিত্র জগৎ' বিভাগটি সম্পাদনা করতেন বিভূতিভূষণ। পরে ঐ মাসেই ঘি, এম, লাইব্রেরী থেকে তাঁর এই প্রকাশিত হয়। 'পথের পাঁচালী'র পাঠক অবাক হয়ে যাবেন—কি ক'রে একই লেখ-কের হাতে 'বিচিত্র জগৎ' সৃষ্টি হতে পারে! আমার মনেও যে এমন প্রশ্ন ছিল না, তা নয়। উত্তরকালে আমি যখন 'বসুশ্রী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন বিভূতি-ভূষণকে একদিন কাছে পেয়ে চায়ের টেবিলে ব'সে সেই প্রশ্নটি তুলে ধরি। তিনি বললেন : 'তোমার হয়তো এও মে ইউনি-ভার্সাল ডিওগ্রাফিকাল ম্যাগাজিন চলছে আছে, তাতেও বিচিত্র জগৎ তোমার মাথায় এলো না?'

বুঝলাম—কি বলতে চাইলেন তিনি। অর্থাৎ ঐ ম্যাগাজিন থেকেই তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য অনু-বাদ ক'রে তিনি মৌলিক বাংলাভাষায় বাংলা রেখে ছিলেন বিচিত্র জগতের। শুনে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম। অবশ্য লজ্জা ক'রে দেখলাম—প্রশান্ত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন বিভূতিভূষণ। তারপর পুরনো দিনের বসুশ্রীকে কেন্দ্র ক'রে টুকটাক এবথা সেকথা। প্রসঙ্গত: এক সময় জিজ্ঞেস করলাম : 'আপনি প্রথম কেমন ক'রে কার থেকে লেখার বিভূতিবা?'

হেসে বিভূতিভূষণ বললেন : 'সে এক মজার ব্যাপার। বি, এ পাশ ক'রে সদ্য কেবল গ্রামের স্কুলে মাষ্টারীতে ঢুকেছি, এমনি দিনে বছর পনেরো-ষোল বয়সী একটি ছেলের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ছেলেটি কবিতা লিখতো, নাম পাঁচুগোপাল। মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে সে যেতো, কখনো-কখনো বা লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়াতো, নিজেও পড়তো। সেই বয়সেই পাঁচুগোপাল সাহিত্যের এক-ক্ষেত্রেটো হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য—আমাকে দিয়ে সাহিত্যে যে কিছু করাবেই। অথচ কি লিখবো, কেমন ক'রে লিখবো, এইটেই তখন আমার কাছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। কিন্তু কি জানি কোন্ এক অবচেতন মুহূর্তে হঠাৎ একদিন লিখে ফেললাম। লিখে পাঁচুগোপালের মনে খুশী আর ধরে না। তাবতে আজ অবাক লাগে যে, সেই কাঁচা হাতের অনভ্যস্ত লেখা কি ক'রে সেদিন কলকাতার মাসিক-পত্রে ছাপা হয়েছিল!'

বললাম : 'অবেতের মতই আপনাকে তাহ'লে সোজা থেকে বৈর্য নিয়ে এগোতে হয়নি। আপনার আজকের লাকলেস আপনারদেই প্রথম গল্পতেই লুকিয়ে ছিল!'

কথা না ব'লে এবারে মুখ টিপে হেসে বিভূতিভূষণ বললেন : 'আর এক কাপ কড়া চা খাই।'

নতুন ক'রে চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম : '১৩৫০-এর শারদীয়া সংখ্যা সাহারা-য় যখন আপনার 'প্রকৃতি ও মন' প্রবন্ধটি পড়ি, তখন 'পথের পাঁচালী' পড়বার মতই অভিভূত হয়েছি। এখনো তার অনেক লাইন আমার মুখস্থ আছে, শুনবেন?'

নির্বাক দৃষ্টিতে এবারে আমার মুখের দিকে তাকা-তাকা চোখ দু'টোকে তুলে ধরলেন বিভূতিভূষণ।

মতটা মনে এলো—আমি বলতে শুরু করলাম। দেখলাম—অভিভূতের মতো বিভূতিভূষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বলরাম : '১৩৪০ এর সেই মধ্যে পড়তে আপনার 'প্রকৃতি ও মন' এর এই কথাগুলি এক নতুন উপলব্ধির এনে দিয়েছিল আমাকে।'

শান্তস্বরে বিভূতিভূষণ বললেন : 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—তোমার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি আর স্মৃতিশক্তি দেখে।'

বলরাম : 'ও কিছু নয়। আপনি বরং গল্প বলুন, শুনি।'

কোনো ভূমিকা নেই, চা খেতে খেতে অনেক গল্প করলেন বিভূতিভূষণ। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'দেবযান' অধিকাংশই তাঁর জীবনসংক্রান্ত গল্প। পরলোকবিষয়ক আত্মিনীও তার সঙ্গে কম যুক্ত নয়। সেই জীবনের সঙ্গে মিশে আছে পল্লীর মন-প্রকৃতি। সেখানে ছোট একটি বিভূতি-লতাও চোখে আড়াল পড়েনি। এসময়ে তাঁর 'দিগবলয়' মাসে একখানি একটি অভিচিত্র প্রকাশ করবার মনস্থিতে। তার যা বর্ণনা, পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণের সেই আত্মিনীর মনে মন ছুটে যায়। যেমন—

'...যে ক'টা জিনিস আমার ভালো লাগছিল, তার মধ্যে প্রথম একটা হচ্ছে চাষিবাসের নির্জনতা,—যেদিকে চাই, কোনোদিকে কাউকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—গাছপালার প্রকৃতির কোনো দৈত্য চোখে পড়ছিল না,—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, মূলে, ঘাসে, অফুরন্তশক্তির প্রকৃতির পরিপূর্ণ যজ্ঞ সৌন্দর্য। এই আছে, তার পিছনে আরও, তার পিছনে আরও, ঘুরে ঘুরে আরও বাধা হরবের ঘন ঝোপের সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অথচ নতুন নতুনে অবাট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামতো যত ইচ্ছা দেখতে পারি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই ক'রে পোতা দু'দশ রকমের গাছের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির উপরে নানা জাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে—একটা বড় শাইবাবলা গাছ, তলায় আধ-শুকনো উপ্ত বড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচী গাছ, আমলেওড়া, ওঁট, কচু, ওল, বিছুটিলতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। দুর্গাটুনটুনি পাখি এরেবারে কানের কাছে সেওড়ার ডালে বসে চুচ্‌চুচ্‌ করছে। বড় দুঃখ হলো, সঙ্গে কোনো বই আনিনি। গ্রামে ফল যোগায়, এখন বই যদি পড়তে হয়, তবে এই তার স্থান, এইরকম শান্ত নীরব অপরাহ্ণে এই-রকম ঘুঘু-মাঠের ধারের নির্জন ঝোপের মধ্যে তার হাতের খুঁটি দিয়ে ঘাসটাকে উঁচু ক'রে পাশ দিয়ে শুয়ে শেলির কবিতা, কি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কি মাকরেয়ের ধার্মনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস, কি ঐরকম একটা কিছু।...গাছগুলোর পাতার ফিকে চেয়ে মনে হয়, মাঠের মধ্যের এই গাছগুলো সেগুলো গাছ, এই গাছের উপ্ত-গুলোও নয় কোটি মাইল দূরবর্তী সূর্যের দিকে পত্রপুষ্প বিস্তার করে আছে প্রাণশক্তির ইন্ধন ভিক্ষার আশায়। ঐ বিরাট অদ্ভি-দিগন্তের লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ প্রচণ্ডতম হাইড্রোজেন-শিখার ধক ধক্‌ নীলায় আকাশে পৃথিবীর মাঠের এই গাছের বিছুটি লতাটিরও জীবন যুগানো রয়েছে—ওয়ার্ডসওয়ার্থের যেমন তখন মনের মধ্যে নতুনতর যোগাবে, শেলির কবিতার নতুন অর্থ হবে।'...

এমন বিস্তৃত চরাচরব্যাপী প্রকৃতি বর্ণনা বাংলাসাহিত্যে বোধকরি খুব বেশী নেই। প্রকৃতির প্রতি এই মমতা বিভূতিভূষণকে সমসাময়িককালের পরিবর্তনশীল বস্তুবাদী সাহিত্যিকতার উর্ধ্বে এক নতুন অধ্যাত্ম-জীবনে তুলে ধরেছিল। তেমনি প্রেতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজের অলক্ষ্যেই যেন কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলে যেতেন। প্রায়ই তিনি তাঁর 'দেবযান'-এর কথা বলতেন। আর অন্তরের দিক থেকে উর্ধ্বলোকবিহারি ছিলেন বলেই সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। জীবনে অর্থের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অর্থ-সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল অসাধারণ। এমন মানুষটি ছিল যেন এযুগে একজন অবস্তু শিল্পীকে কল্পনাই করা যেতো না।

'পথের পাঁচালী'র যে প্রাকৃতিক বর্ণনা, তার পরিপূরক চিত্র খুঁজে পাই 'আরণ্যকে' ও 'উপহারটী'তে প্রকৃতির কবি তিনি, প্রকৃতিকে তিনি অতিরিক্ত করেছিলেন মনন্তে। তাই যে কোনো জায়গার মানুষই একটা প্রশান্তির আশ্রয় খুঁজে পেতো সেখানে —সেখানে অপূর্ব দুর্গার বিচিত্র গ্রাম-পরি-বেশের বর্ণনা দিতে দিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন : '...বৈশাখের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব নীচ আসিয়া পড়িল। অদূরের নারকেল বাঁশ-ঝাড়ের বাঁশগুলো পাড়িলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হইয়া ওধারের পড়াতে বাড়িটা যেন ঢাকা ঢাকা দেখাইতে লাগিল—মূলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, ঝড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাড়ির বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপু ও ইন্দির পিছু চলিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগ্‌গির ছোট, তুই বড় সিঁদুরেআটা—তলায় থাক, আমি যাই নোনাডাঙীতলায়-দৌড়ো দৌড়ো। মূলার চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে ভাঙিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে কাঁ কাঁ, কাঁ কাঁ শব্দে বাতাস বাহিতেছে—বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা দু'চারটা আমাটা উড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে মুক্তপিঙ্গা

গাছের ডাঁয়ে ঘন পাতাওয়ালা নাম-না-জানা ফুল গাছের বুকে জোনাকি হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—তারাদের সঙ্গে তার পাতা যায় না।"

এমনি আর একটি দৃশ্য :"...সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনকোল, বিলুল বাবুল গাছ, বেড়ার গায়ে বেড়েলের ঝাড়ি ফুলিতেছে, শোঁয়ালি ফুলের ঝাড় ফুলিতেছে, চারিধারে বৈ বৈ করিতেছে পাখিদের ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিথির ফুলের রং-এর মত পাতলা নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথাও বাধে না, যত দূরে যায় সোনা উলুখড়ে মাঠের মধ্যে কোথাও আবার যাই, শুধুই সাদাসাদা—বনকোলের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটায় ভাবপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা দূরত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বাঁয়ালে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন্ প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা যেন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলা শেষের পশ্চিমটে আবার কত কি নৈসর্গ-কল্পনার আসা-যাওয়া। এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল। এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন দেখা সে অপূর্ব জীবন।"

আর একবার বিভূতিভূষণের গদ্যে এক রকম আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে গেল কলেজ ষ্ট্রীটের বইয়ের পাড়ায়। ঘটনার পাঞ্জাবী গায়ে, মুখে প্রতিভার ছাপ থাকলেও প্রথম হেসে আমাকে কাছে টানলেন। কুশল প্রশ্ন এবং আরও দু'একটি কথা সেরে বিভূতিভূষণ বললেন : 'এ পাড়ায় কাজ চুকিয়ে-ছেন, না এখনো বাকি আছে ?'

বিভূতিভূষণ বললেন : 'কাজ আর কি, একবার রিয়ু-মেয়ে এসে বিভূতি ব'লে গেলাম।'

বললাম : 'চলুন, চা খাই। তবু বিভূ-তির এখানে আপনাকে কাছে পাবো।'

বিভূতিভূষণ বললেন : 'চলো কোথাও বসি।'

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এসে বসলাম হ্যারিসন রোডের মোড়ে জামবাবুর চায়ের দোকানে। দোকানটার তখন খুব নাম-ডাক ছিল, এখন উঠে গেছে। জামবাবু, বিভূতিরা খেতে খুব ভালোবাসেন, তাই বিভূ খাবার আর চায়ের অর্ডার দিলাম।

বিভূতিভূষণ আপত্তি করলেন না; জিজ্ঞেস করলেন : 'বঙ্গশ্রী কেমন চলছে ? কি লিখছো তুমি এখন ?'

বললাম : 'আপনাকে দিয়ে আমার যদি বঙ্গশ্রীতে বিভূতি লেখাতে পারতাম, কী ভালোই না হতো ! কিন্তু তা কি পাবো ? লেখার কথা ব'লে দিলে আপনার মনেও থাকবে না। আমার লেখা আর কি, যখন যেরকম মনে আসে, পাঁচরকম লিখি।'

তবে মুখ টিপে হেসে হঠাৎই যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ।

ইতিমধ্যে বয় এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল।

বললাম : 'বিভূতিদা, খান।'

বিভূতিভূষণ এবারে ডিমের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হাঁ, খাও, গুরু করো।'

খেতে খেতে ইচ্ছাকৃত নানা কথায় সময়টা বেশ কেটে গেল। আসলে তাঁর সান্নিধ্যটাই ছিল আমার কাছে আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে তা উপভোগ করবার সুযোগ পেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল 'পথের পাঁচালী'র নানা সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর 'আরণ্যক'-এর একটি দৃশ্য—যেখানে তিনি লিখেছেন : ..."রাত্রির গভীর। এতা প্রান্তর বহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অজস্র গিয়াছে। কোনোদিকে আলো দেখা যায় না, এত অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্ত রেখায় অনুচ্চে বৃক্ষশ্রেণি উঠিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্কলোক, নিচে অবটুলিয়া ঘইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ মজ্জাজোকে পাতলা অন্ধকারে বন ঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে, দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা জিমাক করেছে সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখা-যাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরনের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-রু রু-রু শব্দ ছাড়া ; কান পাতিয়া ভালো করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু'তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চ এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ !"

এরপর আর তাঁর গদ্যে দেখা হয়নি। ১৩৫৭ ( ১৯৫০, ১৯ নভেম্বর ) সালে তিনি শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মনে মনে জ্যেষ্ঠের দেহাবসানের শোক অনুভব ক'রে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেই স্তব্ধতার মধ্যে মনে জেগে উঠলো 'ইছামতী'র একটি বিচিত্র দৃশ্যপট—যার মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবন-দর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে : "...কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ের ছাপ মিলিয়ে যায়...গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আমন্ত্রণধ্বনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, দুর্গা পূজোয়, লক্ষ্মী

পুজোয়···সে সব বন্ধুদের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধুপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে···মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, পরীক্ষা মৃত্যু-আতঙ্কে ? পথপ্রদর্শক মায়া-মৃগের মত জীবনের পথে পথে পদ রেখে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যময়তা তার অবগুণ্ঠন খানায়। খোলে নিত্য কাছে, কখনো দূরের কাছে···ভেলাকুচো ফুলের পুনশ্চে অমরত্বের সে সুর কানে আসে— কানে আসে বনৌষধির কটুস্নিগ্ধ সুবাসে, প্রথম চেয়ে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইচ্ছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল ঢল রূপে সেই অজানা মহানদূরের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ···কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস যাযাবর ঐ নদ বাঁধে, ঐদূর নির্জন তিটের টিপি—কত নূপ হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অমৃত রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার ঘরে ডাকে বধূরে

প্রখ্যাতঃ শ্রীবিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' ও 'ইচ্ছামতী' গ্রন্থত্রয়কে কেন্দ্র ক'রে বিভূতিভূষণ যে অনন্য সম্পদ রেখে গেছেন, তাকে ছাড়িয়ে যায় তুলনা নেই।

# আত্মা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

শ্রীবিকাশ

আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যাপারটা অনেকটা লগ্ন বিশ্বের মতই উদ্বেগময় ব্যাপার। আত্মা-পেত্নী তা মানুষের জ্ঞান-অজ্ঞান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং সচেতন ও অবচেতন মনের উপর প্রাগৈতিহাসিক কুঠারঘাত।

আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে অদ্ভুত একটা গুজব আছে। আত্মাকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টায় নাকি দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত কাঁচের জানালা বা তার ভেঙ্গে যায়। গুজবটার ব্যাপকতা নানা পৃথিবীময়। সম্প্রতি ডাঃ জেকোস্লোভাকিয়ান আমেরিকার হলিউডের চলচ্চিত্র থেকে এই গুজবের উৎপত্তি। তবে আত্মা নিয়ে গবেষণা করে গত দুশকে এমন কিছু বিচিত্র তথ্য পাওয়া গেছে যা প্রচলিত জ্ঞানকে বড় উপহাস করে।

আত্মার দেহত্যাগের সঙ্গে মৃত্যুর কি সম্পর্ক এবং আত্মার দেহত্যাগের কি কোন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের প্রাক্তন প্রবাদ ডাক্তার ডানকান ম্যাক্ ডগলাস অদ্ভুত গবেষণা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, আত্মার দেহত্যাগের পরেই যদি দেহের মৃত্যু ঘটে তাহলে মৃত্যু মুহূর্তে দেহের ওজনের তারতম্য হওয়া উচিত। বাস্তবিক নিয়মে যে কোন বাস্তব অস্তিত্বের ওজন থাকতে বাধ্য। তিনি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের একটি সাধারণ ওজন যন্ত্রকে ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ করবার পরিবর্তিত করে তাতে একটি এ্যালুমিনিয়ামের খাট এমন ভাবে যুক্ত করলেন যে একাধিক মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে ঐ খাটের উপর শুয়ে থাকা সম্ভব। তারপর একটি মৃতপ্রায় রোগীকে ঐ খাটে শুইয়ে দিয়ে ডাঃ ডানকান ম্যাক্ ডগলাস সহকর্মী অন্যান্য ডাক্তারদের আমন্ত্রণ জানালেন।

দেখা গেল, রোগীর ওজন ধীরে ধীরে প্রতি ঘন্টায় ১ আউন্স করে কমছে। প্রথম রোগীটির ক্ষেত্রে দেখা গেল ১ ঘন্টা ৪১ মিনিট পর যখন তার মৃত্যু হল তখন হঠাৎ ওজন যন্ত্রের কাঁটা ক্ষিপ্রগতিতে নেমে চলে আশ্চর্যভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল মৃত্যুর পূর্ব ওজনের এক তৃতীয়াংশ আউন্স ওজনের কম নিয়ে। একটি রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেল ৪ ঘন্টা ১০ মিনিট পর্যন্ত প্রতি ঘন্টার গড়ে আধ আউন্স ওজন কম হওয়ার পর মৃত্যুর পরমুহূর্তে দেহের ওজন কমে গেল আধ আউন্স। দীর্ঘ কয়েক মাসের গবেষণায় দেখা গেল, মৃত্যুর পর দেহের ওজন কম হচ্ছে হয় আধ আউন্স অথবা এক তৃতীয়াংশ আউন্স। একই সঙ্গে ডাঃ ম্যাক্ ডগলাস লক্ষ্য করলেন, মৃত্যু মুহূর্তে ওজন যন্ত্রের কাঁটা হঠাৎ এক ও একচল্লিশ মিনিটে তীব্র অপ্রত্যাশিত ভাবে নড়ে চড়ে ওঠে। কখনো কখনো তিনি রোগীর মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগে ওজন যন্ত্রের কাঁটা ঈপ্সিতভাবে থামা অবস্থা বার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েও দেখেছেন ওজনের পার্থক্য হচ্ছে আধ আউন্স অথবা এক তৃতীয়াংশ আউন্স। একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওজন কাঁটার মন্থরতম গতি ছিল দীর্ঘ পাঁচে সাত মিনিট।

কারণ ব্যাখ্যা করে ডাক্তার ম্যাক্ ডগলাস বলেছেন, শ্বাস নিশ্বাসের মাধ্যমে যে বায়ু দেহের ভিতর প্রবেশ করে সেই বায়ুতে মিশ্রিত ধুলোকণা অথবা জলকণার তারতম্যের জন্য এভাবে দুটি মিনিটে ওজনের তারতম্য ঘটতে পারে না। কারণ হঠাৎ ওজন কম হওয়ার আগে দেখা গেছে রোগীর ওজন কমেছে গড়ে ঘন্টায় এক আউন্স। অর্থাৎ, দেহাল বন্ধ আবহাওয়ায় মিশ্রিত ধুলো ও জলকণার পরিমাণ একটি মিনিটে ওজনে বন্দি ছিল। তাছাড়া, হক চলাচলের ফাঁকে দেহের শিরা উপশিরায় যে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে তা মৃত্যুর পর দেহ থেকে মুক্ত হতে যথেষ্ট সময় নেয়। তার মানে, দেহে বন্দি বায়ুর সঙ্গে মৃত্যুর পর ওজন কম হওয়ার কোন যোগাযোগ নেই। ডাঃ ম্যাক্ ডগলাস নিজে ওজন খাটে শুয়ে থাকাকালীন করে দেখেছেন ওজনের পার্থক্য আধ বা এক তৃতীয়াংশ আউন্স কম কখনো হয়নি। প্রতি তিন শ' কিউবিক ইঞ্চিতে এক আধাংশ আউন্সের যে বায়ুর চাপ থাকে তার সঙ্গেও মৃত্যুর পরমুহূর্তে ওজন কম হওয়ার কোন হিসেব নেই।

এই গবেষণার প্রমাণ হল, যে শক্তির দেহত্যাগের পর দেহের মৃত্যু ঘটে, সেই শক্তিকেই যদি আত্মা বলা যায় তাহলে আত্মার ওজন দু রকম। আধ আউন্স ও এক তৃতীয়াংশ আউন্স। প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, আত্মা কি তাহলে দু প্রকৃতির?

ডাঃ ডানকান ম্যাক্ ডগলাসের এই

৬ বিচিত্র গবেষণা কিছু অচিরেই বন্ধ হতে বাধ্য হল।

ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের এই গোপন গবেষণার খবর যখন ফাঁস হয় তখন যা হবার তাই হল। সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল চারিদিকে। এই ধরনের গবেষণা অমানবিক, পাশবিক ইত্যাদি মন্তব্য-শীল জাবির কাছে বাধ্য হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডাঃ ম্যাক ডগলাসকে গবেষণা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

ডাক্তার সাহেব শেষ পর্যন্ত তার গবেষণার রিপোর্ট লিখে হাজির করলেন অ্যামেরিকান সোসাইটী ফর ফিজিক্যাল রিসার্চ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। রিপোর্টটি ১৯০৭ সালের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শীর্ষক ছিল Hypotheses concerning soul substance, together with experimental evidance of such substance. অবশ্য উক্ত রিপোর্টটি প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদককে অসংখ্য ধর্মান্ধ পাঠকদের থেকে রীতিমত হুমকি হজম করতে হয়েছে।

প্রতিটি মৃতে আত্মাকে পরম ওজনের মান দেয়া হয়েছে। আত্মা নিয়ে বিজ্ঞানের বলতে গেলে বেশী হলে বলা হয়েছে ৩৩ গ্রাম আত্মা। আত্মা ইহ জগতের কোন পার্থিব বস্তু নয়, এ যুক্তিও প্রতিটি মৃতে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ আত্মার প্রকারভেদ ও ঐশ্বরিক অস্তিত্বের প্রচলিত ভাবের বিরুদ্ধে ডাঃ ম্যাক ডগলাসের গবেষণার ফলাফল নিশ্চিত মহলে প্রচণ্ড বিস্ময় জাগায়। কিন্তু এই নিয়ে পুনরায় গবেষণা যেহেতু ধর্মগুরুকুলকে উপেক্ষা করা, সেহেতু আত্মা নিয়ে প্রকাশ্যে আর কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে বেশ কয়েক বছর আর কেউ এগুলেন না।

শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রখ্যাত মৈত্রিক ডাক্তার হাইডন এগিয়ে এসে বললেন, রক্তিম মৃত্যুর সময় দেহের ওজন মিনিট মাত্রায় কম হওয়ার ঘটনাকে জোর করে বলা যায় না আত্মার ওজন আছে তবুও ভাবের বুদ্ধের স্বার্থে এই ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ডাঃ হাইডনের বিবৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তার হেরেওয়ার্ড ক্যারিংটন। ডাঃ ক্যারিংটন গবেষণার নতুন পদ্ধতির পরামর্শদাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি প্রস্তাব করলেন মানুষের পরিবর্তে জীবজন্তুর উপর গবেষণা চলুক।

ডাক্তার ক্যারিংটন বললেন, যদি একটি মাঝারি আকৃতির গোলাকার অথবা অর্ধ-গোলাকার কাঁচের বৈয়ামে এমন একটি যন্ত্র যুক্ত করা যায় যা একটি অপেক্ষাকৃত বড় মাপের বৈয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাহলে মূল বৈয়ামে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে অথবা বায়ু রুদ্ধ করে অপ্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে দুটি বৈয়ামের মাঝখানে বাল্বীয় চাপ সৃষ্টি করে ভিতরের বৈয়ামে যদি কোন জন্তুর জীবন হানি ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে আত্মাকে স্থান ত্যাগ করতে হবে ঐ বাল্বীয় আবহাওয়ায় ভিতর দিয়ে। ঐ বাল্বীয় আবহাওয়ায় যদি পারদ বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয় তাহলে স্থান ত্যাগের সময় আত্মা বাধা হয়ে কিছু চিহ্ন রাখবে। পারদ বিশ্লিষ্ট বাল্বীয় আবহাওয়ার ওজন তারতম্যের পরিবর্তন হবে, নয় কোন বিচিত্র রশ্মির সৃষ্টি হবে। এমন কি ঐ বাল্বীয় আবহাওয়ায় কোন আকৃতিক গঠন হতে পারে।

ডাঃ হেরেওয়ার্ড ক্যারিংটনের বক্তব্য শুনে পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর বুদ্ধিমান মহলে খুব হাসাহাসি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালে ডাক্তার আর. এ. ওয়াটার্স ছুঁসাহস দেখালেন। ডাক্তার ওয়াটার্স বিখ্যাত উইলিয়ম জেমস ফাউণ্ডেশান ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের যুক্ত এক-রে বিশেষজ্ঞ, জীববিজ্ঞানী ও পুরস্কার তত্ত্ববিদ।

ডাঃ ওয়াটার্স ডাঃ ক্যারিংটনের প্রস্তাব মতই গবেষণায় হাত দিলেন। শুধু উপরের বৈয়ামটির জন্য তিনি ব্যবহার করলেন এক ধরনের বিশেষ ধোঁয়া কাঁচ যাতে আত্মার যদি কোন অস্পষ্ট রূপও থেকে থাকে তা যেন ধরা চোখে দেখা যায় এবং ফটো তোলা সম্ভব হয়।

ডাঃ ওয়াটার্স ছোট জীব জানোয়ার নিয়েই শুরু করলেন পরীক্ষা। প্রথম দিকে ভিতরের বৈয়ামে ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি বন্দি করে তাদের শ্বাস রুদ্ধ করে বা বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে কেমনের মৃত্যুর নিখুঁত সময়টা সঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। সেই সূত্রে ক্যামেরা ব্যবহার করাও কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তিনি ভিতরের বৈয়ামে ছোট একটি বিদ্যুতিত বিদ্যোটন ব্যবহার করে গবেষণা চালিয়ে গেলেন।

ডাক্তার ওয়াটার্সের গবেষণায় এক বছরে দুটি সত্য প্রমাণিত হয়ে অদ্ভুত একটি প্রশ্ন সৃষ্টি করল। দেখা গেল, জীব দেহে আত্মা থাকে এবং স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়া দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতেও আত্মা দেহ ত্যাগ করে। কিন্তু প্রশ্ন সৃষ্টি হল, আত্মা দেহ ত্যাগ করে তখন, মৃত্যু মুহূর্তে না মৃত্যুর পরে?

আমেরিকার সোসাইটী ফর ফিজিক্যাল রিসার্চ সংখ্যা ১৯১৫ সালে মোট ২৩টি ফটো নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা প্রয়োজনীয় আয়োজন করে আত্মা নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণার আবেদন জানালেন। ঐ ২৩টি অত্যন্তপূর্ব ফটো ডাঃ ওয়াটার্সের গবেষণা সংক্রান্ত।

২৩টি ফটোর প্রতিটি নানা কারণে মহৎ বৈশিষ্ট্যে ধর্মগুরুদের হতবাক করে দেয়। দেখা যায়, ভিতরের বৈয়ামে মৃত প্রাণীর

অহরহ ছায়া দুর বৈরাব, বাইরের বৈরাব অথবা বাস্তীয় আবহাওয়ার পূর্ণ সুযোগে আসবাব। এবাবিক ফটোতে দেখা গেছে, ছায়া মাত্র একটি নয় দুই অথবা তিনটি। একটি ফটো বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যে ফটোতে দুটি ঘোমাটে ছায়ার একটি মৃত-দেহের মাথার উপরে ও অন্যটি বাম মণিবন্ধে। দুটি ছায়াই পরস্পরকে ঠিক ঠেলে সরে করার চেষ্টা করছে। আর একটি সাধারণ ফটোতে দেখা গেছে ভিতরের বৈরাবে একটি ইঞ্চুর দুটুকরো হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সিলোটিনের পাশে পড়ে আছে। ঐ দেহের তিন ইঞ্চি উপরে একই আকৃতির একটি স্পষ্ট ছায়া শূন্যে ভাসে আছে। শূন্যে ভাসা ছায়াটি দুটুকরো নয়, আস্ত দিল। কিন্তু একই আকৃতির অন্য একটি অস্পষ্ট ছায়া ভিতরের বৈরাবের উপরের দিকে উর্ধ্বমুখী হয়ে বসে আছে। উপরের ছায়াটি একটু অস্পষ্ট হলেও চোখ নাক আর অন্যান্য সবই আন্দাজ করা যায়। বায়ু বন্ধ করে বা বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে দেখা গেছে ফটোতে রহস্যময় কোন ছায়া ধরা পড়েনি। অথচ অন্তত তিনটি ফটোতে দেখা গেছে সিলোটিন দিয়ে কাটার আগেই রহস্যময় ছায়া দেহের বাইরে এসেছে।

লোমারেট অফ ফিজিক্যাল রিসার্চ ফটোগুলি পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, প্রতিটি ছায়া মৃত প্রাণীর আকৃতির অনুরূপ। কোন পার্থিব বস্তুর মাধ্যমে ছায়ার দেখা যায়নি। ইলেক্ট্রো ফ্রেম ও আলট্রা ভায়োলেট যুক্ত ক্যামেরায় নেগেও ঐ একই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ডাঃ ওয়াটার্সের গবেষণার পর অনেক প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দেহ প্রতি এবাবিক আত্মার রহস্যটা পরীক্ষা এতোদিন পর্যন্ত লোপন ছিল কি ভাবে? স্বভাবতই এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে বর্ষ-আর মানব জাতিকে কি এতদিন ধোঁকা দিয়েছে? একটি দেহে একাধিক আত্মার উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া কি?

আত্মা বলে সত্যিই, বিজ্ঞানের মত এমন ধারণা অনেকের। ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল যদি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরা এগিয়ে না আসতেন। ডাঃ ওয়াটার্সের গবেষণার অনেক আগেই কিছু মনস্তাত্ত্বিকরা আত্মার ভর বা দেহদেহীর ভর করা কেসগুলির সমাধানে অগ্রসর হয়েছিলেন: আজ আমরা যে সমস্ত ঘটনাকে আত্মার ভর বা Double Possess বলে ধরি তা উচিত মন বৈজ্ঞানিকের ভয় মোটেই দেহের কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়াটার্সের একাধিক আত্মার ফটোগ্রাফি ও ডাঃ ম্যাক ডগলাসের আবিষ্কৃত আত্মার ভর বজনের ওজন তত্ত্ব খুবই প্রয়োজনীয়।

তবুও নিশ্চয় কিছু বাস্তব সত্য যে, আত্মা বা দেহদেহীর ভর করার ব্যাপারটা বাস্তবী জীবনে বেশী ঘটে। গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় অলি গলিতে প্রায়ই দেখা যায় কেউ না কেউ ভর হয়ে রাবণ মিউজ সৃষ্টি করেছেন। ভর হওয়ার ব্যাপারটা শিক্ষিত বলে পরিচিত বাঙালী সমাজেই যে কেন এত অনুপ্রিয় তা বিরাট রহস্য। এবিষয়ে এই জাতীয় ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আরো প্রচুর আছে। রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়।

মনস্তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব ও আবিষ্কৃত তথ্যগুলি অনভ্যাসের জন্য অনেক পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে এই আশংকায় সহজ ভাবে আলোচনা করছি।

মানুষের মাথার ভিতরে অর্থাৎ মস্তিষ্কে আনুমানিক ছয় কোটি স্নায়ুকোষ সেল আছে। ঐ ছয় কোটি সেলের মধ্যে মাত্র দু কোটি সক্রিয়। ঐ দু কোটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধি দেয়, বিবেক দেয়, দিয়ে গেয়েছে বলে, দিয়ে যা অর্জিত হয়, এবং কি করা কর্তব্যের পথ বলে তাও ঐ হাত দিয়ে ঐ কাজগুলো চলতে থাকে। মানুষের মস্তিষ্ককে আড়াআড়ি ভাবে দু ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকরা। যার মস্তিষ্কের বাম দিকের সেলগুলি বেশী সক্রিয় সে হয় হাতি বা ন্যাটা হয়। অবশ্য অন্যান্য কোন প্রাকৃতিক বিষয়ে দেখা গেছে ডান দিকের সেলগুলি অধিকাংশে ক্ষেত্রে বেশী সক্রিয়।

দু কোটি এই ব্রেন সেলগুলির মধ্যে যে কোন একটা সেল বিশেষ শক্তিশালী থাকে। সাধারণত দেখা যায় ঐ বিশেষ শক্তিশালী সেলটাই বাকি সেলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ নেতৃত্ব দেয়। যতদিন পর্যন্ত নেতৃত্বে মাত্র একটি সেল প্রবলভাবে থাকে ততদিন মানুষ স্বাভাবিক থাকে ও একই ধরনের চরিত্র পালন করে। কিন্তু যে মুহূর্তে অন্য কোন সেল হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে গিয়ে নতুন নেতা হতে চায় তখনই হয় গণ্ডগোল।

মনে করা যাক, সমস্ত মস্তিষ্কটাই সমুদ্রে ভাসন্ত একটি জাহাজ। এবং স্বাভাবিক নিয়মে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেনও মাত্র একজন, যে উপরের কন্ট্রোল রুম থেকে বসে বাকি-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করে জাহাজের যাবতীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব চালায়। কিন্তু যেসব নীচের কোন ডেকের কোন একজন খালাসি মনে মনে ক্যাপ্টেন হবার কথা ভাবছে। শেষ পর্যন্ত খালাসি সাময়িক ভাবে বিদ্রোহ করে বা পয়লাদি একা একদিন ক্যাপ্টেনকে হ্যাণ্ডেল ঘোরায়। এই জাতীয় পট পরিবর্তন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি দেখা যায় পুরনো নেতা নতুন নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছেন তাহলে দেখা যাবে একটি মানুষ হাতাহাতি হঠাৎ বদলে গিয়েছেন। স্বভাব, চাল চলন, আদর্শে আমূল পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু

পুরনো খেতা পেলটি যদি মেকুদণ্ড ছাড়ার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে পরিষ্কার জবাবই দেয় তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বাকি পেলগুলিও দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুই খেতার সমর্থনে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এই অবস্থায় অর্থাৎ তথাকথিত শুরু হওয়া মারামারির মধ্যে দেখা যায় চূড়ান্ত অস্থিরতা। বৈদ্যুতিক নিয়ম কানুন সব ভেঙে উঠে যায়। হঠাৎ গায়ে চড়া, অকারণে ঘরে কাজ করে কথা বলা, রেগে অস্বাভাবিক শক্তির সঞ্চার হওয়া, অকারণে নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া তখন দেখা দেয়। কারণ মস্তিষ্ক তখন যথেষ্ট অভিযন্ত্রিত ও উত্তেজনাবিহীন। এই পরিস্থিতিকে মনস্তাত্ত্বিকরা আদি ঠেস অব পসেসন বলেন।

সব থেকে মুস্কিলের ব্যাপার হচ্ছে দুই খেলের সংঘাতের সময়ে যে চার কোটি সেল এতদিন অবহেলা ছিল তাদের কেউ কেউ হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেখা যায়, অদ্ভুত কিছু শক্তির সঞ্চার হয়েছে তথাকথিত শুরু করা দেহে। প্রসঙ্গক্রমে, বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত মস্তিষ্ক সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। জটিল মস্তিষ্ক গঠনের ব্লু প্রিন্ট এখনো বিজ্ঞানের কাছে অপার বিস্ময়।

নতুন কিছু সেলের হঠাৎ জাগরণে যে ধরনের অদ্ভুতপূর্ব শক্তির সঞ্চার হয়, সাধারণ মনে তা ভূতুড়ে বা অপরীরি মনে হওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। বাচ্চাদের ভূত করা খেলে প্রায়ই দেখা যায় রোগীর কাছাকাছি কিছু বা জা না নিজের থেকে শব্দ বা ঘুরে যাচ্ছে, এমন কি কিছু আসবাস বিনা স্পর্শে স্থান পরিবর্তন করছে। তবে কাছাকাছি কোন গাছের ডাল ভেঙে পেছে এমন ধরনের খোঁজ নিলেই দেখা যাবে ওরকম কিছু ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ তথাকথিত ভূত হওয়া অবস্থায় যে অস্বাভাবিক শক্তির উপস্থিতি ঘটে তার পৌনঃপুন্য খুবই নীরিহ অনুমান করা যায়। এই জাতীয় অস্বাভাবিক শক্তিকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন Phycho Kinis। এই শক্তির বলে আচমকা ঢেঁকির চেয়ার স্পর্শ না করে উল্টে দেয়া, আচমকা কোন বাসু ভাঙা ভুলে আছাড় মারা, এমন কি কোন দুর্বল মানুষকে হঠাৎ স্পর্শ না করে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দেয়ার কেস পাওয়া গেছে। তাছাড়া Phycho Kinis রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রোগী অনেক সময় সম্পূর্ণ অভাবনীয় ভাবে নতুন কোন ভাষায় কথা বলে ওঠে। তবে নতুন ভাষার ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর এই জাতীয় রোগী সংস্কৃত, খ্রীষ্টান রোগী ল্যাটিন ও মুসলমান রোগী আরবি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। যে ভাষা আগে জানা ছিলনা তা ভর হওয়ার পর বলতে শুরু করলে আলোড়ন সৃষ্টি হবেই। মনস্তাত্ত্বিকরা অবশ্য ধর্মভিত্তিক নতুন ভাষায় কথা বলার ব্যাপারটাকে ধর্মীয় প্রভাব বলেই মনে করেন। তবে সব মিলিয়ে রহস্যগুলি নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার এখনো প্রয়োজন আছে।

মানুষের মস্তিষ্কের ছয় কোটি সেল যদি সজাগ থাকতো তাহলে অনেক অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে। Phycho Kinis রোগীদের কেত্রে মস্তিষ্কের যে নতুন সেলগুলি সেগুলি সাধারণত মৃত নয়, এতদিন সুপ্ত ছিল মাত্র। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঐ সেলগুলির আগমনে সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড আলোড়ন আসে। অসাধারণ দৈহিক শক্তি হয় শরীরকে প্রায় অসম্ভব ভাবে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এইভাবে শরীর মোচড়ানোর সময় রোগীর অসম্ভব কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কারণ দেহ এতদিন কিছু নিয়মে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু মস্তিষ্কে তখন ভয়ন্ধর পরিবর্তন চলছে তখন বাধার অনুভূতি অবশ্যই মিলিয়ে যাবে। এই সময় দেখা যায় রোগীর চোখ দুটি সাধারণত বড়াকারে ঘোরে অথবা রোগী উন্মাদের হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক পরিবর্তনের এই সময়টাকে Temporal Cob বলা হয়। শরীরকে একটু বেকায়দায় বাঁকাবার ঘটনাকে বলা হয় Schizopherias, মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ বা আনুষঙ্গিক কারণে বাঁকাবোকে বলা হয় Neurasthenia.

ভর করা রোগীদের কেত্রে দেখা যায় চোখ দুটি আকর্ষ উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে বিমুনো ভাব থাকলেও প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার বিদ্যুৎ খেলে। মস্তিষ্কের সব থেকে নিম্নবর্তী অর্থাৎ তলার অংশ দুটিতেই অধিক প্রভাব পড়ে। এই জাতীয় রোগীদের কেত্রে প্রায়ই দেখা যায় অপরের মনের কথা জানার শক্তি জেগেছে। ব্যাপারটা টেলিপ্যাথি জাতীয়। এই মুহূর্তে আপনি কি ভাবছেন বা দূরে কোথাও এই মুহূর্তে কি ঘটছে এমন ঘটনাও অনেক রোগী বলেছেন। সংক্রামক সময়ে এই ধরনের শক্তি বৈধিক পরিস্থিতি পেতে দেরি করে না। এমন অবস্থায় দেখা গেছে অনেক রোগী ভবিষ্যত বাণীও করতে থাকেন কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে ভবিষ্যত বাণীগুলি প্রায় সবই ভুল। তবে একটি যা সত্য প্রমাণিত হয় তা হোলো ভূতটা। অর্থাৎ Temporal Cobএর পর Phycho Kinis দেখা দিলে যে টেলিপ্যাথিক শক্তি জাগে তাহলোর বর্তমান পর্যন্ত,ভবিষ্যত নিয়ে নয়। দুইশক্তি মস্তিষ্কের স্নায়বিক বলে এখন পর্যন্ত অজানা কোন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে কারুর মন পড়ার এবং দূরের কোন ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী হবার ক্ষমতালাভ হয়। এই শক্তির সঙ্গে পূর্বোক্ত যুনি ব্যক্তিদের টেলিপ্যাথিক

শক্তির কি সাধনা তা বড় ভাবে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

তার ফলে রোগীদের আশ্চর্য আশ্চর্য কেস পৃথিবীতে রোজ কৃতি কৃতি হয়। পৃষ্ঠা দিতে গেলে রামায়ণ লেখা হয়ে যাবে। তবে, ভূতাবেশের ব্যাপার ইত্যাদি ঘটনাকে বেশ্ব করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত পদার্থ ভঙ্গ হয়ে যায়। পসেসড্ রোগীরা অনেক সময় নিজেরাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থ হয়েই তিনি বুঝতে পারেন, তাঁকে ঘিরে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। তখন প্রচার বিস্তারের দীর্ঘকালের সুপ্ত বাসনা চরিতার্থের রূপ নেয়। পয়সা উপার্জন বা ভক্ত তোলার ইত্যাদি প্রবণতা তখনই প্রবল হয়ে ওঠে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পসেসড্ হওয়ার রোগে আক্রান্ত হন দুর্বল মানসিকতার মানুষ। আত্মবিশ্বাসের অভাব, বহু জ্ঞান, বর্মীয় প্রভাব এবং অপরাধ বৃত্তি যাদের মধ্যে প্রবল তারাই হঠাৎ ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন রোগের শিকার হয়। বিধিবার প্রকৃতির মানুষরাও এই রোগে বেশী আক্রান্ত হন বলে জানা গেছে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে এই রোগ প্রবলভাবে দেখা যায়।

প্রাকৃতিক বিষয়ে মহিলা, বাচালক ও শিশুদের মানসিকতা দুর্বল। এজন্য আত্ম-বিশ্বাসী শক্ত সবল পুরুষ সত্যি সত্যি পসেসড্ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন কেস আজো জানা যায়নি। ধর্মপ্রবণ পরিবার ব্যাপারটাকে গ্রহণশক্তির পর্যায়ে অনায়াসে ঠেলে দেয়। যার এই শক্তিশালী তার উপর হেরোইন্ড ভর হতে পারেনা এমন কথা বিভিন্ন ভাষে পাওয়া যায়। কথা-গুলিতে খুব ধরে গেছে। উন্নত বিজ্ঞানের আমলের যুগে ঐ সব যান বাহনকে প্রায়ই না দেখাই ভাল।

পসেসড্ রোগীদের লাগিয়ে তোলার জন্য ওঝা বা ভেকে যদি মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞা-নিকদের সাহায্য নেয়া যায় তাহলে মানব কল্যাণ হবে। আজকাল Sustagen বা Librium ঔষধগুলি বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে দেখা গেছে, ফলও ভাল পাওয়া যাচ্ছে। যে মানসিক অস্থিরতার সুযোগে পসেসড্ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, তা মনস্তাত্ত্বিক-দের থেকে অগ্রিম পরামর্শ নিয়ে কাটিয়ে ওঠাই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন নতুন ঔষধ ও প্রক্রিয়া আজকাল প্রায়ই আবিষ্কৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ব্যাপারে মানুষ যত উদার হবে মুক্তমন হবে ততই বেশী। কারণ একটু বিবেচনা করলেই অনুভব হয়, যে মানুষের মতটা উপকার করেছে তার থেকে অনেক বেশী অপকার করেছে। বিজ্ঞানের সত্যিকারের বয়স তো মাত্র ৩০০ বছর। গত ৩০০ বছর বিজ্ঞান অনেক সুখ দিয়েছে। শান্তির ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। শান্তির জন্য বাহ্যিক উপায় নয়, মানসিক প্রবণতা চাই। অথচ সেই মানসিক প্রবণতাকেই আঘাত করার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে আজ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে ধর্মের নামে কাটাকাটি, মারামারি আজকাল রোজকার ব্যাপার। আমরা মানুষরা যদি বিজ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নামি তাহলেই হয়তো মানব জীবনকে সার্থক করা সম্ভব। আত্মা ও মস্তিষ্ক নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের চেষ্টা ঐ পথেরই প্রারম্ভ। তাছাড়া, মস্তিষ্কের যে সেলগুলি অস্বাভাবিক শক্তির উৎস, ঐ শক্তিগুলিকে বিকল করা গেলে আজকের বহু জীবনে কি রূপ বিপ্লব আসবে? ভাবতে বা চেষ্টা করতে হয়তো মনে মনেই প্রত্যাহারে যাত্রা করা যাবে। সবাই সবার মন পড়তে পারবে এই ভয়ে হয়তো কুচক্র বা পরস্পরের বিরুদ্ধে সাধারণ স্বার্থে চক্রান্ত করা একে-বারে উঠে যাবে। তখন শুধু শান্তিই থাকবে।

# ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ ?

## অশোক চট্টোপাধ্যায়

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ ক্রমে এদেশের কৃষকশ্রেণীর ওপর যে নেমেসির অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের কৃষকশ্রেণীর ব্যাপক বিদ্রোহ একটি অনিবার্য ফলশ্রুতি। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭—এই একশ' বছর ধ'রে এদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহের এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। আর, এই নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে ব্যাপকতর রূপ নিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত্তির ওপরই সবচেয়ে আঘাত হেনেছিল। ১৮৫৭ সালের এই মহাবিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। অথচ আমাদের দেশের তাবড় পণ্ডিতরা, এমনকি অনেক স্বঘোষিত মার্কসবাদীও (!) এই মহাবিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এই বিদ্রোহকে তাঁরা নিছক সিপাহীদের বলে এর বাস্তব ভিত্তিকে অস্বীকার করে থাকেন। একে নিছক সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে এবং কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে এদের কোন যোগ ছিল না—এমন কথা বলার মধ্যে দিয়ে তাঁরা মূলতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, ছোট্টা-পুরোহিত প্রভৃতির ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম। সিপাহীদের দ্বারা এই বিদ্রোহ শুরু হলেও তাদের সঙ্গে জনযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। তাছাড়া একথা মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশে অবস্থানরত সিপাহীদের বেশীর ভাগই ছিল অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে লিখেছেন যে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল ফিউডাল শাসকশ্রেণী অর্থাৎ তালুক-মহারাজা নবাব উজির-জমিদারদের হাতে। রজনী দত্তের একথা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি এভাবে কৌশলে মহাবিদ্রোহকে কৃষকবিদ্রোহ নয় বলে প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস পেয়েছেন, এর তাঁরই দেখানো ভুলির ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের স্বঘোষিত মার্কসবাদীরা (!) এই কৃষকবিদ্রোহকে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে কৃষকবিরোধিতা করেছেন। এই বিদ্রোহে নেতৃত্বে নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, লক্ষ্মী বাঈ, বাহাদুর শাহ প্রভৃতি ছিলেন। সুতরাং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব তাঁদের হাতে ছিল—একথা বলা মানেই চরম অপরাধ। কেননা এই বিদ্রোহে নানা সাহেব প্রভৃতির প্রকৃত ভূমিকা তাঁরা ভেবে যান। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব কখনই তাঁদের হাতে ছিলনা। তাঁরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে রাজীও ছিলেন না, অবস্থার চাপে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। নিতান্ত অবস্থার চাপে পড়তে বাধ্য না হলে নানা সাহেব এই বিদ্রোহে যোগ দিতেন না। একথা তাঁর ১০.৫.১৮৫৭ তারিখের এক চিঠিই স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। তাঁর প্রাণরক্ষা করুক বা ধ্বংস করুক তিনি ফোর্ট উইলিয়াম করতেও চাইলেন যে যেন কি উক্ত চিঠিতে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন যে এবং [illegible] তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিলনা এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ কথার মধ্যে দিয়ে নিজের পক্ষে কথাটা তুলে ধরে বিদ্রোহীদের মন জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কোপানলে চিঠি লিখে বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখোশ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীবাঈও প্রথমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিলেন। এরিনিমকে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে সিপাহীরা জোর করে এবং ভয় দেখিয়ে তাঁকে তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। বিদ্রোহীরা এমন কথাও বলেছিল যে যদি রাণী তাদের পক্ষে যোগ না দেয় তবে তারা কামান দেগে তাঁর প্রাসাদ উড়িয়ে দেবে। লক্ষ্মীবাঈ যে বিদ্রোহে যোগ দিতে রাজী ছিলেন না, এখানেই তার প্রমাণ। তাছাড়া আমিন খান নামে লক্ষ্মীবাঈয়ের এক সৈনিকের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে রাণী বিদ্রোহীদের বন্দুকের সামনে বাধ্য হয়ে তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। রাণী যে প্রকৃতভাবে ইংরেজদের সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিলেন এখানেই তা স্পষ্ট। এবং বিদ্রোহীরা সেটা বুঝতে পেরে তাঁকে তাদের পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। তবু

রাণী দুর্গের মধ্যে আরও ব্রিটিশ মেয়েদের সন্ধানে, বন্দুক ও গোলাগোলা দিয়ে পর্যন্ত সাহায্য করেছিল।[৭] সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এই বিদ্রোহে নানা সাহেবের কোন হাত ছিলনা। এবং বিদ্রোহীরাই তাঁকে ব্যবহার করেছিল।[৮] লক্ষ্ণৌতেও ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ে সামিল হতে চাননি, বাধ্য হয়েছিলেন সামিল হতে। আর বাহাদুর শাহ? বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীতে এসে তাঁকে সহযোগিতা করতে বলে বাহাদুর শাহ প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর নেতা ফেলহকে ডেকে পাঠান ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের কথা বলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের হাতে ফেলহ নিহত হলে নিরুপায় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের কথা মতো কাজ করতে বাধ্য হন।[৯] তাছাড়া বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা রাজা করলেও বাহাদুর শাহের কোনরকম ক্ষমতা ছিল না।[১০] সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হত বিদ্রোহীদের 'রাষ্ট্রীয় সভা'র মাধ্যমে—আর এই সভা গঠিত হয়েছিল বিদ্রোহীদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের দ্বারাই। এবং উল্লেখ্য যে এই সভায় বেসামরিক কর্মচারীর সংখ্যাই ছিল অধিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব রাজা-মহারাজা বাদশাদের হাতে ছিল না। কিছু রাজা জমিদার বাদশা সে সময় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, (যাদের একাংশ বাধ্য হয়েছিল) কিন্তু তারা কেউই শ্রেণী হিসেবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেনি, করেছিল শুধুমাত্র ইংরেজদের দ্বারা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায়। এরা শ্রেণীগতভাবে ইংরেজদের পক্ষেই ছিল, জনগণের পক্ষে নয়।[১৮] সুতরাং ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ যার সমর্থনে কিছু কিছু রাজা জমিদার মহারাজা-বাদশা'রা যোগ হয়েছিলেন। একথার সমর্থনে ইংরেজ সেনাপতি আউট্রামের লেখাতেই প্রমাণিত হয়। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন যে অযোধ্যা প্রদেশে (অবশ্য শুধুমাত্র অযোধ্যাতেই নয়, সমগ্রই—অ, চ,) একটা প্রভাব বিস্তারী শ্রেণী, সমগ্রটাতে প্রভাবশালী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিরা প্রকৃতই ইংরেজ শাসন কামনা করে।[১৯] তাছাড়া যারা প্রকৃতই শাসিত ও শোষিত, বিদ্রোহী তারাই, দেশীয় শাসকরা নয়।[২০] ১৮৫৭-র বিদ্রোহ যে সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়, ব্যাপক জনসাধারণের সশস্ত্র বিদ্রোহ তার সপক্ষে বহু প্রমাণ আছে। যথা—যারাকে সিপাহীদের বিদ্রোহ করার আগেই বহু জায়গায় জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছিল।[২১] গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন কোন হিন্দু-মুসলমান ছিল না, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি।[২২] উত্তর ভারতের চারটি প্রদেশে (অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড এবং বনেলা) জনসাধারণের প্রায় সব অংশই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বিহারের পশ্চিমাংশে ও পাটনা বিভাগের বহু জেলায়, আরা ও জীরাট অঞ্চলে সিপাহী ও জনসাধারণ একই সঙ্গে অভ্যুত্থান করেছিল।[২৩] গোটা হিন্দু ও মুসলমানরা, ব্রাহ্মণ-বেনিয়া সহ সবাই একই সঙ্গে এই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।[২৪] জনসাধারণ জীরাট ও আলিগড়ের ব্যারাকের সিপাহীদের বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করেছিল।[২৫] ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ বাঙ্গর স্থানে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ৮০০০ বিদ্রোহীর মধ্যে সিপাহী ছিল ১০০০ এবং ৭০০০ ছিল কৃষক।[২৬] ওই সময় মূলতানপুরে বিদ্রোহীদের ২০০০০ পদাতিক ও ১১০০ অশ্বারোহীর মধ্যে সিপাহীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০০ এবং বাকী সব কৃষক।[২৭] ওই একই সময় অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে লক্ষ্ণৌ অধিকারের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য সশস্ত্র কৃষক সমবেত হয়ে যুদ্ধ করেছিল।[২৮] জীরাট অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহীদের নেতা পা বলের নেতৃত্বে বহু বহু যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য পরাজিত হয়েছিল।[২৯] বিদ্রোহের প্রাক্কালে জনসাধারণ যোগ দেওয়ায় এবং স্বভাবতই সেকারণে বিদ্রোহীদের বাধতে পারা সম্ভব না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটরা সমস্ত গ্রাম পুড়িয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিল। গ্রামের সকল মানুষ যে সক্রিয়ভাবে এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তার প্রমাণ এখানেই।[৩০] বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে কৃষকরা বল্লম ও তাজে বিঁধে এবং লোহাবাঁধানো লাঠি ও তার সঙ্গে ছুরি গেঁথে অস্ত্র তৈরী করেছিল।[৩১] সুতরাং উদাহরণ বা বাড়িয়েও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে যে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে নিপীড়িত-নির্যাতিত কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। আর ভারতীয় সিপাহীরা ছিল প্রধানতঃ কৃষক সন্তানযুক্ত। ঐ, বি, নর্টন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এটি ছিল আসলে জনতার বিদ্রোহ।[৩২] সিপাহিদের দ্বারা এই বিদ্রোহ শুরু হলেও শেষ অবধি তা এ দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের শ্রেণী যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। সুতরাং ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলা পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক এবং তা সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃতি করে।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'সার্থক' সৃষ্টি হিসেবে জমিদার ও মধ্যশ্রেণী খুবই স্বাভাবিকভাবে এদেশে ইংরেজ শাসন-শোষণের ভিত শক্ত ও স্থায়ী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। ১৭৯৩-র পর থেকে এদেশে গড়ে উঠছিল কৃষকদের এক গৌরব-

মধ্য শ্রেণীস্বার্থের ইতিহাস। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট জমিদার ও মধ্যশ্রেণী তাদের শ্রেণীগত ভিত্তিতে ইংরেজদের চিনতে কখনই ভুল করেনি এবং স্বভাবতই এদেশে কৃষকবিরোধী প্রত্যেকটি ইংরেজ-অভিযানকে সমর্থন করেছে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই বিদ্রোহে ইংরেজী জানা মধ্যশ্রেণী ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল প্রশ্নাতীত।[২৭] এবং এজন্যেই মটন সাহেব ওই সব ভারতীয় দালালদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের লর্ড সভায় ১৮৫৮ সালে গ্লাডস্টোন তাঁর দিয়েই বলেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা এই বিদ্রোহে অংশ তো নেয়টনি, বরং তারা সোৎসাহে এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রমাণ রেখেছে।[২৮] সমসাময়িককালে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এক এক বিশাল অংশ এই কৃষকবিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠার যেসব দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বিদ্যাসাগর বাঙলাদেশে এই বিদ্রোহ দমন ও সমন পাওয়ার নিমিত্তের জন্য আসা গোরা সৈন্যদের আরামী আবাস হিসেবে সংরক্ষিত জমিগুলিকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি এক বিদেশপন্থী বিদ্যার মুখ দিয়ে (তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রচিত এক নাটকে) এই বিদ্রোহ সম্পর্কে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন—যার মোদ্দা বক্তব্য সিপাহীরা ধ্বংস হোক। পাছে আবার মুসলমান রাজত্ব ফিরে আসে, (বাহাদুর শাহকে রাজা করার মধ্যে দিয়ে) সেজন্যে মুসলমান জাতিবৈরী বঙ্কিম এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর কলমের খোঁচায় এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন। 'স্বাধীনতার অগ্রদূত' কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যিনি বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর পুজো করার জন্যে আক্ষালন করতেন,—তিনিও এই সময় বাবা সাহেব, লক্ষ্মীবাই ও অন্যান্যের প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ করে ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এমনকি পরবর্তীকালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' সারক সংখ্যায় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত সরকার পক্ষে ইংরেজদের তারিফ করতে 'ভগবানের মঙ্গল বিধান' বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি বিখ্যাত মার্কসবাদী লেখক এমন কথাও বলেছেন যে মহাবিদ্রোহে বাকি কোন বাঙালী যোগ দেয়নি। অনেক অযোগিত মার্কসবাদী এই বিদ্রোহে সমকালীন সময়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর যে অংশ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি—তার সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে এই বিদ্রোহ বাঙালীদের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, সেজন্যেই বাঙালীরা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, এবং তারা সমর্থন না করে ঠিকই করেছিল। অথচ সেই সময়ই কালীপ্রসন্ন সিংহ ইংরেজ-সমর্থনকারী শিক্ষিত বাঙালীদের প্রতি বিদ্রুপের কশাঘাত করেছেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়। তাহলে কালীপ্রসন্নের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি? 'মার্কস্ বিদ্রোহ-পরায়ণ কৃষক-সৈনিকশ্রেণীর বীরত্বের গুণগান করিয়া তাহার লেখনীর সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়াছেন কিউরাদে সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে, যাহারা জনসাধারণের বিক্ষোভের বিরোধিতা করিয়া বিদেশী শাসক ইংরেজদের সহায়তা করিয়াছিল।'[২৯] তাহলে তাহলে মার্কসের সম্পর্কেই বা তাঁদের বক্তব্য কি? মার্কস এই বিদ্রোহকে বলেছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তাঁর মতে এই বিদ্রোহে জাতীয় চেতনার প্রথম সফল অভিব্যক্তি ঘটেছিল।[৩০] তিনি আরও বলেছেন যে এই বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের পারস্পরিক বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং হিন্দুদের দ্বারা এ বিদ্রোহ শুরু হলেও শেষ অবধি দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে এই বিদ্রোহকে পূর্ণতা দান করা হয়েছিল।

১৭৯৩ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে এই জমিদার ও মধ্যশ্রেণী (যারা এদেশে সমস্ত বিদ্রোহের হাত থেকে ব্রিটিশ-প্রভুদের বাঁচাতে সচেষ্ট) যে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দেহরক্ষীর কাজ করবে, তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। স্বভাবতই 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' ও দুই দুটি অ্যাসোসিয়েশন এবং বাঙালীর মহাত্মা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ ২০০০ বাঙালী এ বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজপ্রভুর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই বিদ্রোহে বাঙালীদের কোন সমর্থন ছিল না। বাঙালীদের সমর্থন যে এই বিদ্রোহে ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে এই বিদ্রোহের সঙ্গে বাঙলার কৃষকদের যোগাযোগ স্থাপনের পথে কোনরকম বাধার সৃষ্টি হওয়ায় ফলেই এই বিদ্রোহে বাঙলার কৃষকদের পক্ষে ব্যাপকভাবে যোগ দিতে পারা সম্ভব হয়নি। তবে এই বিদ্রোহে যে বাঙলার কৃষকদের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ আছে। এই বিদ্রোহের সময় বাঙলাদেশ থেকে খাদ্য ও যানবাহন সংগ্রহ করা সরকারের কঠিন হয়েছিল কারণ বাঙলার কৃষক এই ব্যাপারে অসহযোগিতাই করেছিল, জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে

যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকার 'ইন্ডেন্সমেন্ট আইন' পাশ করাতে বাধ্য হয়েছিল।[১৮] বাঙলাদেশের মত ইংরেজ ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন যে বাঙলা সরকারের অধীনে এমন একটাও জেলা ছিলনা যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্যে দিয়ে যায়নি কিন্তু সেখানে অন্তত বিপদের আশঙ্কা ছিলনা।[১৯] কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরেই প্রথম সিপাহীদের বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এবং মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের বিদ্রোহের তিনমাস আগে বহরমপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। আর, বহরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ শোনা মাত্র হাজার হাজার স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে বহরমপুর শহরে জমা হয়েছিল। সুতরাং এই বিদ্রোহে বাঙালীর সমর্থন ছিল না একথা রীতিমতো উদ্বেগজনক। কেন না, বীরভূম জেলার জনৈক শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করেছিল।[২০] ঐ একই জেলার করিম খাঁ নামক জনৈক সর্দার প্রকাশ্যেই বিদ্রোহী মনোভাব দেখানোর ফলে তাঁর ফাঁসী হয়। বেহিনীপুর জেলার বৃন্দাবন তেওয়ারী নামক এক ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যেই জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্যে উত্তেজিত করেছিলেন। এজন্যে তাঁরও ফাঁসী হয়। ঐ একই জেলার বীর খান্ড ও শেখ মহিচরিত নামক দুজন বিদ্রোহীকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[২১] মালদহ জেলার চরন সিং নামক এক ব্যক্তি 'রাজদ্রোহের' অপরাধে অভিযুক্ত হন। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সিপাহীরা বিদ্রোহ করলে জনৈক মুন্সী রাজার নেতৃত্বে ২০০ পুলিশের একটি দল তিস্তার বন্যুক নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ঢাকার জেলার কুবেরচন্দ্র চৌধুরী নামক জনৈক সরকারী কর্মচারী 'রাজদ্রোহমূলক' কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। যশোর জেলার পরাধোরী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ফরিদপুর জেলার ওয়াহাবী নায়ক আবদুল মোহসান ও হিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিখ্যাত ওয়াহাবী নায়ক দুদুমিঞাকে পুনরায় রাজবন্দী হিসেবে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়েছিল। এছাড়া বহু মরিক নায়ক জনৈক বাঙালীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত করা হয়েছিল।[২২] এর পরও বলতে হবে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে বাঙালীর কোন সমর্থন ছিল না? বাঙলার কৃষকদের মধ্যে যে এই বিদ্রোহ কি রকম প্রভাব ফেলেছিল ১৮৩০-এর বাঙলার নীলবিদ্রোহের সময় নীলচাষীদের তাদের নেতাদের নাকি সাহেব, তাঁতীরা তোপী প্রভৃতি নামে অভিহিত করার মধ্যে দিয়েই তার প্রমাণ মেলে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা বাঙালীবাবুদের সমালোচনায় তখনই মুখর হয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, তেমনি পরবর্তীকালে সুপ্রকাশচন্দ্র বসুও বাঙালীবাবুদের ওই মনোভাবের সমালোচনা করেছিলেন।[২৩] এমনকি ১৮৫৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর চার্টিস্ট পত্রিকা 'দ্য নীলস্ দেপার' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় কৃষকদের এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে লিখেছিল যে তারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের পক্ষে।

অথচ আজও-মধ্যেমিত মার্কসবাদী (?) বিদ্বজ্জনসমিতিমহল (যাদের অনেকেই আবার মার্কসবাদের তত্ত্বথা পরা) ১৯৫৭ থেকে শুরু হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের এক গৌরবময় বিদ্রোহপর্বকে (১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ) বিকৃত করে সাম্রাজ্যবাদী শিবির তুষ্টি বহন করছেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ, নিছক সিপাহী বিদ্রোহ নয়, এবং তা ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করেছা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষক বিদ্রোহের এক উজ্জ্বল ধারাবাহিকতার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

---

গ্রন্থপঞ্জী :

(১) M. R.Gubins : An Account of the Mutinies in Oudh p-59.

(২) Political proceedings- Nos. 63-70, May, 27, 1859. K. W. 63

(৩) R. C. Majumder : The Sepoy Mutiny and the Revolt of of 1857

(৪) G. W. Forrest : Selection from the letters and despatches and other state papers preserved in the Military Department of the Govt. of India, p XIII

(৫) Norton : Rebellion in India : How to prevent another p 69

(৬) H. L. O Garret : Trial of Md. Bnhadur Shah.

(৭) Bundle 153, Fo. No. 12 (Persian), 19/8/1957,

(৮) দে সিরীক্ষিত : ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। অমীক, মে '৭৪

(৯) General Sir James Outram : Orders, Despatches & Correspondence, 1857, p-297

(১০) Syed Ahmed Khan : The Causes of Indian Revolt. p-5

(১১) Oxford History of India p-722

(১২) John Kaye : History of Sepoy War in India vol II, p-195

(১৩) Malleson History of Indian Mutiny vol—III, p 487

(১৪) Thomas Low Central India During the Rebellion of 185. 7-58

(১৫) Talmin Khaldun : Great Rebellion

(১৬) Malleson : Ibid, vol—III, p-287

(১৭) Charles Ball Indian Mutiny, vol—II, p-241

(১৮) Narrative of Events, No. 406 of 1858 by Commissioner F. Williams. dt.—15/11/1858

(১৯) R. C. Majumdar : The Sepoy Mutiny & the Revolt of 1857, p-217

(২০) Ibid, by F. D. Mayne, dt. 4/9/1858

(২১) সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ ৩৪৩।

(২২) J. B. Norton : 'Topics for Indian statemanship : p-180

(২৩) Norton : (Do)—p-56

(২৪) Earl Grandville, 19/2/1858

(২৫) নীরেন্দ্রনাথ রায় : বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (২)—পৃ ৮০।

(২৬) Marx's Notes : Nikomli Goldberg, 'communist' Feb, 1948

(২৭) প্রবোধ সেনগুপ্ত : সৈনবিদ্রোহ, পৃ-১১০।

(২৮) C. F. Buckland : Bengal under lieutenant Governors, vol-1, p-68

(২৯) S. B. Chowdhury : Civil Rebellion in Indian Mutinies, p-202

(৩০) S. B. Chowdhury, p-202

(৩১) Surendra Nath Sen Eighteen Fifty seven, p-408

(৩২) বিপিন আচার্য : বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা। পৃ-৩৩।

# ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে টীনাপোড়েন

## রণেন নাগ

মাকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পর স্তালিন লিখেছিলেন, এরপর সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম কোথায় তেবে দেখতে পারে? অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল যেখানে দুর্বলতম সেখানেই বিপ্লবের সম্ভাবনা ঘটবে। স্তালিন তখন ভারতকেই এই দুর্বলতম দুর্বল বলে বিবেচনা করেছিলেন। অর্থাৎ পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতবর্ষে সংঘটিত হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ভারতের বদলে একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের অন্তর্ভুক্ত দুর্বলতম রাষ্ট্রের মহাচীনে এই বিপ্লব সম্ভব্য প্রথম করলো। বুর্জোয়া রাষ্ট্রনীতিবিদেরা যাই বলুন, বস্তুতঃ স্তালিনের বিশ্লেষণ ভুল ছিল না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সেই পরিস্থিতিকে সঠিক পথায় বিপ্লবের পথে মোড় ঘোরানো, দুটি কাজের মধ্যে তফাত আছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও লেনিনের সঠিক পথনির্দেশ সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের কশ বিপ্লব সফল হয় নি। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ১৯১৭ সালে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হতে পেরেছে। মহাচীনের বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

**সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব :** পুঁজিবাদী সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের উপর জনগণের সামাজিক মালিকানা, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অবাধ সুযোগ সৃষ্টিকেই এক কথায় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর বলে আমরা মনে করি।

বস্তুতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের আগে সংশ্লিষ্ট দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটে থাকে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সামাজিক গঠন প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তিত পুঁজিবাদী সমাজেও প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের কিছু কিছু অবশেষ বহুদিন থেকে যেতে পারে। যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রাক সমাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর কিছু কিছু অংশ থেকে যেতে পারে।

কিন্তু এই জটিল সামাজিক রূপান্তর সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্বাপর দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা না হলে বিপ্লবী পরিস্থিতির অনুধাবন ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত মতামতের সৃষ্টি হতে পারে। বুর্জোয়া পরিবেশে এই ভ্রান্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই বুর্জোয়া প্রভাবিত সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক ঘটনাগুলিকে আংশিক ও বিকৃত ভাবে উপস্থাপনা করে থাকেন। একমাত্র মার্কসবাদই সমাজ পরিবর্তনের মূলধারাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী শক্তিকে পথ দেখাতে পারে।

**মার্কসবাদী পার্টি ছাড়া বিপ্লব সফল হয় না :** সুতরাং সমাজ বিপ্লবের যে কোন স্তরে সমাজের আর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করার প্রয়োজন হয়। বিপ্লবী সম্ভাবনা কোন দেশে কোন স্তরে রয়েছে তা উপলব্ধি না করে ঐ দেশের বিপ্লব গণতান্ত্রিক না সমাজতান্ত্রিক সঠিকভাবে তার বিচার করতে হয়। এ বিষয়ে মহান লেনিনের অবদান বিশ্বের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। তিনি শুধু অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা করেননি, তিনি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অধীন জাতিগুলির সামাজিক বিন্যাসের প্রতিও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। লেনিন কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকে এম, এম, রায়ের ঔপনিবেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করে দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর শোষণবিরোধী সংগ্রাম এবং অধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম এক অঙ্গের বন্ধনে গ্রথিত হয়েছে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের শ্রেণীগত সংগ্রামকে আর অগ্রসর হতে দিতে পারেনা, বরং অধীন দেশের সামাজিক অনগ্রসরতা বজায় রেখেই তারা অধিকতর মাত্রায় উপনিবেশের জনগণকে শোষণ করতে পারে। সুতরাং তারা অধীনস্থ দেশে সাম্যবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং ঔপনিবেশিক

বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামন্তবাদের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন করতে উৎসাহ দেয়।

কিন্তু সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীই স্বদেশে সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পথে এগিয়ে চলে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া-সামন্ত-শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে। লেনিন তাঁর সংশোধনীতে (উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব) বললেন, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ায় যত পরিস্থিতিতে কোন দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (সামন্তবাদ বিরোধী কৃষি বিপ্লব) সংঘটন করতে পারে না একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ইতিহাস শ্রমিকশ্রেণীর উপর অর্পণ করেছে। এই দায়িত্ব পালন করেই সর্বহারা শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে পারে। লেনিন বললেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোন 'চীনের প্রাচীর নেই।' শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে পৃথক করে বোঝানোর জন্যই 'নয়াগণতন্ত্র' এবং 'জন-গণতন্ত্র' পদ দুটি ব্যবহার করা হয়। মহা-চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চেন তুসিয়াও এবং ওয়াং জিং-এর নেতৃত্বে একবার দক্ষিণপন্থী অন্ধবার বামপন্থী বিচ্যুতির স্রোত, হঠকারী পথ অতিক্রম করে মাও সে তুং-চৌ এন লাই এর নেতৃত্বে নয়াগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে চীনের বিপ্লবকর অগ্রগতি বিশ্বের সমস্ত কমিউনিষ্টের কাছে লেনিনীয় পথনির্দেশের অসাধারণ নিদর্শন হয়ে রয়েছে। কিন্তু চীনের বিপ্লব সফল হওয়ার পরেও বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভূখণ্ড অর্ধোপনিবেশ দেশ ভারত (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সহ) এখনো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কারণ-গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়নি।

১৯২০ সালের শেষ এক সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ঐ সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক কৃষকের ভূমিকা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতাদের আদর্শ, ভারতের সামাজিক অভিশাপ জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্বসূরী লেবার্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' (সম্পাদক নজরুল ইসলাম) এবং 'গণ-বাণীতে' (সম্পাদক কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ) ভারতের কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৮শে ফাল্গুন সংখ্যার 'লাঙলে' কমরেড আহমেদ লিখেছেন, "একটিমাত্র জিনিস—কমিউনিজম আজ ভারতবর্ষকে রুশের হতে রক্ষা করতে পারে।" মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের জবানবন্দীতেও ভারতের কমিউনিষ্টদের ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে বহু দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছিল (কমিউনিজম চার্জেড ফ্রম দি ডক)।

স্বাধীন ভারতের রূপ কি হবে? কমিউনিষ্টদের পক্ষ থেকে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ "ভবিষ্যত ভারত" নামক এক প্রবন্ধে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপরেখা প্রকাশ করেছিলেন (গণবাণী, ১ইসেপ্টেম্বর ১৯২৬)। কমরেড আহমেদ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিছুতে নয়, বাহিরে।...স্বাধীনতার প্রথম পদ্ধতি হবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাদের সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটে বিভক্ত করে সেই সকল ষ্টেটকে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে। অর্থাৎ এই ষ্টেট গুলো আপন আপন সরকারের কাছে স্বাধীন ভাবে বিরাজ করলেও তাদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে একে অন্যকে সাহায্য করার জন্যে। ইংরাজীতে যাকে বলে Federated Democratic Republic, ঠিক তাই হবে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ।"

কমিউনিষ্টদের এই গণপ্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ হবে (১) সার্বজনীন অবাধ ভোটাধিকার, (২) কৃষিখাতে প্রথার উচ্ছেদ, (৩) শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরী ও আটঘন্টা কাজ, (৪) আইন করে সামাজিক সুরক্ষা ও সুবন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সংবাদপত্র ও বক্তৃতাদানের স্বাধীনতা, (৫) নারীপুরুষের সমাধিকার (রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার) এবং (৬) সাধারণ হিতকারী বিভিন্ন—অর্থাৎ খনি, রেলওয়ে, পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগা-যোগ ইত্যাদি জনহিতকর সংস্থাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

কমরেড আহমেদ ঐ রচনায় বলেছেন, "সংক্ষিপ্তভাবে আমরা উপরে যা বলবার উচিত বলেছি তার একটিও ছাড়া দেশে সমতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এসব ছাড়াও যদি কখনো দেশ স্বরাজসমৃদ্ধ হয় তাহলে দেশে কিন্তু সমতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে —গণতন্ত্র নয়।"

অর্থাৎ মীরাট মামলার অভিযুক্তদের বক্তব্যে ('দি কমিউনিজম চার্জেড ফ্রম দি ডক') এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের রচনাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে তৎ-কালীন কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিনের প্রদর্শিত

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের এই পথ অনুসরণ করার জন্যে তাঁরা উৎসুক ছিলেন। ঐ সময়ের পর প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর কমিউনিষ্ট শক্তির বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু আমরা এখনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারিনি এবং এখনো যে আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে,—একথাও সমান সত্য।

**আত্মসমালোচনার প্রয়োজন ;** কারণ ভারতের বিপ্লব, অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবের মতোই ক্রমাগতই, বন্ধুর পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজের অসম বিকাশের ধারা ভারতেও কতগুলি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং সোভিয়েত এবং চীনা বিপ্লবের সাধারণীন শিক্ষাগুলিকে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করার পদ্ধতি অবলম্বন করাই একান্ত প্রয়োজন। আমরা কি এই কাজে সফলতা দেখাতে পেরেছি ? না ভারতের বিপ্লবী শক্তি গণ-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মধারাকে বিপ্লবী রণ-কৌশলের সহায়ক করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে ?

ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংগ্রাম ও আপোষের কৌশল গ্রহণ করে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে বারে বারে ভঙ্গ গতি ও আপোষমুখী করে চলেছিল। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক-মজুর ও মেহনতী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণকে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী সুনজরে দেখে নি। তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বিদেশী বৃটিশ শাসনের কবল থেকে জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং দেশের শ্রমিক ও কৃষকমুক্তির সংগ্রামকে একাত্মীভূত করে তোলার অপরি হার্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আমাদের তা করতে পারে নি। রাজনৈতিক মুক্তি ও অর্থ নৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে একাত্ম করে চলতে না পারার ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের সাংগঠনিক শক্তি বিঘ্নিত হয়েছে। আমরা দেখেছি ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণ অর্থ নৈতিক সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁরা ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসকেই অনুসরণ করেছেন। অন্যকথায় অর্থনীতিবাদের দুর্বল গণ্ডীর মধ্যে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাজনৈতিক সমতা অর্জনের জটিল সংগ্রামে বুর্জোয়া জমিদারশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণী সহযোগিতা মূলক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের বিপ্লবী শক্তির অগ্রগতিকে প্রতিপদে ব্যাহত করেছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি ও পরিস্থিতির জটিলতা বহু সময় শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধেও বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন ১৯৪২ সালে আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতি ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে যথোচিতভাবে অন্বিত আমরা ভারতের জনগণকে তা বোঝাতে পারি নি। কারণ অর্থনীতিবাদের সীমাবদ্ধতা এবং সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি সহজ আবেগ সর্বস্বতা, এই জটিল পরিস্থিতির উপযোগী রণকৌশল প্রয়োগ করার ক্ষমতা ভারতের কমিউনিস্টদের আয়ত্তে ছিল না।

সুতরাং বুর্জোয়া প্রচারের বল এবং কংগ্রেসের বুর্জোয়া জমিদার নেতৃত্ব ভারতের জনগণকে কমিউনিষ্টদের আসল সম্পর্কে ভুল বোঝাতে পেরেছিল এবং কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

অন্যদিকে তেলেঙ্গানার সামন্তবিরোধী কৃষক অভ্যুত্থান ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামকে একাত্ম করে তোলার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপুল সাফল্যলাভ করতে পেরেছিল। তেলেঙ্গানার ৮টি জেলার ৩ হাজার গ্রামের মিলনক অধিবাসী প্রায় সাড়ে তিনবছর ধরে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের কবল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষকেরা নিজেরাই যে শোষণের অবসান ঘটাতে পারেন এবং স্বাধীন ভাবে হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারেন, ভারতের সামনে সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। অবশ্য দেশের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীকে সামরিক বল প্রয়োগ করে এই কৃষক অভ্যুত্থানকে দমন করতে পেরেছিল। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানার বীর জনগণের সমর্থনে, দেশের অন্যান্য স্থানে শক্তিশালী কৃষক অভ্যুত্থান সংগঠিত করা সম্ভব হয় নি। এই অভিজ্ঞতার পর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—ভারতের বিপ্লবের স্তর এবং উপযোগী রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য গভীর আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কয়েকটি সংশোধনের জন্যেও আলোচনা করেন। স্বয়ং কমরেড স্তালিন এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আলোচনাকালে স্থির হয় যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি বিচার করে ভারতের বিপ্লবী শক্তি অন্ধভাবে রুশ অথবা চীন বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করতে পারে না। বরং ঐ দুটি অগ্রগামী বিপ্লবের অভিজ্ঞতাগুলির সৃজনশীল বিশ্লেষণ এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মাধ্যমেই ভারতের বিপ্লব তার সাফল্য অর্জন

করতে পারে। ১৯৫০ সালে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ আলোচনার ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভারতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব ভারতের কমিউনিষ্টদের এই নতুন কর্মসূচীকে সমর্থন জানায়।

**সংশোধনবাদী নেতৃত্ব :** কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এক পরিণামী অংশ এই কর্মসূচী রূপায়ণে কোন দিনই উদ্যোগী ছিল না। পি সি যোশীর নেতৃত্বে পরিচালিত ঐ অংশটি ভারতের সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর রুশ্চেভ পরিচালিত সোভিয়েত পার্টি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার উপরে পার্টি প্রতিষ্ঠার কৌশলকেই স্থান দেয় এবং দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার আন্তর্জাতিক সহায়তা দানের দায়িত্ব বর্জন করে দেশে দেশে শান্তি স্থাপন ও উত্তেজনা প্রশমনের নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়। বলা বাহুল্য সুবিধাবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত শান্তির প্রচারে বিপুল ভাবে সাড়া দেন এবং স্তালিনের সতর্কবাণী ভুলে যান। স্তালিন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে শান্তির সংগ্রাম নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শান্তির সংগ্রাম সফল হলে কেবল কোন একটি বিশেষ যুদ্ধ বন্ধ করা যায় বা তার অবসান ঘটানো যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকার সময় পর্যন্ত চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় না। একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব হতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে শান্তির তত্ত্বে সংগ্রামের সম্পর্ক কোন দিনিসের সঙ্গে অংশের সম্পর্কের সমান। অংশ কখনো সমগ্রের চাইতে বড় হতে পারেনা। একটা মোটর গাড়ীর চাইতে তার টায়ার যত গুরুত্বই থাকুক না কেন আরো বেশি গুরুত্ব সম্পন্ন হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থ-নৈতিক সমস্যাবলী উল্লেখযোগ্য।

দুঃখের বিষয় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী অংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিনবিরোধী সংশোধনবাদীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্লোগান তুলে ১৯৫১ সালের কর্মসূচীকে বর্জন করেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐ কর্মসূচীর পক্ষে ছিলেন তারা ১৯৫১ সালের ফলিত ও সঠিক রণকৌশলের ভিত্তিতে অবিরাম সংগ্রাম করেন। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে এই সংগ্রাম কখন এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে বিজয়ওয়াড়ায় ৬ষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে (১৯৫১) কর্মসূচী গৃহীত হতে পারে নি। তখন ঠিক হয় যে পরবর্তী একবছরের মধ্যে বিশেষ পার্টি কংগ্রেস ডাকা হবে এবং ঐ কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচী চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবে।

কিন্তু সংশোধনবাদীরা অতদিন অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। ১৯৬২ সালে ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে ভারতের সংশোধনবাদী চক্র কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে হাত মেলায়। সংশোধনবাদীদের প্রোচনায় কংগ্রেস সরকার হাজার হাজার কমিউনিষ্টকে আটক করে। এমন কি চীন একতরফা সীমান্ত এলাকা ছেড়ে যাবার পরও গ্রেপ্তার অব্যাহত থাকে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাস্ত্রী লাল নাথের যেভাবে বলা হয় যে তাদের কেউ এ আদেশ প্রমুখ সংশোধনবাদী নেতারাই মুক্তকণ্ঠে আদেশ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, এ কে গোপালন, বাসবপুন্নাইয়া প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের নামে চীনের দালাল বলে কুৎসা রটিয়ে গ্রেপ্তারের সহায়তা করেছে। সংশোধনবাদীরা এতেই ক্ষান্ত হয় নি প্রকৃত কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত করে এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী ও কার্য-নির্বাহক কমিটি থেকে তাদের অপসারিত করে।

অতএব ১৯৬৪ সালে নেতৃত্বে আসামাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার পর কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চাপ সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে কিছুটা লজ্জাবনতমস্তক করতে বাধ্য করে বটে কিন্তু তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতাদর্শ বর্জন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতাদর্শ গ্রহণ করার ফলে দেখা যায়ে পার্টি ভেঙ্গে যায়। প্রকৃত কমিউ-নিষ্টরা বর্তমান সি পি আই (এম) গঠন করেন এবং পার্টির নবম কংগ্রেসে জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে সংশোধনবাদী পার্টি নিজেদেরই সি পি আই বলে ঘোষণা করে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থাৎ শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর যৌথনেতৃত্বে বা শ্রেণী সহযোগিতার বিশ্বাসঘাতক পথা গ্রহণ করে।

এইভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং বিপ্লবের মূলতত্ত্ব ভারতীয় বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে এই মতদ্বৈধ সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেহেতু গৃহীত রণনীতি (কর্মসূচী) রণকৌশলের (রাজনৈতিক কর্মধারা) জন্ম দেয়, সেই জন্যই সংশোধনবাদী সি পি আই এবং

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পরবর্তী কর্মধারা অবশ্যম্ভাবী রূপেই একান্ত পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। সংশোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি প্রমিক-কৃষক যৌথনেতৃত্বের কর্মসূচী থেকে প্রথমে "নেহরু সরকারকে পুরো সমর্থন" থেকে পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নীতি গ্রহণ করে। এই ভাবে শাসকশ্রেণীর পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তরে, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র যুবক মহিলা ও কৃষক সংগঠনগুলিতে বিভেদ সৃষ্টি করে সংশোধনবাদীরা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দেউলিয়া থেকে ছুটিয়ে রাখতে করে। এমন কি ১৯৭৫ সালে শাসক কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন আভ্যন্তরীণ গুরুতর অবস্থা জারী করে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কিংবা তার আগেকার যেন ১৯৭৪ সালে সংশোধনবাদী সি পি আই জনগণের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করে।

এই ভাবে ভারতে বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যৌথনেতৃত্বের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী যেমন কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ভাবগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, প্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রমিক ও কৃষক সমাজের দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৪ সাল থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন করে তুলতে পেরেছে। আজ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতের বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সর্বাগ্রগণ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি সৃষ্টি হবার পর আর কোন সময়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এমন দ্রুত অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি।

**রণনীতি ও রণকৌশল :** কমিউনিষ্টরা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করে থাকেন। পার্টির কর্মসূচীর রূপায়ণ করার জন্যে একটি প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি রণনীতির সামগ্রিক অভিমুখের উপরে রণকৌশল নির্ধারণ করে থাকে। শত্রু শ্রেণীগুলির রণকৌশলের সমুখীন হবার সামর্থ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে রণকৌশলের নমনীয়তা রক্ষা করতে হয়। রণকৌশলের প্রয়োগ সদা থাকে রণনীতির সামগ্রিক অভিমুখ। এদিক দিয়ে রণকৌশল রণনীতির উপর নির্ভরশীল। রণকৌশলের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু রণনীতি বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত অবিচল থাকে। রণকৌশলের মধ্যে বিপ্লবের পক্ষে প্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের গণসমাবেশ, সমরবাদীন বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিটি নীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম এবং গণচেতনার উন্মেষ সাধনে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তোলার কর্তব্য পালনের সূত্র প্রকাশিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লবকে এক শ্রেণী-যুদ্ধের রূপ দেয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পার্টি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। কাজেই বলতে তাতেই বোঝায় যিনি পার্টির কর্মসূচী ও রণকৌশল আয়ত্ত করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত সচেতন জনগণের নিকট তা সহজবোধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

রণনীতি স্থির থাকলেও রণকৌশলের অদলবদল হতে পারে। কারণ যে কোন যুদ্ধে দুটি পক্ষ থাকে। পক্ষপক্ষের রণনীতি ও রণকৌশল বিশ্লেষণ করেই সময়োপযোগী রণকৌশল গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকা চাই। পার্টির যত সময় পর পর অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব ঐ রণকৌশলের পরিচয় দেয়। সুতরাং প্রত্যেকটা কমিউনিষ্টের পক্ষে পার্টির কর্মসূচী ও পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাব আয়ত্ত করা এক অপরিহার্য শর্ত।

কমিউনিষ্ট পার্টি যেমন শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের ঐক্যের ভিত্তিতে সমরাস্ত্র শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজ বদলের সংগ্রাম পরিচালনা করে তেমনি শত্রুপক্ষও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা প্রচার করে জনগণের ঐক্য ব্যাহত করার চেষ্টা করে থাকে। কমিউনিষ্ট পার্টি যখন দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণ ও সমস্ত শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাবার জন্য অগ্রসর হয় তখন শত্রুপক্ষও জনগণের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বর্ণীয় গোঁড়ামি এবং বৈষম্যের অস্ত্র কৌশল গ্রহণ করে। এবং কৌশল ব্যর্থ করে যদি কোন কমিউনিষ্ট পার্টি অগ্রসর হতে থাকে তাহলে শাসক বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী কমিউনিষ্ট নামের ছদ্মবেশে সংশোধনবাদী এবং তার সঙ্গে অতিবামপন্থী হঠকারীদের রণক্ষেত্রে সমাবেশ করে। পাঠকদের মনে থাকার কথা যে ১৯৭৪ সালে রেলকর্মীদের ধর্মঘট যখন চূড়ান্ত সাফল্যের মুখে, আর মাত্র কয়েকদিন ধর্মঘট অব্যাহত থাকলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে যেতো, ঠিক সেই মুহূর্তে সংশোধনবাদী চক্রে রেলকর্মীদের সংগঠনে বিভেদ সৃষ্টি করে "স্থানীয়ভাবে বিচারের ভিত্তিতে" আপোষ করার পরামর্শ দেয়। ফলে তাদের মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী সরকার সে যাত্রা বেঁচে যায়।

**অতিবাম হঠকারিতা :** ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অতিবাম হঠকারিতাও কম ক্ষতি করেনি। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট

পার্টির ১৯৮৮-৫০ সালের অভিযান হঠকৌশল কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে হালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এই ক্ষতি সামাল দিয়ে পার্টি যখন নতুন করে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ১৯৬১-৬২ সালে সংশোধনবাদীরা পার্টিকে ভেঙে দিয়ে শাসকশ্রেণীর মনোরঞ্জন করে।

১৯৬৪ সালে নতুনভাবে সি পি আই (এম)-এর মধ্যে ভারতের কমিউনিষ্ট শক্তি পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই নবগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিকে আঘাত করার মত শক্তি সংশোধনবাদীদের ছিলনা। তাই শাসকশ্রেণীর পক্ষে এবার অভিযান হঠকারীরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারা জনগণকে বোঝায়, দিয়ে বিপ্লবী ধৈর্য অবলম্বন করে জনগণের শক্তি ও চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কঠিন পন্থা বর্জন করে শুধু হঠকৌশলের একদেশদর্শী প্রয়োগের উপর জোর দেয়। তারা বলে জনগণ বন্দুক রাইফেলই শক্তির উৎস। তারা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার না করে অন্ধ একটা বৃহৎ কমিউনিষ্ট পার্টির আত্মীয় ক্ষেত্রে অবলম্বিত নীতি কার্যকরী করার শ্লোগান দেয়। ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক জনগণের মধ্যেও বিভ্রান্তির বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কারণ বিশ্বের দুই সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রুশ্চেভপন্থী সংশোধনবাদের এবং মহাচীন মাওপন্থী সংশোধনবাদের প্রতি প্রত্যয়হীনতার আত্মঘাতী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সেই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের শাসকশ্রেণী অভিযানের সময় বিপ্লবী ভূমিকা আড়ালে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কাজে সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে মুক্ত করে। শত শত খাঁটি কমিউনিষ্ট কর্মী বিহত হন, হাজার হাজার কমিউনিষ্টকে অমানুষিক ভাবে হত্যা করা হয়। শত শত অমিক ইউনিয়ন সমাজবিরোধীরা দখল করে নেয়,জোতদার-মহাজনেরা ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাদারদের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ একর জমি কেড়ে নেয়। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াসে শাসক শ্রেণী সফল হয়। পশ্চিমবাংলা ও কেরলে বামপন্থী প্রভাবাধিত রাজ্য সরকারগুলি ভেঙে দিতে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ শাসকশ্রেণীর সঙ্গে একদিকে সহযোগিতা করে, অন্যদিকে অটোমেটিক বিপ্লবের জন্যাধারী বামপন্থী সংশোধনবাদ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে পাকাপাকি-ভাবে বিলুপ্ত করার কাজে শাসকশ্রেণীর দোসরে পরিণত হয়।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এদের অনুকূলে থাকতে পারেনা। দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট এবং নকশালপন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল) এই জনবিরোধী ভূমিকার জন্যে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা সৎ ও চিন্তাশীল তারা বিপ্লবের ভ্রান্ত নীতির পর্যালোচনা করতে থাকেন। কিন্তু যারা শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী মতলববাজ তারা নতুন করে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে আঘাত হানার জন্যে অস্ত্র শানাতে থাকে। শাসক শ্রেণী তাদের প্রশ্রয় দিতে থাকে। এরা সি পি আই (এম-এল) নেতৃস্থানীয় অমীয় চ্যাটার্জি প্রকাশ্য জনসভায় অভিযোগ করেছেন যে নয়াদিল্লীতে জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং তাকে বলেন যে সি পি আই (এম এল) যদি কংগ্রেসী আমলের মতো সি পি আই (এম) সমস্তদের নিশ্চিহ্ন করতে থাকে তাহলে মূল্য স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধী সি পি আই (এম-এল) নেতা কানু সান্যাল ও সৌরেন বসুকে ছেড়ে দেবে। অমীয়বাবু সৎ কমিউনিষ্টদের মতোই চরণ সিং এর এই জঘন্য প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন বলে জনসভায় বলেছেন। কিন্তু সি পি আই (এম এল)-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং সঙ্গে চরণ সিং-এর সঙ্গে অনবরত দহরম মহরম করে চলেছেন। তিনি বা তাঁর দল শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণের বিনিময়ে কি হতে পারে তা সঠিকভাবে চিন্তা করতেও পারছেন না। শাসকশ্রেণী যেদিন তাদের ইতিহাসের আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে সেদিন তাদের স্মরণে রাখার জন্যে একটি দুঃখও থাকবে

অগ্রগতি ব্যাহত হয় নি : ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন সোভিয়েতই ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিচার করে এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে কয়েক মুহূর্তের আবেগের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা থেকেই তা বোঝা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম কালে কমিউনিষ্ট পার্টি অধিকাংশ সময় বেআইনী ছিল। জাতীয় কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ও ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে কমিউনিষ্টরা সক্রিয় ভাবে কাজ করতেন। অবিভক্ত বাংলাদেশে কৃষকের যে তারা আন্দোলন, খাদ্যআন্দোলন ও কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন এবং তেভাগার কৃষক অভ্যুত্থান কমিউনিষ্ট পার্টিই সংগঠিত করেন।

স্বাধীনতার পর কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বাম ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ বারে বারে পার্টিকে আঘাত করেছে। অগ্রগতি ছিল বলেই এই সকল আঘাত মেরে এসেছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি যদি অন্যান্য বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতো হত তাহলে শাসকশ্রেণীর সংরক্ষিত বাহিনী বাম ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে বারে বারে আঘাত করতো না।

কমিউনিষ্টরা কৃষক ভয়ের বা এমন নয়। ওইসব পরিস্থিতি হলে, সঠিক যোগাযোগ এবং জনগণ থেকে পার্টি এবং পার্টি থেকে জনগণের মধ্যে খবরি যোগাযোগ এবং আদানপ্রদানের ব্যবস্থা সচেতনভাবে গড়ে না তুললে এ ধরনের কৃষক রাগে মাঝেই হতে পারে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু কমিউনিষ্টরা কৃষক হলে তাকে মর্যাদার বিষয়ে পরিণত করে থাকতে পারেন না। তারা সচেতন সজাগ কৃষক সংশোধন করেন। কৃষক থাকতে না থাকা এবং কৃষক হলে যথাসাধ্য তা সংশোধন করতে পারার ক্ষমতাই কমিউনিষ্টদের বৈশিষ্ট্য।

সঠিক সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার ফলেই কৃষকগুলি ধরা পড়ার সুবিধা হয়। সুতরাং সঠিক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাও কমিউনিষ্টদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এই কমিউনিষ্ট বৈশিষ্ট্যের একমাত্র অধিকারী বলে পরিগণিত। অন্যদিকে বাম ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীরা নিরন্তরভাবে তাদের কৃষক থাকতে রয়েছে অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষক স্বীকার করেও রণনীতি (কর্মসূচী) ও রণকৌশলের (রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে) কোন পরিবর্তন ঘটায় নি।

নতুন পরিস্থিতি : সত্তরের দশক ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের দশক। ১৯৭১ সালে শাসকশ্রেণীর বৃহত্তম দল ইন্দিরা কংগ্রেস দ্বারা ভারতবর্ষে নির্বাচনে একাধিপত্য লাভ করে কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস ব্যাপক জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে এক পুতুল ঔংরেজার সরকার গঠন করে। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীরা ঐ জালিয়াতে সরকারের সহযোগী ছিল। অতিবাম হঠকারিরাও সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ঐ জনবিরোধী সরকারের পক্ষে দাঁড়ায়।

১৯৭৪ সালে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও প্রমিক ধর্মঘটের ঝড় বয়ে যায়। শ্রেণী-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে ২০ লক্ষ রেলশ্রমিক দেশব্যাপী ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়। এবারেও উভয় ধরনের সংশোধনবাদীরা সরকারের সহায়তায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তাতেও কলোদয় হয়নি। শাসক শ্রেণী আর পুরনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছিল না। কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও বিপ্লবী সংগঠন এগিয়ে যেতে পারেনি। পুঁজিবাদী সমাজের স্বাভাবিক অসম বিকাশ, এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শাসক শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দল ইন্দিরা কংগ্রেস সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো পরিত্যাগ করে এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী করে শাসকশ্রেণী প্রমিক-কৃষক নেতৃস্থানীয় জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংস্র আক্রমণ চালায়। লক্ষণীয় ছিল যে শাসক দল কংগ্রেস বিরোধের ধনোৎপাদনের উপরও আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করেনি। ১৯৭৯ সালে দেশ শাসনের মৌলিক বুর্জোয়া পদ্ধতি ফিরে পাসক কংগ্রেস দলে যে তাঙ্গন দেখা দিয়েছিল অধিকতর কঠিন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই তাঙ্গন পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক কৌশল এবং শিবিরের রূপ পরিগ্রহ করে। শাসক শ্রেণীর একাংশ সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে, অপর পক্ষ সংসদ ও জনগণের সাংবিধানিক সমস্ত অধিকার বিলোপ করে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষ গ্রহণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর একপক্ষ মনে করে সংসদীয় গণতন্ত্র এখনো ভারতে জনগণের বিভিন্ন শক্তিকে বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারে, অপর দিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া জমিদারগোষ্ঠী প্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির ব্যাপক প্রসারকে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে বলে মনে করে এবং এখনি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে এবং রাজনৈতিকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই উদীয়মান বিপ্লবী শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করতে চায়।

শত্রু শ্রেণীর মধ্যে এই মতভেদ ভারতের প্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজের পক্ষে এক সুযোগ সৃষ্টি করে। ভারতের বিপ্লবী শক্তি কি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে? শক্তির ভারসাম্য কি তাদের স্বেচ্ছবতী জনগণের পক্ষে, আমূল পরিবর্তনের পক্ষে নিয়ে আসতে পারবে?

মনে রাখা দরকার যে লেনিনের মতে বিপ্লবী পরিস্থিতি উদ্ভবের কয়েকটা সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু এই লক্ষণগুলি উপস্থিত থাকলেই কোন বিপ্লব সফল হয় না। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিপ্লবী পরিস্থিতি অর্থাৎ বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক বা আবশ্যকীয় প্রস্তুতির প্রয়োজন। এর জন্যে সর্বাগ্রে রাজনৈতিক চাহিদা জনগণের পক্ষে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। ভারতে অতীতে বেশ কয়েকবারই বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যেমন ১৯৬৬ সালে। কিন্তু

রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের পক্ষে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তাই বিপ্লবী পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিপ্লব সফল হয় নি।

ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি লাবণের প্রথম ধাপে অসংগঠিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে হবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থলে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আমূল ভূমি সংস্কার অর্থাৎ প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার কর্মসূচী সর্বাগ্রগণ্য। দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্যে এই কর্মসূচী অপরিহার্য, কিন্তু সহজ নয়। আগ্রেসিভ মোমেন্ট জানে যাঁরা কৃষক-সমাজের মুক্তি সমগ্র ভারতীয় জনগণের মুক্তিলাভের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সংগ্রামের এই প্রথম ধাপে জয়লাভ করার জন্যে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য জনগণের পক্ষে পরিবর্তিত করতে হবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘৃণা ভুলে এই দুরূহ কাজ করা যায় না। দেশের শতকরা ৭০ জন কৃষক ও গ্রামীণ গরীব মানুষের মুক্তি দেশের শতকরা ১০ জনের মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ। দীর্ঘ তিন বছরের কংগ্রেস ও দু'বছরের জনতা দলের বুর্জোয়া অধিকার শ্রেণী শাসন থেকে ভারতের জনগণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত দেশের দুটি রাজ্যে সরকার জনমুখী প্রশাসন এবং জনহিতকর কর্মসূচীর মাধ্যমে এই নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য জনগণের পক্ষে পরিবর্তিত করার প্রয়াস তীব্র করে তুলেছেন। একদিকে বুর্জোয়া অধিকার শ্রেণীশাসনের দেউলিয়াপনা, অন্যদিকে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দুটি রাজ্যে সরকারের জনহিতকর ব্যবস্থাগুলি এই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষকে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। সারা দেশেই আজ রাজনৈতিক মূল্যায়ণ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ঝুঁকে পড়ছে। সাধারণ মানুষ নতুন আশায়, অগ্রগতির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

শ্রেণীশত্রুরা বসে নেই: এই পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীকেও আতঙ্কিত করে তুলেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা এখনো তাদের হাতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের কাঠামো এখনো তাদের দখলে রয়েছে। অসংগঠিত জনগণকে বৈরাচার ও হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করার জন্য তারা বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবীদের তৎপর করে তুলেছে। একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার বৈরাচারিক প্রয়োগ, অন্যদিকে জনগণকে বিভ্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ করার জন্যে সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক ও বর্ণীয় গোঁড়ামির বিষবাষ্প তোলা হচ্ছে। শ্রেণীসংগ্রাম এখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতের পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সংকট জনজীবনের প্রত্যেক স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক সংকটরূপে আত্মপ্রকাশ অদূর ভবিষ্যতে গভীর বিপ্লবী সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

বিপ্লবী পরিস্থিতিতে একমাত্র রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য কোন শ্রেণীর পক্ষে সেটাই জনগণের নির্ধারণ করতে পারে। জনগণের সাধনা অর্জনের এটাই প্রধান মাপকাঠি। অতীতে বিপ্লবী পরিস্থিতির আবির্ভাব সত্ত্বেও বিপ্লবী শক্তি জয়লাভ করতে পারে নি। "শান্তিপূর্ণ পথে" ও "সংসদ অভ্যুত্থানের" অপ্রাসঙ্গিক বাদানুবাদে জনশক্তির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন অধিকাংশ মেহনতী মানুষকে নিজেদের পেছনে জড়ো করতে পারে নি বলে এই বিতর্ক অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুসংগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি (রণনীতি ও রণকৌশল) সঠিক করে তুলতে হবে যে ধরনের রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন আগে কোনদিন তা হয় নি। ফলে বিপ্লবী পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৬৯ সালের পর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ঘোর ঘুরে যায়। কমিউনিষ্ট আন্দোলন এক বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী ও রণকৌশল গ্রহণ করে। অতীত নেতৃত্বের ব্যর্থতার সম্মত কর্মসূচী ও রণকৌশলের প্রয়োগ করে এদেশে এক নতুন বিপ্লবপরিবর্তনের সূত্রপাত করেন। মাত্র তিনবছরের মধ্যে সমগ্রপ্রায় তীব্র অগ্রগতি লাভ করে। ১৯৮৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন ক্ষমতায় অবসান ঘটে এবং কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাসক কংগ্রেস দলেও ভাঙন ধরে।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের আকার ধারণ করে এবং শাসকশ্রেণী কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদকে পুনরায় মেলিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে নতুন শক্তি সমাবেশ ঘটতে থাকে। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে শাসকশ্রেণী রাষ্ট্র ও প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরোধ সাধন করে। ১৯৭৭ সালে সারা ভারতে ভয়ঙ্কর অবস্থা ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ইন্দিরা কংগ্রেস কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টকেও ক্ষমতা দেয়।

তবু পিছিয়ে নেই: কিন্তু বুর্জোয়া অধিকার শ্রেণীর অপপ্রচার ওরিয়েন্টেশন, মেকিয়েবেলের ভাষায় "জনগণকেও তুষ্টিকিত করে তোলে",

যে শত্রু, যে মিত্র তারা অনেক সহজে বুঝে ফেলতে পারেন। সুতরাং বুর্জোয়া অধিকার শ্রেণীর অত্যাচার ও শৃঙ্খলত রাজনৈতিক অসহায় জনসাধারণের পক্ষে পরিবর্তিত করে। বৈষম্য বর্ণান্ধ শোভামি ও জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশের শোষণমুক্তির জনদাবী ও নবনীয় রাজনৈতিক ১৯৭৭ সাল থেকে ভারতের অধিউনিষ্ট আন্দোলনে এক তীব্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বুর্জোয়া অধিকার শ্রেণী এবং প্রতিক্রিয়া শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়ত, যেসমস্ত জনসাধারণ মুখোমুখি চাপিয়ে-ছেন। রাজনৈতিক ঘটনা চক্র অধিকার পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের নতুন নতুন রূপ দেখা দিচ্ছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী বিজ্ঞানই কেবল চূড়ান্ত জয়ের পথ দেখাতে পারে।

মার্কসবাদ অধিবিদ্যা উপাদানে বিশ্বাস করে না। তার পরাজয় একই ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে। মার্কসবাদ জয়ের উপাদান-গুলিকে শক্তিশালী করার পথ দেখায়, প্রতি-বিপ্লবকে পরাজিত করার কৌশল দেখায়। সুতরাং ভারতীয় সমাজবিপ্লবের বর্তমান অবস্থায় মার্কসবাদকে অপ্রান্তভাবে প্রয়োগ করার কৌশল অপরিহার্য। এই সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চললে জয় অবধারিত, কিন্তু কঠিন বিপ্লবসংগ্রাম পথে অগ্রসর সহজ নয়। বৈষয়িকভাবে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে বিপ্লব সফল হবে? তার জবাব কেউ জানে না। বিপ্লব সফল হবার সন, তারিখ, দিনক্ষণ জ্যোতিষীরা বলতে পারে। কিন্তু বিপ্লবীরা বৈর্যহারা হন না। অতীতের বুলগুলি ভবিষ্যে নিয়ে তারা অগ্রসর হতে থাকেন। চূড়ান্ত জয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাস ও মতাদর্শের অপ্রান্ততা তাদের শক্তি যোগায়, পরিবেশসম্পন্ন করে তোলে। সুতরাং বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ভারতের বিপ্লবের বর্তমান সন্ধিক্ষণে এই কথা মনে রাখতে হবে।

# চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ

## মিহির আচার্য

আপনি শুনেছি মার্কসবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের মস্ত নেতা ?

না না, নেতা নয়, আমার কর্মী মাত্র।

ঠাট্টা করবেন না দাদা। তাহলে ওরা আপনার কাছেই আমাকে পাঠালো কেন ? তা বলুন, আপনার উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ কী কী বেরিয়েছে ?

উপন্যাস ! গল্পগ্রন্থ !

আজ্ঞে ?

আমি তো উপন্যাস-গল্প লিখি না। সে সব লেখার ক্ষমতাও আছে কিনা যাচাই করিনি।

তাহলে ? আপনি কী লেখেন ?

আমি তো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করি। প্রবন্ধ না-হয় দু-চার-পাঁচ কলম-দুই কাগজ। সেদিনের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কেও অনেক জায়গায় বলেছি।

তাহলে আপনি বক্তা।

তা বলতে পারেন।

তাহলে আপনি সাহিত্য-আন্দোলনের নেতা হলেন কী করে ?

না-লিখলে বুঝি সাহিত্যিক হওয়া যায় না ?

সাহিত্য তো লেখারই ব্যাপার, তাই না ?

আপনি কী বলতে চান নিজের হাতে সাহিত্য না-করলে সাহিত্যের বোধ থাকে না ? সমালোচকের কোনো ভূমিকা নেই ?

তাই বলুন, আপনি সমালোচক ! তাহলে তো আপনি একজন লেখকের সৃষ্টির প্রক্রিয়া জানেন, তার মানসিকতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, তার ব্যক্তিত্ব…

বড় শক্ত শক্ত কথা বলছেন। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, মানসিকতা—এসব জানবার কী প্রয়োজন আছে ?

নেই ?

নাহ্।

আপনি কীভাবে সাহিত্যবিচার করেন তাহলে ?

আমি দেখি চাবি-বন্ধুরের কথা আছে কিনা। শ্রেণীসংগ্রাম…

ওহ্, বুঝেছি। আপনি রাজনৈতিক শ্লোগানের কথা বলছেন ?

শ্লোগান ! সাহিত্য মাত্রই প্রচার। বুর্জোয়া লেখকেরাও তাদের ভাববাদী দর্শন প্রচার করে। প্রচার ছাড়া সাহিত্য কোথায় ?

আপনি রাগ করছেন। তা হলে আলোচনা করা যায় না।

রাগ করিনি। বলুন।

বস্তুবাদী রাজনীতি দর্শন যে লেখককে অবশ্যই প্রভাবিত করে। এতে বিমত নেই। কিন্তু রাজনীতি সচেতন মানুষটি যখন শিল্পী হন তখন শিল্পের নিজস্ব ধর্মকে তাঁর পালন করতে হয়। বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের মন, হৃদয়কে তৈরি করা। লেখক মানবমনের ভাববাদী। রাজনীতির শ্লোগান আউড়িয়ে উত্তেজিত মানুষের হাতে আপনি অস্ত্র তুলে দিতে পারেন, কিন্তু অস্ত্র তো হাত চালায় না, চালায় মস্তিষ্ক। ভোট দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের মতো দায়িত্বশীল কাজ সমাধা করা যায় না।

আপনার কথা বুঝলাম না।

সহজ আমারি অক্ষমতা। আমি বোঝাতে পারছি না।

আমি বলতে চাইছি, একজন লেখকের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মী হতে বাধা নেই। কিন্তু তিনি যখন লিখতে বসেন তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়া, তার মানসিক গঠন, জীবনবোধ ওতপ্রোতভাবে তার শিল্পিসত্তার সঙ্গে মিশে থাকে। তাতেই তার সাহিত্যের সচেতন মূল্যায়নে উচ্চারিত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে বিচার অসম্ভব।

প্রশ্ন দিয়ে বোঝান।

চেষ্টা করছি। এই জন্যেই কথাটা বলবার চেষ্টা করছিলাম, লেখার ব্যাপারটা গভীরগামী হয়, একটাকে বুঝতে হলে সমালোচককে গভীরগামী হতে হয়। যেমিন সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, মাত্র দে দু-একটি কবিতা ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টি করার সময় পাননি, কিন্তু গভীরগামী স্তরের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁকে শক্তিমান বুঝেছিলেন, সুকান্তকে বুঝেছিলেন। সৃষ্টির সময় শক্তিকে যেন বিচলিত করা না হয় এমন সতর্কবাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন।

আমাদের দেশে এ-প্রশ্নই নেই ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত—

রাজনীতিসচেতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর নিজস্ব শিল্পিসত্তাকে কোনোকালে বিসর্জন দেননি। কারণ তাঁর মধ্যে শিল্পি-সত্তা এবং মার্কসীয় দর্শনের কোনো বিরোধ উত্তরকালে ছিল না। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতি আবিষ্কার করলেও আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, মানিকবাবুর তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা গল্পগুলির আবেদন মিথ্যে হয়ে যায়নি। যেহেতু মানিকবাবু মূল মার্কসীয় দর্শনকেই আয়ত্ত করেছিলেন। একের ভিতর দশের মধ্যে আন্দোলন আরো সাংঘাতিক হয়। তাই রাজনৈতিক পূর্বসতর্কতা সত্ত্বেও

লেখককে গল্পগুলি সংশোধন করতে বলবি। অন্য দিকে সুভাষ—

হ্যাঁ, সুভাষ?

তাঁর মার্কসীয় দর্শনে অপরিণত চিন্তার কারণে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাখ্যাগুলো যারা আক্রান্ত হওয়ায় অন্যই তিনি শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী গান্ধী মহারাজের কাছে পরামর্শালোচনার নির্দেশ চিঠা করেন। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদ্রূপী পরিচয় বুঝে নিয়ে পাঠানুক্রমে গান্ধীর ওপর কবিতাটিই নির্বাচন করে।

এর থেকে কী প্রমাণিত হল?

মার্কসীয় দর্শনে শিল্পীচৈতন্য উদ্ভাসিত হলে তাঁর কোনো সাহিত্যকর্মই পরবর্তী-কালে সংশোধনের অপেক্ষা রাখে না। সুভাষ মৃদুস্বরে—

আমরা তাঁকে কেন?

আমাদের কাছে তিনি একটি সোনাবরা দৃষ্টান্ত।

কী রকম?

মার্কসীয় দর্শন আয়ত্ত করার ফলে রাজনৈতিক সচেতনতাকেই তিনি কাব্যচর্চার বিষয় করে ফেলে প্রচণ্ড এক তাৎপর্যে পরিণত হন। ইনি ডালিম-গাও সে দুঃখের ওপর স্মৃতিমূলক কবিতা লিখে রাজনৈতিক পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমতা রেখে আবার তাঁরেই মুখপাত্র হন। তার মানে তাঁর শিল্পিসত্তা কোনোকালেই খাঁটি ছিল না। তাই—

তাই?

তাই বলছিলাম লেখকের রাজনীতি-সচেতন হতে বাধা নেই, কিন্তু তিনি যখন সাহিত্যকর্মী তখন শিল্পিসত্তাই প্রধান হয়ে ওঠা প্রয়োজন। যেমন যা নি ক বা বু র হয়েছিল।

আপনি কথায় বড় দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন। আপনি আমার সাহিত্যবিচার নিয়ে কী বলতে চাইছিলেন, তাই বলুন।

ওই চারি বন্ধুর কথা···

হ্যাঁ। ওই চারি বন্ধুর কথাই বলতে হবে। ওরাই বিপ্লবী শ্রেণী।

হাহা, ধূর্জটি তো এইখানেই। ওই বিচার যতটা রাজনৈতিক ততোধিকই তত্ত্বটা সাহিত্যিক নয়। আসল কথাটা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে হবে। তার মানে এই নয় যে, সাহিত্যে চারিবন্ধুরাই একমাত্র বিষয় হয়ে যাবে। এমনকি বন্ধুরাও, বুর্জোয়া, মালিক, ম্যানিজ—কাউকে নিয়ে লিখতে আপত্তি নেই, শুধু দৃষ্টিভঙ্গিটি হবে সর্বহারা শ্রেণীর। এই দর্শনটি যদি ঠিক হয় তাহলে বিষয় নিয়ে ভাবিবারই কোনো দরকার নেই।

বাহ্।

দেখুন, বিদ্রূপ করবেন না। ও আমরা অনেক ভেবেছি। চারিবন্ধুর ব্যাপারটা যত আবছাই ভাবের আসলে তা নয়। দীর্ঘ-কাল ধরে আমি দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই বলি, ওরাও চূড়ান্ত পেটি-বুর্জোয়া। একমাত্র রাজনৈতিক সচেতন শিক্ষার দ্বারাই ওরা প্রলেটারিয়েট হতে পারে। অন্তত তখন তাদের সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাদের পক্ষে সচেতন হয়ে সমাজ পরিবর্তনের পবিত্র কাজে দ্রুত এগিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু মোক্ষ কথা রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার। তা না হলে রাজনৈতিক শিক্ষা ও পার্টির প্রয়োজন হত না।

তারপর?

অধিবাসের গলায় প্রতিধ্বনি করবেন না, ভোলাই। আপনাদের নেতৃত্বের অন্ত এযাবৎ মার্কসবাদের শিক্ষা ও সঠিক প্রয়োগ আজো দেখা যায়নি। আপনি কী ধরে রাখেন না কারখানার মধ্যেই আন্তরান অধিকারী সূত্রে টাকা খাটিয়ে যেমে অমি মেলে, তখনো তিনি এঁকে বর্মীয় সংস্কারে সড়াসড়ি যান। কারণ পেটিবুর্জোয়া সংস্কার সে কাটাতে পারেনি। তাকে ঐক্য ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে কখনো দর্শনের রাজ-নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়নি। একটা অটুট দৃষ্টান্ত দিই রাগ করবেন না। গত বছর বরফাগে যে-দিনের সভায় আমি হাজির ছিলাম। অবাক হয়ে তখনকে লক্ষ্য করছিলাম। আপিসের কেরানীবাবুরা যত এসেছেন কলে-কারখানার সভরখাটা বন্ধুদের তেমন দেখলাম না। বক্তৃতা চলছে, পাতলা ভিড়ের এক জায়গায় দেখলাম অশিক্ষিত এক গণৎকার মানুষের হাত বিচার করছে, আরেক জায়গায় হিন্দি সচিত্র যৌনপুস্তিকা বিক্রি করা হচ্ছে। ওধারে ছড়েছে চীন-সোভিয়েতের মামান পত্র-পুস্তিকা। সে-দিনের পবিত্র তরাঞ্চলে এই বিসদৃশ ভাও দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

আপনার এই মহামূল্যবান অনুসন্ধান থেকে কোন্ সূত্রে আসছেন?

বিপ্লব যাৎপরিষদ একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। রা জ নৈ তি ক তাৎপর্য দেখা।

যে যেমনভাবে ভাবে।

ব্য ক্তি গ ত আ ক্র ম ণ করলে আর আলোচনা করা যায় না। বন্ধুদের সমালো-চনা গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই। অবশ্য যদি বন্ধুতাকে স্বীকার করেন।

সে-বিচার পরে হবে। লে খ কে র মানসিকতাকে না কী একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন? ব্যাখ্যা করুন।

লেখক একটি 'ব্যক্তি' স্বীকার করেন তো?

না-করে উপায় কী।

প্রত্যেক লে খ কে র ই একটি 'নিজস্ব' মানসিক গঠন থাকে। তার প্রকৃত পরিচয়ে

সেই মানিক গঠনের বৈশিষ্ট্য থাকবেই। এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই কেউ রোমান্টিক, কেউ রিয়ালিস্টিক ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করেন। কেউ ধনী, কেউ গরীব। এমনকি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখকদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ম্যাক্সিম গর্কি যেভাবে লেখেন পাউস্তভস্কি সে ভাবে লেখেন না। মায়াকভস্কি যেভাবে কবিতা লেখেন আরেকজনের ঠিক সেভাবে কবিতা লেখেন না। পল এলুয়ার বা পাবলো নেরুদা যেভঙ্গিতে কবিতা লেখেন দুই আরাগঁ সে-ভঙ্গিতে কবিতা লেখেন না। আমাদের দেশের কথাই বলা যাক। মানিকবাবু অত্যন্ত রিয়ালিস্ট, সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীর রায়, কী নরেন্দ্র ঘোষ চূড়ান্ত রোমান্টিক। অথচ লেখকেরা প্রত্যেকেই মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত। তাই লেখকের সঠিক মূল্যায়নে প্রগতিশীল সমালোচককে এই বিশেষ মানসিকতাকে ভাববার চেষ্টা করতে হবে।

এটা না-জেনে না হি য়া যে ন কী অসুবিধে হচ্ছে?

হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে এমন বাস্তব নিদর্শনে পৌঁছে যাচ্ছি।

লেখকের প্রতি অবিচার হচ্ছে, তাকে বেঁচে উঠতে সাহায্য করছি না। লেখক তাঁর চোখের সামনে কোনো ঘটনাকে না-দেখে ম্যাপারের মতো তথ্যনিষ্ঠ চাষি মজুরের জীবন আঁকছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সেগুলো মর্মাদিয়ে আবেগের রাইরে যেতে পারছে না। কারণ মনেপ্রাণে খাঁটি চাষিমজুর হতে না পারলে সে সব ঘটনা সত্য হতে পারে না। কথাটা হচ্ছে—অভিজ্ঞতা বিস্তৃত করতে বাধা নেই, কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে দূরের থেকে যাদের আমি না তাদের জীবন নিয়ে লেখার মতো বিড়ম্বনা আর নেই।...নতুন লেখকদের মধ্যেও লেখক ধারণা হয়ে গেছে চাষিমজুর নিয়ে না-লিখে প্রগতিশীল বলে ভাবতে পারা যায় না। তাই অল্প চাষিমজুর নিয়ে লেখা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হাত কাটতে পারেনি। এই একদেশে ধারণার ফলে জীবনের অন্যান্য দিকগুলো প্রগতি সাহিত্যে প্রায় পরিত্যক্ত। প্রেম, হাস্যরস, পরিবার, বংশমর্যাদা, জীবনতৃষ্ণা ভারতীয় বিষয়গুলির ওপর অধিকার বোধ প্রতিক্রিয়াশীল লেখক গোষ্ঠীর! মানুষের সংগ্রামের চিত্রটি যেমন সত্য তেমনি সত্য তার জীবন পিপাসা, তার প্রেম, হাস্যরস। কোনোটাই কারুর থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা হচ্ছে মানুষের সত্যসন্ধীন অবস্থার বিশ্লেষণের, আলাদা দিনের সুখী, সুস্থ, সহীলীল সামাজিক মানুষ গড়ে-তোলাই লক্ষ্য। আগে সংগ্রাম, পরে আর সব—এমন ব্যাপার ঘটবার নয়। সংগ্রামের কোনো সংগ্রামই কোনো লক্ষ্য হতে পারে না যদি না সংগ্রামের পরবর্তী চিত্রটাও মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে।...এঁরা আপনি উঠে পড়ছেন? আমি জানি, আমার কথাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে আপনার কাছে উপস্থিত করতে পারিনি। আমারই ব্যর্থতা। আমি জানি। সব তিনিস সকলের বোঝার মতো করে তৈরি, এমন আশা করাই অন্যায়। এ ক্ষেত্রে আমার সমস্ত সম্ভবতাই ওপরই নির্ভর করতে হবে। বিদায়।

# সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ পদক্ষেপের পথে মহাচীন

শ্রীপতি নন্দী

সাম্প্রতিক কালে চীন তার অর্থনীতি আধুনিকীকরণের কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাপারে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিক্রিয়ার মহলগুলিতে শুরুতে শুরু হয়ে গেল। শুরুতে থেকে শুরু করলেন, কোলাহল। বুর্জোয়া পরিচয়ের সাধারণ প্রাণী নয়, অতএব ওরা গলাবাজী, কলমবাজী, হুংকারবাজী প্রদর্শন করছে। ওদের রাজনৈতিক মোড়ালরাও গভীর চিন্তায় মগ্ন বাজার বিস্তারে ও রাজনৈতিক বিশ্বের হতাশ বাকিরাও চীনে ঝাঁকাবাজি করির ও পাকাবাজির আশায় নিরাশায় দুলছে। তাদের ইউরোপীয় জ্ঞাতি-ভাইরা 'কোটেশন' নিয়ে ছোটাছুটি করছে। মতোধানী মহাত্মারা আরো গভীর তলের মাছ। চীনে বুর্জো হা-পা কি বুর্জো মা অন্বাধানের খবর রেখেছে। আর আছেন রেখে রেখে রাশী অরাজী শোষণবাদীরা, আপন আপন রেখে বিপ্লবের বাবে প্রতি-বিপ্লবকে পাকাপোক্ত করে তুলতে যারা জনযুদ্ধ শুরু করে বুঝিয়ে আছে।

ব্যাপারটা নতুন কিছুই নয়. চীনে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় যারা তখনকার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি "ভেতর থেকে ভেঙে পড়া"র আশা বা "আশঙ্কা" করতো, তারা কেউই আজো মরে যায় নি। মৃত্যু প্রাণী যেমন বাঁচতে চায়, প্রতিবিপ্লবীরাও তেমনি বাঁচতে চায়, অর্থাৎ মহাচীনে ধনতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার (Capitalist restoration) চায়, বিশ্বেশকে তাদের অর্থনৈতিক বিশ্বস্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা। "China is an attractive piece of meat coveted by all (reactionaries) but this piece of meat is very tough and for years no one has been able to bite into it" অতএব, যারা যে মুহূর্তের জীবদ্দশায় যারা তাদের মৃত্যুর আশায় দিন গণনা করতো, আশা মৃত্যুর কিংবা যথার্থ মৃত্যুর খবর রটনা করলো, তার পেছনে যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি ছায়া ফেলেছিল, সেগুলিই আজ চীনের আধুনিকী-করণের মধ্যে 'সমতান্ত্রিক' (ধনতান্ত্রিক) ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করছে। বাকি পুঁজি ও বাকিবেকুবে বিশ্বাসী প্রতিক্রিয়া-শীলরা মহাচীনের গণজীবনে যার বেকুবের যথার্থ মূল্যায়নে কেন অক্ষম হয় তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আজই নেই।

কিন্তু পাতিবুর্জোয়া চিন্তাধারী আধুনিক শোধনবাদীরাও এ ক্ষেত্রে প্রায় একই পরিমাণে অক্ষম, কেননা এরাও বাস্তব ঘটনার ও বস্তুর গতিপ্রকৃতিকে ও তাদের নিয়ামক বিষয়গুলিকে (governing laws) অনুধাবন করতে অক্ষম, তারা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা করে। এর কারণটা সংস্কারগুলির একই বস্তু। যারা বিশ্ব জেড়ের বাস্তব ঘটনা-গুলিকে অনুধাবন করতে অক্ষম, তাদের মেরির পাই ওরে এক একটি শ্রেণীকাঠ প্রতিভা-চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রলেতারীয় চরিত্র অবশ্য শিক্ষা হবেরের, শিক্ষা বক্সের নয়। তাহলে, যে মার্কস ঐতিহাসিক পদে শোষণবাদী 'সর্বহারা' শিক্ষা-রবের কারণটা যে কত মারাত্মক তা এরা অনেকেই জীবদ্দশায় হয়ত জানতেও পারবেন না, কিন্তু জেড়ের জনগণকে তথা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের খোঁয়াড়ে ঠেলতে দিয়ে এরা খোলাখুলি যে শ্রেণী অবস্থান নিয়েছে, তার থেকে কোন কৌশলে পরিত্রাণ নেই। এবং জনের চীনপাঠ যে অত্যাচার হবে এতে চমকাবার কিছু নেই। কোন জটিল বাস্তব ঘটনের 'মর্মে' পৌঁছে দেয় না, তাদের শ্রেণী অবস্থান কি?

কিন্তু আন্তর্জাতিক জনগণ হিসাবে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, শিখেছি। আমরা পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদ ও তৎসহ সামাজিক সাম্রাজ্য-বাদের চেহারাও দেখেছি। সমাজতান্ত্রীয় দলের আমরা জানবো সংবিধান সংশোধন দেখেছি, দেখেছি সেখানে দেশী পুঁজিপুঁজি ও সামন্তপুঁজির পরাভবের সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আজের মহিমান্বিত অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে, দেখেছি এদের অর্থনীতির ছায়ায় প্রচ্ছায়ায় জাতীয় বেকারদের প্রসারকে. আর দেখেছি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে এদের অর্থনীতির সহযোগী-দের—প্রত্যক্ষরূপে পাসবজেনীকে ও পরোক্ষরূপে 'বিরোধীপক্ষ'কে। খোলা-খুলি মুখোমুখি এই দীর্ঘ বহিশ বছরের অভিজ্ঞতার সহজেই এই বস্তুদের চেনা যায় যারা ১৯৭৭ সাল থেকে ইন্দ-মার্কিন ও সোভিয়েৎ পুঁজিবাদের এক একটাকে

আজ করে "অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা"কে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান উৎসাহে রত হয়েছে। আগেও বলেছি, আমার বক্তব্য—প্রলেতারীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, শিক্ষা বর্জনের মধ্য। আমরা কখন বৃহত্তর পথে 'স্বল মুক্তি' দেখেছি, আমরা সহ-বিপ্লবের পথে 'স্বনির্ভরতা' অর্জন দেখেছি, আমরা অতি শক্তিধরের ভয়ঙ্করীদের ছলাকীদুষ্ট শিক্ষায়নের পথে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' দেখেছি, আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের নেতৃত্বে দেশী নেতৃত্বে একচেটিয়া পুঁজির 'জাতীয় অর্থনীতি' দেখেছি, আমরা মাও-ওয়াশিংটনের আলোকিত নেতৃত্বে 'দেশ-প্রেমী' রাজনীতিও দেখেছি। এবং প্রত্যেকটীর শিক্ষায়ন করেছি। অতএব, আমরা প্রতিবেশী চীনের অর্থনীতির বুনিয়াদ সম্পর্কে স্বভাবতই আগ্রহী। আমরা জানি, 'এক ইঞ্চি জমিটায়' ও বিশ্বব্যাঙ্কের বন্ধ্যা পুঁজি (সাম্রাজ্যবাদী) ও মাওর রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজির (সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী) নেতৃত্বে কোন জাতীয় শক্তি-বলয় হয় না, শিল্পে বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক তাবেদারী স্বার্থের সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ আদান-প্রদান হয় (Rolling Plan—redistribution of capitalist interests); আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী কিসিঞ্জার-আনচিটাংয়ের ছকে ছলাকীদুষ্ট শিক্ষায়নের ফলে বিদেশী পুঁজি ও দেশজ পুঁজির শোষণের, যাতে ভারতীয় শ্রমশক্তি ও জাতীয় সম্পদগুলি সম্প্রসারণে শোষণই হয়ে যায়—এরই কারণে শ্রমস্বার্থ ও পুঁজিস্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদনশক্তির দ্বন্দ্ব এক অতি-জটিল আন্তর্জাতিক বিন্যাস পেয়েছে, যার ফলে মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা হলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে এমিবিয়া প্রাণঘাতী (Pernicious) হয়ে উঠেছে (স্বাধীন ভারতীয় অর্থনীতি)। অতএব, শোষণবাদীদের মতই আমরা মনে করি, ভারতীয় অবশ্য চীনের অর্থনীতি ও তার চার আধুনিকীকরণ (Four Modernisations) সম্পর্কে অবশ্যই উৎসাহী। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলি, কেননা এটি কয়েক বেশ বাদ দিলে ভারতের ক্ষেত্রে যেমন যেমন অধিক সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জড়িত না থাকলেও তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই এদের কোন না কোন পক্ষ প্রবল ভাবের বুনিয়াদ সমাসীন। অতএব, এরই স্বাধীন ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের সম্পর্কে মোটা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য তার ছায়া খুঁজে পেতে চায়।

**মহাচীনের মহান দৃষ্টান্ত**

মাও-নেতৃত্বে পরিচালিত 'স্বনির্ভরতার পথে সমাজতন্ত্রের' অনুসরী কিংবা মাও-নির্দেশিত 'চার আধুনিকীকরণের' পথে 'আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীন' গড়ে তোলার পরিকল্পনাগুলি দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ও শোষণবাদীদের কাছে যতই আক্রমণের ব্যাপার হয়ে থাকুক, উহার মধ্যিকের কেবিন সংবেদনার তত্ত্বই তারা আক্রমণাত্মক করেছে, এটাই স্বাভাবিক। এবং কিছুর বিস্তার ও প্রসার এখানে অবান্তর। এরা সাধারণতঃ উপরোক্ত অনুসরী ও পরিকল্পনাগুলি পুঁ বিক্ষিপ্তভাবেই দেখে থাকে, উহাকে বিশ্বরীতি-বহির্ভূত বলেও জানে থাকে যাই হোক, তাদের জানবার উদ্দেশ্য ও বিষয়, আমাদের কিছুই নয়। আমরা জানি, স্বনির্ভরতার পথে সমাজতন্ত্রের সাথে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চীন বস্তুতঃ তার উৎপাদন ব্যবস্থার কার্যকরী ভাবে অন্যান্য উন্নয়নের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। এরাকে দেখা যাক, সমাজতন্ত্র বর্ধনের সাথে এদের মৌলিক পার্থক্যগুলি কোথায়। দেখা যাক, স্বনির্ভরতা সম্পর্কে চীনের পার্টির বক্তব্যগুলি কি?

"On what basis should our policy rest? It should rest on our strength and that means regeneration through ones own efforts." (Mao Tse-tung—The situation And Our Policy After Our Victory in the War of Resistance Against Japan).

অর্থাৎ, "আমাদের নীতির ভিত্তি কি হবে? আমাদের নীতির ভিত্তি হবে আমাদের আত্মনির্ভরতা, অর্থাৎ নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজের জোরে নিজে দাঁড়ান" (আর দেংচু—'বর্তমান পরিস্থিতি এবং জাপ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে বিজয় লাভের পর আমাদের নীতি কি হবে')।

এ নীতিকে বাস্তবায়িত করে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি চীনে নির্মিত হয়েছে তার প্রাথমিক পুনর্গঠনের পর্বে অবশ্য তারা চার আধুনিকীকরণের অনুসরণে ও অর্থনৈতিক লাইনকে ঠিক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যাদেরই সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের যাদেরই সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের মধ্য। অবশ্য অবশ্যই দুটোর এই তাত্ত্বিক ও আন্তর্জাতিক চেহারাটা (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারা)। এক সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ ও আধুনিকতার বিরোধটি অবশ্যই আমরা ঠিক অবস্থানের মধ্যে এবং ঠিক ধর্ম এর প্রসারিত বাস্তব ভিত্তির আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্পর্কে, অর্থাৎ চীনের নৈতিক নীতির সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক বিকাশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উৎপাদন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সাথে সম্পর্ক। আন্তর্জাতিক ও নৈতিক

ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লাইনটির বাস্তব প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম আলোচনা হলো—

"Self-reliance means relying on the manpower and resources of one's own country to continually overcome difficulties that will inevitably arise in course of the revolution".

"Self reliance means fully mobilising and closely relying on the country's broad masses, especially the workers and peasants". অর্থাৎ "স্বনির্ভরতার অর্থ হলো বাকসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বিদ্যুত সত্যগুলির সঙ্গে নিজ দেশের বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের কাজগুলিকে একাত্ম করে দেখা, যাতে বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে সঠিক দিক নির্ণয় করা যায়, যাতে নিজস্ব কর্মনীতিসমূহ ও কর্মপদ্ধতিগুলি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়. বিপ্লবের অগ্রগতির পথে পথে যে কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হবেই হবে, তারপর আত্মনির্ভরতার অর্থ হবে দেশের সমস্ত কর্মশক্তি ও সম্পদসমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া, যাতে বিপ্লবের অগ্রগতির পথে এই সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিকে ধাপে ধাপে পরাভূত করা যায়। স্বনির্ভরতার আরো অর্থ হলো—দেশের সমস্ত জনসাধারণকে পরিপূর্ণরূপে সক্রিয়, সচেষ্ট করে তোলা, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষকদের উপরে গভীর আস্থা রেখে চলা"।

তারপর উপরে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বিনিময়ের প্রশ্নগুলি সামনে রেখে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী 'স্বনির্ভরতা'র নীতির বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ পুনর্বিন্যাসের (readjustment) সাময়িক আপেক্ষিক প্রয়োজন দেখা দিতে পারে (that will inevitably arise—Ibid)। এখানে প্রথম বিচার্য হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি।

আর এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব যদি কোন ফুল মুভি নিয়ে থাকেন, তাহলে সক্রিয় জনগণ তার বিচারে সঠিক এবং তাদেরই সে ভুল শোধরানো হবে (from the masses, to the masses—চীনের পার্টির পদ্ধতির অনুযায়ী)—"The masses are the real heroes, while we ourselves are often childish and ignorant, and without this understanding it is impossible to acquire even the most rudimentary knowledge.···Of all things in the world, people are the most precious, under the leadership of the C. P, so long as there are people, every kind of miracle can be performed". অর্থাৎ, আর কেউ নয়, উপযুক্ত পার্টি নেতৃত্বে একমাত্র জনগণই সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম—এ ধারণাটি যাদের নেই তারা নিরক্ষরই থাক। সাধারণ লাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে নেতৃত্বের প্রথম ও দ্বিতীয় মূলতঃ বজায় মাকসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুঙের চিন্তার সচেতন সক্রিয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর, যে শ্রমিক শ্রেণী দেশের জনগণের অন্যান্য অংশকে নেতৃত্ব দেবে। আর ঐ জনগণকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র পার্টি নেতৃত্বে তথা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী সচেতন সক্রিয় শ্রমিক জনগণ, যে জনগণ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী দেশের সম্পদসমূহকে বিযুক্ত করতে পারে এবং তারই অভিজ্ঞতায় বিপ্লবের পথে অগ্রগতির বাধাগুলোকে চূড়ান্ত করে এগিয়ে চলতে সক্ষম।

এখানে দেখা যায়, মাকসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের প্রশ্নে চীনের বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিটা কি।

মাকুইয়া আর তিব্বতের সামাজিক বিকাশের স্তর এক নয়; যেমনি সাহারাইয়ের সঙ্গে স্কেন্ডিনেভের, সিংকিয়াংয়ের সঙ্গে শান্ট্রংয়ের, আফ্রিকের সঙ্গে ইউরোপের উৎপাদন সমস্যা যেমন পৃথক, তেমনি তাদের সম্পদগুলিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা ও উদ্বৃত্ত করার উপায়গুলিও বিভিন্ন এটা স্পষ্ট। তাহলে এই সমস্ত সমস্যার সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ সমাধান কি বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হবে? অর্থাৎ উৎপাদনশক্তির বিকাশে যে আঞ্চলিক আপেক্ষিকতা, পরস্পরবর্তী ও উপাদানগুলির প্রশ্ন রয়েছে, অর্থনিয়োগ সমস্যা, পুঁজি উৎপাদন সমস্যা রয়েছে সেগুলি কি নিয়োগের রাশিয়া থেকে আহরণীয় করা যায়, যন্ত্র ও যন্ত্রীয় দুর্মূল্য বাজারে উবে যাবে এবং চীন বিপ্লবকে এক নয়া গণতন্ত্রীকরণে সার্থক করে তুলবে? উৎপাদন সম্পর্কের আর উৎপাদন শক্তিগুলির দ্বন্দ্বগুলি ও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সমাধান কি শিকের তুলে রাখা চলতে পারে, যেমনটি হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায়?

না, তা বিলকুল নয়, আর এখানেই কমরেড চীন বিরোধের মূল উৎস, আন্তর্জাতিক লেনিনবাদের সঙ্গে সর্বহারা লাইনের বিরোধের উৎস।

তাহলে শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়, উৎপাদনের স্তর বিষয় ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়—এই তিন ধারা বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে আরও অগ্রাহ্য, আরও দুরায় করে এগিয়ে চলতে হবে। আর এ কাজে অপর কারো উপর নির্ভরশীলতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা এক বেভিয়াচক পন্থা। "It is not the conciousness

of men that determines their being, but on the contrary, it is their social being that determines their conciousness"—Marx Engels. তাই বিপ্লবের বিশেষ বাস্তব অবস্থাগুলোকে গৌণভাবে গ্রহণ না করে মুখ্যভাবে দেখতে হয় ও তাকে দাবাতে হয়, বিপ্লবের লক্ষ্যগুলোকে সবচাইতে বিপ্লবোপযোগী করে তুলে তাকে সর্বতোভাবে রোমান্টের করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সফল করা, বিপ্লবের উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান প্রধান দিকগুলিকে আধুনিকভাবে ও বৃহদায়তনে গড়ে করা, সংগঠন করা ও সংহত করা, আয়ত্তাধীন করা যন্ত্রের উপর বিপ্লবীদের না হলে বিপ্লবের মৌল উদ্যোগে ও প্রতিষ্ঠার সেই যন্ত্রবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উপযোগী করে গড়ে তোলা, সাফল্য ও অসাফল্যের উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের প্রয়োজনে শিক্ষা নেওয়া, যাতে বিপ্লবের পথে যে সমস্ত অপশক্তিগুলি বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এক কথায়, বিপ্লবের মূল উৎস যেমন শ্রমিক-কৃষকের ও লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া।

উপরোক্ত দিকগুলি বিচার করতে হয় উৎপাদন পদ্ধতিগুলির ব্যবহারের মধ্যের প্রশ্ন, উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যের বিষয়গুলোকে, অর্থ-নৈতিক ভিত্তির সঙ্গে উপরিকাঠামোর মধ্যের বিষয়, উপরিকাঠামোর ব্যবহারের ব্যাপার ও তাদের বাহ্যিক ব্যবস্থাদি।

মনে রাখতে হবে, এ প্রশ্নগুলি বিপ্লবের আঞ্চলিক পরিসর থেকে আন্তর্জাতিক পরিসর ও পরিস্থিতি পর্যন্ত বিস্তৃত—বিপ্লবের সমস্যা, সে রাজনৈতিকই হোক আর অর্থ-নৈতিকই হোক, অন্যান্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মধ্যে গভীর গতিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

**সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পটভূমিকায় তাচাই-তাচিং**

উপরোক্ত পটভূমিকাতেই এসেছে চার আধুনিকীকরণের (Four Modernisations) প্রশ্ন—আধুনিক কৃষি, আধুনিক শিল্প, আধুনিক জাতীয় প্রতিরক্ষা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা "to go all out,aiming high and achieving greater, faster, better and more economical results in building socialism." এই আধুনিকীকরণ সমাজতান্ত্রিক লাইন অনুযায়ী সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতির, উৎপাদনের উপায়গুলির উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলির আধুনিকীকরণ যার ভিত্তি অবদান ও গণউদ্যোগ, যা সমস্ত উপরিকাঠামোর সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কে ও নতুন নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজনীয় এলাকাগুলিকে ও বিষয়কে ছড়িয়ে দেবে, "যাতে শ্রমিকের ও কৃষকের, শহরের ও গ্রামের, দৈহিক শ্রমের ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি হ্রাস পেতে চলবে, যা বুর্জোয়া অধিকারগুলিকে সঙ্কুচিত করে আনবে, যা শ্রেণীসত্তাকে আমলাতন্ত্রকে দাবো রাখতে দেবে না"—এক কথায় যার আদর্শ তাচাই ও তাচি। এক্ষেত্রে অবদান যত অধিক হবে, তত ই ভাল হবে, "red and expert" হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হবে কৃষি, যেমনটি শিল্প "Agriculture as the foundation, industry as the leading factor."

**তাচাই ও তাচিংয়ের শিক্ষা**

"In agriculture learn from Tachai, in industry learn from Taching"—Chairman Mao in 1964. মনে রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়-উপকরণে ও জাতীয় সম্পদগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবার পরেও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতিগুলোর দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থেকে যায়, যেমন থাকে উপরিকাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বন্দ্ব। তাচাই ও তাচিংয়ের অবদান তাদের বিপ্লবের উদ্যোগ, অটুট পরিশ্রম, কঠিন মনোবল, উপায় উদ্ভাবন ও উন্নত রাজনৈতিক চেতনার ও শিক্ষায় উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির সমাধানকে সুনিশ্চিত করেছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতাকে ও শ্রেণীসত্তার এলাকাগুলিকে সুচিহ্নিত করেছে ("Two red banners of Taching and Tachai")। যে তাচাই ও তাচিংয়ের শ্লোগানকে মাও চীনে ছড়িয়ে দেবার জোরদার চীনের পার্টির তৃতীয় (১৯৬৪) ও চতুর্থ (১৯৭৫) জাতীয় গণকংগ্রেসে (National Peoples Congress) গৃহীত হয়েছে, মাও-উত্তর চীনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মনীতিতেও সেই একই আলোকে বিচার করতে হবে সঙ্গত, যদি চেয়ারম্যান মাও-র বিরোধী এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের পরিচালনায় তাচাই ও তাচিংয়ের আদর্শ রাষ্ট্রিকভাবে ১৯৭৫ সালে গৃহীত হলেও মিউ পাও চি, মিন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ও অন্যান্য পার্টিসূত্রের মহীশূরাবাদীদের প্রাধান্য ব্যাপারের ফলে এ সম্পর্কে কোনও জাতীয় তৎপরতা, এমন কি তথ্যভিত্তিক বা পরিস্থিতিভিত্তিক জাতীয় সম্মেলনও ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। তাচাই চেয়ারম্যান মাও কুয়ো ফেংয়ের তথা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালে প্রথমে "তাচাই থেকে শিক্ষা নাও"-এর দ্বিতীয় সম্মেলন এবং তারপর "তাচিং থেকে শিক্ষা নাও"-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন মহান বিপ্লব সংরক্ষক প্রতিবিপ্লবের সমস্ত অপপ্রচারকে অপসারণ করার পর করে

এবং চীনের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার এই নীতি দুটিকে অধিকতর দৃঢ়ভিত্তি করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। আমাদের দুঃখদের মধ্যেই মহাচীনের সমস্ত ভাউচীনেই তাচাইয়ের মন্ত্রকে দীক্ষাগ্রহণ করতে হবে, বস্তুমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই (অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যেই) চীনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তত এক তৃতীয়াংশকে তাচিয়ের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানেরমূলনীতি গ্রহণ করতে হবে। মাও জেদুংয়ের নেতৃত্বে উত্তির এবং তাচাই তাচিয়ের মন্ত্রের প্রতিপ্রকৃতি কি?

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক, উৎপাদন ও উৎপাদনশক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ উৎপাদন ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রশ্নে সমস্যার মেরুদণ্ডে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। রাজনীতির অনুশাসনে অর্থনীতির বিকাশ (Politics in Command of Economics) কথাটার তাৎপর্য এক্ষেত্রে এই যে দেশের বিপুলতর সম্পদসমূহকে সঠিক করে তুলবার উদ্যোগ, উদ্যম ও শক্তির মূল প্রেরণা কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উপরিকাঠামো থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত গভীর প্রসারী রাজনৈতিক জাগরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ যুদ্ধ লাইনের সঙ্গতি ও দু হাজার সঙ্গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করার পরে উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি ও উপকরণগুলির বিজ্ঞানসম্মত উত্তির মাধ্যমে যান্ত্রিকতার ব্যবস্থার বিকাশে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রোথিত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ পথেই অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে, সমস্ত সমস্যার শক্তিগুলিকে সর্বোত্তম উপায়ে সমাবেশ করা যায়, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি প্রাণ শক্তির উন্মেষ ঘটে...এ পথেই পড়ে ওঠে অর্থনীতিতে শিল্পের বিভাজক ভূমিকা আর কৃষির বিপুলতর ভিত্তি ("Industry as leading factor, agriculture as foundation") এবং সামাজিক প্রলেতারীয়করণ (Proletarianisation of society)। এ পথেই দূর হবে গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান, চিন্তাশক্তির সঙ্গে কায়িক শ্রমশক্তির ব্যবধান, কৃষকের সঙ্গে শ্রমিকের ব্যবধান। এ পথ তাচাই ও তাচিয়ের পথ।

**তাচিয়ের লাল নিশান**

"In industrial enterprises, the fundamental task of the revolution in the realm of the superstructure is to ensure that the task of consolidating the

dictatorship of the proletriat is fulfilled at the grass-root level amidst acute seruggle between the two classes, the two roads and the two lines. To this end it is necssary to carry out resolutely Chairman Mao's revolutionary line in enterprises, resist and defeat revisionist lines, keep the leadership of enterprises in the firm grip of Marxists, and the mass of workers, do deep going political and ideological work, arm the people withMao Tse-tung Thought and work unceasingly to promote the revolution of people's thinking"—Chairman Hua Quo feng.

প্রসঙ্গ তাচিং—চীনের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি অরেষিত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অরণ্য-অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে, বিশেষতঃ তৈল-শিল্প সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞরা বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েও কোন তেলের সন্ধান পাননি। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যারা ব্যাপারটির সাক্ষাৎ জানতেন তারা এ সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একমত হয়ে অবাস্তব উপদেশ দান করেন। ক্রমে বিশেষজ্ঞরা বিরক্ত হলেন, শুরু হলো জনগণের পালা। ক্রমে স্থানীয় জনগণের প্রেরণায় উদ্যোগে ও উদ্যমে কাজ শুরু হলো, ক্রমে মহাচীনের নানা অঞ্চলের কমিউনগুলো থেকেও কর্মক শ্রমিক প্রতিনিধিরা এসে তাদের অভিজ্ঞতা যোগ করলেন, যোগ দিলেন পদস্থ কেউ। 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের' অগ্রগতির বিপ্লবের উদ্যোগ অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামী চেতনার সাহায্যে একদিন তেলের সন্ধান ও বাগান মিললো। সে ১৯৭৯-৮০ সাল, কোন বিশেষজ্ঞের অনেকেই ইতিপূর্বেই চেপে গাড়ি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই নিউ পাওচি ও লিন বিয়াও গোষ্ঠীদের প্রাণপণ বিরোধিতা সত্ত্বেও যারে যারে হাজির হয়ে শ্রমিকদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন ও উপদেশ দিয়ে গেছেন মহান নেতা মাও সে-তুংয়ের 'অন প্রাকটিস' ও 'অন কন্ট্রাডিকশন' আরও আয়ত্ত করে সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে।

ক্রমে হিলুংকিয়াংয়ের এই অঞ্চল ঘুরে গড়ে উঠলো তাচিং শিল্পাঞ্চল—পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের অরণ্যঞ্চল ঘেরা শিল্পাঞ্চল—যেখানে গ্রাম আর শহর মিলে মিশে একাকার, কৃষি ও শিল্পের প্রাচুর্য, যেখানে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি ছোটখাট প্রশাসনিক দপ্তরগুলি অফিস আর তৈল কূপগুলোর মধ্যে খামার-গুলোর মধ্যেকার এক মিলিত সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে।

আর উৎপাদন? কৃষিবিজ্ঞান, বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরীর পঞ্চাশটি ডিভিসনে বিভক্ত পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিকের এই তাচিং তৈল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১৯৭৯ সালের উৎপাদন থেকে যেটুকু 'লাভ' ধরা যেতে পারে কেবল-মাত্র সেটুকুই রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এতাবধি প্রাপ্ত যাবতীয় 'ঋণ' পরিশোধ করার পক্ষে যথেষ্ট। আর উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি হার যেখানে ২৮ শতাংশ এবং উৎপাদন ক্ষমতার যে তৈল শিল্প প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সবচাইতে অরেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সমকক্ষ, প্রযুক্তি বিদ্যায় অনেকগুলি ক্ষেত্রেই যে প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সবচাইতে উন্নত রাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে কোন যা অজ্ঞাত 'বিশেষজ্ঞদের 'পাণ্ডিত্যের' পোচকীয় লজ্জা ও পরাজয় সম্পর্কে দুনিয়ার টেকনোক্র্যাটপন্থীদের মতামত জানতে অবশ্যই অনেকে আগ্রহী হবেন। তাছাড়া তাচিং তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় ও পাওনতীয় সবটাই প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন করে যাচ্ছে এবং ১৯৭৯ সালের পর আজ দীর্ঘ ১৫ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে একটাকা ঋণও চেয়ে পাঠায়নি।

উৎপাদনের সমস্যা যাবতীয় বস্তুগত-ভাবেই, অতএব, একেত্রে তাচিংয়ের পদ্ধতি সমস্যার সমাধানসূত্র—"Go ahead with the work when the conditions are available and, when they are not available, go ahead by creating the necessary conditions". অর্থাৎ "কাজের প্রয়োজনীয় অবস্থা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ কাজ এগিয়ে নিয়ে চল, আর যখন তা নেই তখন প্রয়োজনীয় অবস্থাকে তৈরী করে নিয়ে এগিয়ে যাও।" উৎপাদন বিষয়ে উৎপাদ-চলন এই তাচিং অনেকগুলো জটিল ও প্রধান প্রধান প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছে—"বিপ্লব ও উৎপাদনের মধ্যেকার, রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যেকার, চেতনা ও বস্তুর মধ্যেকার, রাজনৈতিক সচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোহমুক্তির মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক ঐক্যকে" যথাযথ রূপে কাজে লাগানোর শিক্ষা দিয়েছে যা-সম্ভবিত আমলার আমলত্ব এবং চীন কোম্পানীর সবরকমের দ্বন্দ্বিক দিয়ে কার্যকরী করে তুলে উৎপাদ-কাঠামো ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবকে ত্বরিত করিয়েছে তাই আজ চীন সঙ্কল্প নিয়েছে "নতুন নতুন যদি অঞ্চল গড়ে তুলতে হয় যেখানে কৃষি ও শিল্প, কিংবা গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলগুলি পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকবে না—সে প্রত্যেক যাতে শ্রমিক ও কৃষক, শহর ও গ্রাম, বাণিজ্যিক ও কারিগরী জ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ কমিয়ে আনবে।" (নয়া চীন সংবাদ সংস্থা ১৮/১২/৭৮)।

তাই তাচিংয়ের বিষয়কে মহাচীনের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে 'তাচিং থেকে

শিক্ষা নাও' অভিযানের প্রথম ভারতীয় সফরকে দাস ব্যাঙ্কারের অধিক প্রতিনিধি প্রতিনিধির এক অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা (এপ্রিল-মে, ১৯৭৭) চীনের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

তাহলে একেবারে গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের একনায়কত্বকে সফল করার জন্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে, এককথায় তাকে সমর্থনে বুঝতে হলে "তাচিয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে, সেখানেই এর উত্তর মিলবে" (মনোরঞ্জনে চেয়ারম্যান রয়)। বুর্জোয়া-পাতি বুর্জোয়া চাষী, কুলাক ও অন্যান্যকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরই শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, তারাই পিছিয়ে পড়েছে—এটাও তাচিয়ের শিক্ষা। একই কারণে তাচিয়ের 'দশটি না' (Ten Nos) দাবী চীনের সমবায়ের শ্রেণীসংগ্রামের জীবন্ত নৈতিক ভাষ্যকার।

### তাচাইয়ের লাল নিশান

পৃথিবীর জনসংখ্যার বিশ শতাংশ চীনের অধিবাসী, পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির মাত্র শতাংশের কম চীনে অবস্থিত। কিন্তু মাত্র শতাংশের কম জমির অধিকারী চীন বিশ শতাংশের অধিক জনসংখ্যাকে ভরপেট খেতে দিতে পারে যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ করতে অক্ষম, তাদের জনসংখ্যা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও। তারপরও তার রয়েছে এদের বিশাল জনসংখ্যার আনুপাতিক খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার। এটা অবশ্য সম্ভবপর হয়েছে সমাজতান্ত্রিক প্রশ্ন ও বিধি ব্যবস্থার জন্য। তাহলে তাচাই প্রশ্ন চীনের কাছে যাদুকরী খাদ্য প্রশ্ন নয়, তার চাইতে বিশেষ কিছু অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক গ্রামেতাত্ত্বীয় শ্রেণীসংগ্রাম, প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করার সংগ্রাম, উৎপাদনের উপায়গুলির আধুনিকীকরণের সংগ্রাম, মহান গ্রামেতাত্ত্বীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষায় কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

তাচিয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎপাদনের ভাবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত-বিচারের প্রধান মানদণ্ড এবং এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে আত্মবিশ্বাস উপায়ে জয় করে নিতে পারা শুধুই সাফল্যের নয়, অন্যান্যের সাফল্যের চাবিকাঠি (key link), (the Tachai spirit of self-reliance and hard work ...Tachai is an example of discovery, invention, creation and advance in the field of agriculture." কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তাচাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, আবিষ্কার, নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে আছে। আর যাদের পদ্ধতি হলো ভুল করা ভয় নেই, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও পথ খুঁজে যাবে' (Do everything through trial and error)।

দুর্গম পাহাড় অঞ্চল তাচাই, শুধুই খাড়া আর খাড়াই পাহাড় আর তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাহাড় কেটে সমতল জমির তালি—কিছু মানুষ একজোটে কৃষি-জমি রূপে এই জমিগুলি তৈরী করে তুলেছেন। তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম, তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

তাচাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎপাদনের ভাবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত-বিচারের প্রধান মানদণ্ড এবং এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে আত্মবিশ্বাস উপায়ে জয় করে নিতে পারা শুধুই সাফল্যের নয়, অন্যান্যের সাফল্যের চাবিকাঠি (key link), (the Tachai spirit of self-reliance and hard work ...Tachai is an example of discovery, invention, creation and advance in the field of agriculture." কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তাচাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, আবিষ্কার, নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে আছে। আর যাদের পদ্ধতি হলো ভুল করা ভয় নেই, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও পথ খুঁজে যাবে' (Do everything through trial and error)।

দুর্গম পাহাড় অঞ্চল তাচাই, শুধুই খাড়া আর খাড়াই পাহাড় আর তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাহাড় কেটে সমতল জমির তালি—কিছু মানুষ একজোটে কৃষি-জমি রূপে এই জমিগুলি তৈরী করে তুলেছেন। তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম, তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

তাচিয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎপাদনের ভাবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত-বিচারের প্রধান মানদণ্ড এবং এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে আত্মবিশ্বাস উপায়ে জয় করে নিতে পারা শুধুই সাফল্যের নয়, অন্যান্যের সাফল্যের চাবিকাঠি (key link), (the Tachai spirit of self-reliance and hard work ...Tachai is an example of discovery, invention, creation and advance in the field of agriculture." কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তাচাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, আবিষ্কার, নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে আছে। আর যাদের পদ্ধতি হলো ভুল করা ভয় নেই, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও পথ খুঁজে যাবে' (Do everything through trial and error)।

দুর্গম পাহাড় অঞ্চল তাচাই, শুধুই খাড়া আর খাড়াই পাহাড় আর তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাহাড় কেটে সমতল জমির তালি—কিছু মানুষ একজোটে কৃষি-জমি রূপে এই জমিগুলি তৈরী করে তুলেছেন। তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম, তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

তাচিয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎপাদনের ভাবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত-বিচারের প্রধান মানদণ্ড এবং এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে আত্মবিশ্বাস উপায়ে জয় করে নিতে পারা শুধুই সাফল্যের নয়, অন্যান্যের সাফল্যের চাবিকাঠি (key link), (the Tachai spirit of self-reliance and hard work ...Tachai is an example of discovery, invention, creation and advance in the field of agriculture." কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তাচাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, আবিষ্কার, নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে আছে। আর যাদের পদ্ধতি হলো ভুল করা ভয় নেই, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও পথ খুঁজে যাবে' (Do everything through trial and error)।

দুর্গম পাহাড় অঞ্চল তাচাই, শুধুই খাড়া আর খাড়াই পাহাড় আর তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাহাড় কেটে সমতল জমির তালি—কিছু মানুষ একজোটে কৃষি-জমি রূপে এই জমিগুলি তৈরী করে তুলেছেন। তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম, তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

তাচিয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎপাদনের ভাবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত-বিচারের প্রধান মানদণ্ড এবং এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে আত্মবিশ্বাস উপায়ে জয় করে নিতে পারা শুধুই সাফল্যের নয়, অন্যান্যের সাফল্যের চাবিকাঠি (key link), (the Tachai spirit of self-reliance and hard work ...Tachai is an example of discovery, invention, creation and advance in the field of agriculture." কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তাচাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, আবিষ্কার, নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে আছে। আর যাদের পদ্ধতি হলো ভুল করা ভয় নেই, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও পথ খুঁজে যাবে' (Do everything through trial and error)।

দুর্গম পাহাড় অঞ্চল তাচাই, শুধুই খাড়া আর খাড়াই পাহাড় আর তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাহাড় কেটে সমতল জমির তালি—কিছু মানুষ একজোটে কৃষি-জমি রূপে এই জমিগুলি তৈরী করে তুলেছেন। তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম, তাচাই কৃষিকে সমবায়ের একনায়কত্বকে সফল করার সংগ্রাম, ভারীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার সংগ্রাম।

you want knowledge you must take part in the practice of changing reality"—Mao : তাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে যেমন তাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই, উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বক্তব্যসমূহক অন্যান্য শ্রেণী-সংগ্রামের "poitical work is the life blood of all economic work". তাচাইয়ের বিশেষ পদ্ধতিতে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য এবং সংগ্রাম-সমালোচনা-রূপান্তরের ক্ষেত্রে মাওয়ের বিখ্যাত পেরিলা ট্যাকটিকটি চমৎকার রূপে ফলিত হয়ে উঠেছে "Only when ghosts and monsters are allowed to come out into the open can they be wiped out ; only when poisonous weeds are allowed to come out of the ground can they be uprooted." এই নীতিটি সমস্ত শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ে, দুই ব্লকের লড়াইয়ে, দুই লাইনের লড়াইয়ে। মতগুলিকে প্রয়োগ করতে শিখতে হবে, যাদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, বাকি দুই-য়েরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, একে একে উৎপাটিত করতে হবে "to unite with many, to struggle against the few class enemies and to eliminate the enemies one by one. অতএব,তাচাই-এর পথ চীনের রক্ষিপ্রিয় পথ।

"The principle of putting politics in command and placing ideology in the lead, the spirit of self-reliance and hard struggle and communist style of loving the country and the collective, in all of which the Tachi Brigade has preserved, should be vigorously promoted"—Chou En-lai at the 3rd National People's Congress 1964.

এক্ষেত্রে মাও জৌকে অনুসরণ করে চীনের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে দক্ষিণ চীন সাগর থেকে সিনকিয়াং অবধি ও ইয়ানদির দক্ষিণ থেকে চীনের প্রাচীর অবধি সমস্ত জুড়ে 'তাচাইয়ের লাল ফুল' ('Red Tachai Flowers') ফুটিয়ে তোলার স্লোগান দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাচাই পার্টি-সংগঠক ও তাচাই বীর চেন ইং-ফুইয়ের প্রয়াস ও প্রতিজ্ঞাকে সার্থক করে তোলা যেতে পারে—"Even if the Heavens fall, we can hold them up"…"the new generation of educated workers must be both red and expert."তাচাই

অভিটরের পাঁচটি 'কখনো নয়' ( Five 'Nevers') এবং তিনটি 'চালু রেখো' (three 'Keep-ups') প্রতিজ্ঞাগুলি অবশ্যই সর্বহারার আদর্শ নিষ্ঠার, চেতনার ও প্রতিজ্ঞার দৃষ্টি।

**যন্ত্র, জনগণ ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা:**

এই সমস্ত মূল্যায়নের সঙ্গে বিপ্লবের মূল উপাদানগুলি, বিষয়গুলি ও পদ্ধতিগুলি জড়িয়ে আছে। ভারতীয় সোধনবাদীরা এই নীতিকে আক্রমণ করার অর্থ কি? বিপ্লব জনতন্ত্রের বিষয়গুলির বিরুদ্ধে এগুলিই তো সংগ্রামের মূল উপায় ও হাতিয়ার। তবে যারা জনগণকে সমাজতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি হিসেবে দেখতে শেখেন নি, অস্ত্র ও যন্ত্রকেই সংগ্রামের শক্তিরূপে ভাবতে শিখেছেন তাদের কথা আলাদা। মনে রাখতে হবে অস্ত্র ও যন্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার মাত্র। আর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে আবহাওয়া করা হাতিয়ার নতুন নতুন মূল্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করতে পারে, এমন কি বিপ্লবের লাগাম সেচনেও টানতে পারে। এ সত্যকে যদি প্রাণে বুঝতে যারা অক্ষম, সমাজতন্ত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা অক্ষম। লিউ শাওচি ও তেং সিয়াও পিংয়ের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের মাহাত্ম্যকে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ও যন্ত্রশক্তির পটভূমিকায় এরাও দেখেছিলেন। কিন্তু সর্বহারার চূড়ান্ত ভূমিকা তার সংখ্যায় নয়, রাজনৈতিক সামর্থ্যে।

আজকের সি পি আই ( এম ) একটি শক্তিশালী সোধনবাদী শক্তি। চীনের বাস্তব পরিস্থিতির বিচার এবং তার ঘনিষ্ঠতা তার পথে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে নীতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের মার্কসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত—এ সত্যকে এরা স্বীকার করেন না। "Grasp revolution, Promote production"—বিপ্লবের বিষয়গুলোকে আয়ত্ত কর ও প্রয়োগ কর, এ পথে সমস্ত উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সংহত হবে সামাজিক উদ্যম, বিকাশ লাভ করবে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি ও উৎপাদন-প্রেরণা। বিপ্লব আরও করায়ত্ত হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গুলি ও কর্তব্যগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে যার যাই হোক, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না। অস্ত্র ও যন্ত্রের ভূমিকাকে যান্ত্রাতিরিক্ত রূপে দেখা একটা পাতি-বুর্জোয়া যান্ত্রিকতত্ত্বের ( technocracy ) সংস্কার। এই শ্রেণীর লোকেরাই মতাদর্শগত ব্যাপারে বন্ধ্যাত্বই বিপ্লবের উৎস জনগণকে লঘু করে দেখে, তাই একটা যান্ত্রিকতার দ্বারা দ্বিতীয়বারের যুদ্ধকে জন যোগাযোগের ভূমিকায় দেখেন, কিন্তু চীনের জনযুদ্ধের ট্যাকটীয় পটভূমিকায় দেখতে পান না, তারা চীনের নীতির সঙ্গে মার্কস-লেনিনবাদের সংঘাত আবিষ্কার করবেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে। ভারতীয় স্তরে একমাত্র সর্বহারা-নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের হাতিয়ারগুলো সম্পর্কে যথার্থ সচেতন ও সক্রিয় হওয়া সম্ভব; তেমনি আলোচ্য যে কোন দুটি দেশে সর্বহারার ক্ষমতা যতই সংহত হবে, তাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ততই বেশী সহজসাধ্য ও বাস্তব হয়ে উঠবে। যদি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ তার সামাজিক চেতনা, সামাজিক সত্তা, সামাজিক উদ্যম ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের মাঝে যা কিছু বিকাশে বাধক ও রুদ্ধ করে চলে, উৎপাদনের শক্তিগুলোর যান উন্নয়ন ও উৎপাদনের ব্যাপকতম ও গভীরতম সামাজীকরণ ঘটায়, যদি জনগণের মধ্যেকার অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সৌম্য মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে চলে, যদি উপরিকাঠামোর সঙ্গে ভিত্তির দ্বন্দ্বে জনগণের হস্তক্ষেপের উপায়কে সম্প্রসারিত করে চলে ও সর্বহারার আত্ম-প্রত্যয়কে দৃঢ় সক্রিয় রাখে, তাহলে সে সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজে যেমন পরিত্যক্ত হয় না তেমনি অন্য দেশকে তার উপর বিতৃষ্ণাশীল করে না তুলেও সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য সুচারুরূপে করে যাবে—যেমনি করছে চীন তৃতীয় বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রে। তাই লেনিন বর্ণিত রাশিয়া আজকের দিনের চীন, আর লেনিন-বর্ণিত পিছিয়ে থাকা মুক্তিকামী অঞ্চল আজকের চীন নয়, বরং বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল।

চীন অবশ্যই তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তার বৈদেশিক নীতিতে এটা সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিপ্লব ও সমস্যাবলী সম্পর্কে চীনের বৈজ্ঞানিক, আধিসত্তী, কূট-নৈতিক সামরিক ও অন্যান্য মুক্তিকামীতি রহিত সহায়তার নীতি লেনিনবাদকে আরো ব্যাপকতা ও প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

# ভারতের স্বদেশী যুগ

## কালীপদ বিশ্বাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেবল "বাঙালী যুগ" বাক্যটি সংকলন ও যোগ করে যেমনি এর ভাবাদর্শও ব্যাখ্যা করে গেছেন মনীষী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন বা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত তারাই জানেন একজন পণ্ডিত-প্রেমী এবং স্বদেশী যুগের সেরা মেধাবী ছাত্র হয়ে ও সরকারী সাহায্য ও চাকরীর মোহ উপেক্ষা করে সেই যুগান্তরে অংশগ্রহণ করলেও অধ্যাপকের চিন্তা-ভাবনায় কখনও কোনরূপ ছন্ন-দৌর্বল্য প্রশ্রয় পেতনা। তাঁর বক্তব্যে সর্বদাই দীর্ঘমাত্রা দেওয়া থাকত তথ্যনির্ভর যুক্তি তর্কের উপর।

ভারতবর্ষে যেমন রাজপুত মারাঠা তামিল তেলেগু ও সিন্ধের যুগ এসেছিল তেমনি বা তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক যুগান্তর এসেছিল বাঙালীরা এবং অধ্যাপক সরকার মহাশয় যে যুগের চৌহদ্দি টিকে দিয়ে বলেছেন এ যুগ শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সনের বাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরে এবং অন্তরিক্ষের দিকচিহ্ন রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে। এই বিশ বছরের মধ্যে ১৯০৫ সনটি বেছে নিয়ে এর নামকরণ করেছেন "বাঙালী বিপ্লব" বছর, কারণ ঐ সময়ই স্বদেশী যুগের চিন্তাধারা ও কর্মধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক নিজেই।

এই ১৯০৫-এর বছরটিকে বিনয় সরকার দীর্ঘমাত্রা এলাবিত করে দিয়ে রেখেছেন। তিনি এই বছরটিকে আবাহন করেছেন যেমন এশিয়ার তেমনি ভারতবর্ষের নবজাগরণের শুভ মুহূর্ত বলে। এশিয়ার সেই নবজাগরণ এসেছিল জাপানের বিজয়ে। এবং ভারতবর্ষে এল বাঙালী প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলন মাধ্যমে। অধ্যাপকের নিজের ভাষায় : "জাপানী জাত দুনিয়ার বেবাইল যে, মুরুব এশিয়া বিশ্বশক্তির একটি নয়া অধ্যায় খুলিতে চলিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বাঙালী মরুমারী ভারতকে আর সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াকে এবং ইয়োরোপকেকে খুলাইয়া ছাড়িল যে বিশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালীর টিকানাও কায়েম হইতে চলিল।"

অধ্যাপক সরকারের মন্তব্য বাঙালীর সম্পর্কে অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে যদি না তাঁর যুক্তি-র প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন করে এশিয়ার পক্ষে জাপানবিজয়ের গুরুত্ব এল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন গতশুর সকল শতাব্দীতে ব্যাপারখানা যুদ্ধের কথা। সে যুদ্ধে গ্রীস-আক্রমণকারী পারস্যবাহিনী (বর্তমানের ইরানী) গ্রীস কর্তৃক পরাজিত হয়। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছিলেন ম্যারাথনে গ্রীস যদি পরাজিত হত তবে ইয়োরোপে কী পরিস্থিতি ঘটত? উত্তরে তারা তরুণের আশার দিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান তা হোলো উপর এই যে ইয়োরোপ এশিয়া হয়ে যেত। বিগত ২০০০ বছর ধরে পৃথিবীতে যে সভ্যতা উন্নতির পথে চলেছে তার গতি রুদ্ধ হত।

ঠিক একই ধরনের যুক্তি অনুসারে প্রফেসর সরকার প্রশ্ন করেছেন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে এশিয়ার কী অবস্থা হত? সহজেই বুঝতে পারা সম্ভব যে হারলে "জাপানের অস্তিত্ব থাকিত না—তাহা হইলে চীন এতদিন ইয়োরোপের মধ্যে তলাতলি হইয়া যাইত,—পারস্য এবং আফগানিস্তানের দুর্ভোগের কারণ সম্পূর্ণ-রূপে এশিয়া ইয়োরোপের হইয়া পড়িত"। মনে রাখা উচিত হবে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধ ১০ বৎসর পূর্বে রুশরা যখন অধ্যাপক সরকার নিজে চীন জাপান কোরিয়া সফরশেষে তথ্যপূর্ণ করে মন্তব্য পেশ করে গেছেন।

সময়টা ছিল ১৯১৪-১৫ সন যখন গোটা এশিয়া, তুরস্ক থেকে জাপান ইয়োরোপের অধীন, একমাত্র জাপানের পুরোপুরি স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল। অন্যান্য যান ভারতবর্ষের মত পরাধীন না হলেও যথার্থ-স্বাধীন কেউই ছিল না। চীনের বিদেশীদের ব্যাপারটি বিদেশী রাষ্ট্রদূতের ক্ষমতা অত্যধিক। চীনা "পরাজে" ইংরেজ, ইতালি, ফরাসী, রুশ, জাপান ও জার্মান এই ৬টি রাষ্ট্রের সতন্ত্র সরকার চলছে। শাঙ্গাই (যেখানে পাইলাতে) ছাড়া ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তর চাপ পড়ে আছে। আফগানিস্তান ও পারস্য ইংরেজ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যেকার 'বাফার' স্টেট যায়। এই সব দেশকে ঐ সব রাষ্ট্রের "স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স" এবং "স্ফিয়ার অফ ইন্টারেস্ট" রূপে ভাগ করা হত। চীনের অন্যতম কুরাপি, বিনয় সরকার প্রশ্ন করেছেন, "বিদেশী জনগণের সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার চীনা আদালতে নেই কেন? কারিয়া চীনের অন্তর্গত প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও কোরিয়ার হত প্রসার বন্ধ হয় নাই কেন? "এক্সট্রা-টেরিটোরিয়ালটী" বা কনসেলুর ট্রি-শোট ইত্যাদির অর্থ কি?— কাজেই পীকিং, বাস্তবক্ষেত্রে-ব্যাটেরিয়া

হইতে অনর্গলনিরোধক, কাইরো হয়া পর্যন্ত ১০ কোটি নরনারীর বাসস্থান সম্পর্কে বলা যায়—যেখে যেখে করিম ঝোপা, যেখে ঝোপের নয়। এই বিরাট মহাদেশ বহুযুগ ধরে ইয়োরোপেকার অধিবাসী যখন, ঝোপাঝুপি যায়।

১৯০১ সালে লোর্ড কার্জনের সঙ্গে আমার একবার ঢাই যে এই যে ঝোপাঝুপি করবের পাঁচ ছোর করে এশিয়ার মরদুরের প্রবেশন করল।

অবশ্যই দিনের দরকারের এশিয়ার আপান সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা অসম্ভব করে 'পৌরবের একবিংশ' না হইলে আজকালের ছবিখানি কেমন দেখাবে একটু ঝোঁজ করা যাক।

স্বদেশী যুগ ১৯০৫ সনে না এলে ভারতীয় রাজনীতি কি ভাবে চলে বা থাকত তা বলা খুব মুস্কিল নয়। রাজধানীকে দেখবেরের অভ্যন্তিতে আজও জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির স্বদেশী যুগের কথা বলে। বাংলার পক্ষ থেকে বহুবার প্রস্তাব করে করেন। উত্তর ভারতের নেতারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন এই বলে যে বিদেশী এক্সক্লুসিভ বাংলাদেশেই চলুক, অন্যত্র প্রবেশের কোন কিছু করবার নেই। এই সব কোন থেকে বিদেশী যে উঠে যাবেন তাহাতে ধরতে পারা যায় ভারতীয়দের প্রাক ১৯০৫ যুগে কেমন ছিল, ১৯০৬ করিকে উজ্জীবিত হয়েছিল—আবার বিদেশি আজ যাবের চলতে অথবা অন্তি দুরদর্শনযোগেনী। অবশ্য ঝোড়া-ঝুপি দিয়ে বহুবার প্রস্তাব না হলে, না বহুবার বন্ধ নিল যখন ইংরেজ দুরদর্শনে সকলের প্রথম বাঙালীরা বিরোধিতা করবে বলে আমার। এই সকলের প্রস্তাবের মূলের বাধা বিশেষ করে মূল উপাদে কেমন স্বদেশী যুগান্তর।

সংবাদপত্র রাজনীতি ছেড়ে বাকিপত রাজনীতিক মতবাদের দিকে তাকালে ভারতের অন্য প্রদেশের অথবা প্রাক স্বদেশী যুগে কেমন ধরনের ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এবং উনি শিষ্যেরা ছাড়া কেউ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অভিনন্দন করা তো দূরের কথা সোজাসুজি বিরোধিতা দেখিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে কেন পনেরো বছর বয়সে বিদেশে লেখাপড়া শুরু করতে হয়েছিল সে কথা তিনি তাঁরই আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পণ্ডিত মতিলাল স্বদেশী যুগের বাঙালী 'কাজার ব্যাপারের


ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

আপনি চাইলেই আপনার পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখতে পারেন

যে কোন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মীর পরামর্শ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার কল্যাণ সংস্থার মাস মিডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

দেখতে পাচ্ছেন না। The Swadeshi and boycott movements did not seem to him to carry matters far. He looked to the west and felt greatly attracted by western progress and thought that this could come through an association with England. এমনি তাৎপর্যে গড়ে ওঠা মানুষ যে তার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে মিশে সবরকমে স্বদেশী ও বয়কট নিয়ে ও দূরে থাকবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অমলেশবাবুও লিখেছেন, He had naturally enough joined the Moderates whom he knew and many of whom were his colleagues in his profession. He presided over a provincial conference in his province and took up a line against the Extremists of Bengal and Maharashtra.

স্বদেশী ও বয়কট-ই সর্বপ্রথম গোটা ভারতবর্ষের এই ইংরেজের পক্ষপুটে থেকে জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষায় মূলে কুঠারাঘাত করল। সুরাত কংগ্রেস অধিবেশনের পর পণ্ডিত যতিলাল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা যখন জেলে বন্দী ছিলেন তখন বাঙলার ও মহারাষ্ট্রের নায়কেরা হয় জেলে বন্দী থাকতে, নয় দেশান্তরে।

এ তো হল বাঙলার বাইরে বৃহত্তর ভারতবর্ষের ছবি। দেশের অন্তঃপুরে প্রাক-স্বদেশী যুগের অবস্থা কেমন ছিল। যেমন আজকে তেমনি শতাব্দীর গোড়াতেও আপামর বাঙালী পণ্ডিত তার সাহিত্যান্বিত চিন্তাধারার প্রাচুর্য ও বলিষ্ঠতায়। প্রাক-স্বদেশী যুগে বাঙালী মনস্বীরা স্বদেশপ্রেমের কী ধারণা পাঁচতে আগ্রহী ছিলেন? বেশী ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন হবে না কারণ তখনকার একখানি মাসিক পত্রিকা ঐ একই বিষয়বস্তুর উপর আমরা যাদের আজ ঋষি ও দ্রষ্টার ঋষি তাদের সম্পর্কে একাধিক লেখকের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও লেখা প্রকাশ করেছিল। বলাই বাহুল্য এদের প্রায় সকলেই প্রাক-স্বদেশী যুগের মানুষ। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরের স্বদেশ চিন্তা আলোচনা করে লেখক জানাচ্ছেন, "সাম্প্রতিক কালের মানবতে আলোচ্য যুগের স্বদেশ চিন্তা বিচার করলে অন্তর একটি ব্যাপার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর অবধি সকল লোকনায়ক পুরুষই ভারতে স্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে করিতেন।" বঙ্কিমচন্দ্র-এর ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা আলোচনার পর এক-জন লেখক অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে তাঁর "মন ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজ শাসনের প্রতি সাধারণ ভাবে সুপ্রসন্ন ছিল। অনেক জায়গায় তিনি ইংরাজ শাসনের প্রশস্তি রচনা করেছেন।" একটি উদ্ধৃতি দেবার পর লেখক মন্তব্য করেছেন, "এখানে সাধারণের চোখে স্পষ্টই একটা বিরোধ রয়েছে। একদিকে স্বদেশ চেতনা আর একদিকে ইংরাজ শাসনের প্রতি এ দুটি পরস্পরবিরোধী। এরই লোকের মধ্যে কি করে সম্ভব? এটাই বঙ্কিমের দেশ-প্রেমের বৈশিষ্ট্য।

বাঙলার বাইরে ইংরাজ শাসন বিধাতার আশীর্বাদ—এই ধ্যান ধারণা বেসান্ত-কংগ্রেস তক অব্যাহত ছিল। "ঘরে"ও স্বদেশী যুগের বাড়া নবেও বৈরিতা আসে নি।

আজ প্রশ্ন করা যেতে পারে যদি স্বদেশী যুগান্তর না ঘটত তবে বাঙালী সমাজের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ কি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত দুর্বুদ্ধে ধারায় চলত?

এত যেন বহুবারায় লিখিত স্বদেশী যুগের ভেরেন্ডায় একটি ঋষি সংক্ষিপ্ত বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস যায়। বাঙালী সমাজের এমন কোন দিক ছিল না যা এই বিষয়ে যথেষ্টভাবে নাড়া-চাড়া না দেয়েছে। তারতের এই বাঙালী যুগে নিছক স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় সোটি সমর্থন নিয়ে যুবকেরা ব্রতী ও শহীদ হয়েছিলেন যেমন, তেমনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন পথের সন্ধানে ছুটেছিলেন বাঙালী জোয়ানরেরা। স্ব-দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে যেমন স্বদেশী সঙ্গীত, যাত্রা এবং নাটক সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি একমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এবং অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বিদেশে শিল্প কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। অনেকদিন আগে প্রিয়বন্ধু পরলোকগত প্রফেসর বিনোদকুমার সান্যাল স্বদেশী যুগে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাঙালী সমাজ কি কৃতি স্বীকার করেছিল তার যে খতিয়ান প্রকাশ করেছিলেন। নানা শিল্পে ৪০ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন ১৯০৫-০৬ সনে প্রায় ১০০০ শিল্পসংস্থায় বাঙালী সমাজ নিয়োগ করে পরিণামে হারিয়েছিল। কেন? তার কারণ একাধিক, অনেকগুলো রাজ-নৈতিক ক্ষোভেরও ছিল। আজ যে তাঁর শিল্পের ব্যবসায় অবস্থা প্রাক-স্বদেশী যুগে তার তারত্ব ছুয়ে সঠিক অবস্থা কী ছিল? বর্তমানের বিভিন্ন শিল্পের সঠিকতা যাচা?

তারতের এই "বাঙালী যুগ" আলোচনা কালে মনে একটি প্রশ্নের সামনে উপস্থিত হতে হয়। সে প্রশ্নটি হল: স্বদেশী ও বয়কট ঘোষণা ও কার্যকরী না হলে ইংরেজ শাসকরা যে পথে হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও ভাঙা লাগিয়েছিলেন সে পথে যাওয়া চলত কি? বাঙালী মুসলমানের এই বাঙালী-হিন্দু বিরোধিতাই বা কতখানি তাদের রাজনীতিতে হাতেখড়ির কাজ করেছিল?

স্বদেশী যুগ বা না দিলে সে বা আসত কি ?

এই সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী স্বদেশী যুগের স্মৃতি সাধারণ বাঙালীর কাছে আজ আর সৃষ্টি বা প্রতি সাপেক্ষ নয়। যারা সে যুগ প্রত্যক্ষ তাঁরা আজ মৃত থেকে অন্তর্হিত। যারা সক্রীয় হয়েছিলেন অথবা সে যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধের মাটির উপর আছড়ে পড়তে দেখেছিলেন তাঁদের অনেকে, স্মৃতিকথা, অথবা সরকারী হলদেখাটা রীতিম ও এক-পেশে ইতিবৃত্ত ছাড়া জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডারে আমাদের আর কি আছে ? সে যুগের সাক্ষাৎ সাক্ষীস্বরূপ কোন নিদর্শনই আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না যদিও মনে হয় স্বদেশী যুগের স্মৃতিচিহ্ন এখনও সচেতন হলে খুঁজে বের করা সম্ভব।

লোকচক্ষুর সামনে এই জাতীয় স্মৃতিচিহ্ন-গুলি খচিত রাখা না করলে বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে তাদের চির বিদায় নিতে হবে। অনেকটি মূর্তি বা বাড়ী তা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না যেমন, পারবে না স্মৃতিকথা বা ইতিহাসের বই।

প্রতিটি স্বাধীন দেশে, যেমন ইউরোপ যেমন আপনে এই ধরনের জাতীয় আশা ও গৌরবময় ইতিহাসকে সযত্নে করে রাখা হয় মিউজিয়ম সংগ্রহশালায়। আমাদের কলকাতাতেও বিজ্ঞান বিজ্ঞানে অথবা ইতিহাস-উৎসাহীদের একাধিক মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেসব সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হোকটির। কিন্তু জাতীয় চিত্ত-উদ্দীপক একটি প্রতিষ্ঠানও এতদিনেও গড়ে উঠল না কেবল উৎসাহের অভাবে নয়, স্থানাভাবেও বটে।

সাম্প্রতিককালে ঘটনাচক্রে এই দ্বিতীয় অভাবটির সুরাহার এক অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছে স্বদেশী যুগের মিউজিয়মে পরিণত করতে ইহাপেক্ষা কলকাতাতে দ্বিতীয় কোন গৃহ থাকতে পারেনা। এই গৃহটি হল রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ারে স্থিত মল্লিকদের প্রাসাদ বা রাজবাড়ি এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই যোগেশ প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও সুবোধ মল্লিকের সহধর্মিণী অনুমোদনে। ডাঃ ঘোষ জানতে চেয়েছিলেন : মল্লিকদের এই প্রাসাদটি বিশ্ববিদ্যালয় কী কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ? মিঃ ইতিহাসবেত্তা বলেই মল্লিকদের এই বাড়ী-খানির অতীত ঐতিহ্য, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগে এ বাড়ীতে কি সরকার ঘটনা ঘটেছিল তা জানতেন বলেই ডাঃ ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন বাড়ীটির ভবিষ্যৎ নিয়ে। পরে ন বাড়ীটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলেছিল। এবং সাম্প্রতিককালে শ্রীযুক্ত সরকারও দুবছর আগে তাঁর প্রস্তুত তাদের উত্থাপিত প্রস্তাবটিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ে দাবী করেন যে প্রাসাদটি স্বদেশী যুগের স্মৃতি মন্দির করে গড়ে তোলা হোক।

মোগল আমলে দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো ও রামমোহন-উত্তর যুগে ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিল এশিয়ার "সর্বজ্ঞেষ্ঠ" অথবা সর্বপ্রথম স্বাধীন যে বাঙালী কি মাত্র ১৯০৫ সনে তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়ল এবং পুরনো রাজনিষ্ঠতা বর্জন করে নতুন জীবন শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙালী যুগ প্রবর্তন করল। এ কি কেবল কার্জনী পার্টিশনের প্রতিক্রিয়া, না ইংরেজ শাসনের সেই যৌবন কিভিয়াৎ করা চলে তার এবং তার অনুচরদের অজ্ঞাতে বাংলার সমাজদেহের সচেতন অংশে ঠিক তখনো থাকবের উপর অনন্ত অগ্নিশলাকা হয়ে পড়েছিল।

যুগান্তরের চরমপ্রসূ স্মৃতি পুনরুদ্ধারের ও তা স্থায়ীভাবে রক্ষার দায়িত্ব আজ অর্পিত আছে আমাদের তাদেরই কাছে যাদের মাতৃভাষা হল—"আমরি বাংলা ভাষা।"

এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করা আজ অতি সহজ না হয়। যদি বাঙালী হাজার কণ্ঠে দাবী তোলে মল্লিকদের এই প্রাসাদকে স্বদেশী যুগের স্মৃতি মন্দির করা হোক।

# আইন মানছি মানব

## অচিন্ত্য চক্রবর্তী

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন কি ছেনেছি ইংরাজের কাছে। ওদেশে আইনের চোখে নাকি সবাই সমান, রাজার প্রজায় প্রভেদ নেই। দেশের শাসন চলে আইনের লিখিত ও অলিখিত বিধির বন্ধনে। এর অন্যথা হওয়ার উপায় নেই। আইনের বিচারও নিখুঁত ও নিরপেক্ষ।

সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে দুরন্ত ছেলে যেত যে তাঁর রাজ্যে দুষ্টু নেই। দুরন্তরা যৌবনে নাকি কোন অপরাধ করেন। সদাগরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরও আইনের শাসন থেকে রেহাই নেই। এটাই ছিল রাজের বিধান। তাঁর পৌত্র সম্রাট এডওয়ার্ড প্রচলিত রীতি মানতে রাজী হন নি। সেজন্য রাজত্ব ছেড়ে দিতে হয়। দুঃখের সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পিতৃদেব একই দেশের মানুষ ছিল ইংলণ্ডে! আবার ওদেশের আইনে বলে, কিং ক্যান ডু নো রং। আমেরিকা ও আয়তে রাষ্ট্রপতির পদস্খলনের অভিযোগে বিচারের ব্যবস্থা আছে।

ইংরাজ শাসনকে ন্যাচারাল গভর্নমেন্ট বলে অভিহিত করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এককালে অবশ্য ইংরেজের অনুরাগী ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি এই শাসনের অবসান চেয়েছিলেন। কিন্তু এর পরিণামে আইনের বিচারে যে সাজা হয় তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কারণ তিনিও ইংরেজের গড়া আইনের শাসন মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুসারী সত্যাগ্রহীদের প্রতি নির্দেশ ছিল আদালতের সাজা মেনে নাও প্রতিবাদের মাধ্যমে।

ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের পর এদেশেও সেই আইনের শাসন চলছে যদিও অনেক সময় তা নজর এড়িয়ে যায়। আদালতের চত্বরগুলিতে প্রথম যিনি যাবেন তাঁর কাছে চারিদিকের বিশৃঙ্খলার একটা ছবি ফুটে উঠবে। অফিস ঘরগুলিতে আলো ও বাতাসের একান্ত অভাব। পুরীকৃত ফাইল এলোমেলো ছড়ানো। সবটা মিলে একটা চিলেঢালা পরিবেশ।

কিন্তু এটা বাইরের রূপ। একটু ধৈর্য ধরে নজর দিলে দেখা যাবে যে অলিখিত একটা নিয়মে চলছে বিচারে আদালতের কাজ। এখানকার কাজের ধারায় ব্যক্তিক্রম নেই। বাইরের দুনিয়ায় কি ঘটছে তার প্রভাব এখানে খুব কম

বড়-জল-বৃষ্টি হরতাল-বন্ধ সবেও যথারীতি নির্দিষ্ট তারিখে মামলা উঠছে। বিবদমান দুপক্ষের লোকেরা উপস্থিত। হাজির আছেন তাঁদের হয়ে লড়াই করার জন্য উকিলেরা।

একেক আদালতের কক্ষে হাজির বিচার করছেন একেক ধরনের মোকদ্দমা। চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই, মারধোর, জমির স্বত্ব নিয়ে বিবাদ, পরিবারে পরিবারে সম্পত্তির ভাগাভাগি, স্বামী-স্ত্রীর কলহ, তহবিল-তছরুপ, মারপিট, এমন কি রাজনৈতিক অপরাধের বিচার চলছে। প্রতি মিনিট অনুপাতে নতুন মামলা হচ্ছে। আসামী ফরিয়াদী ও সাক্ষীরা হাজির। আসছি যেওয়া হচ্ছে। আবার আদালতকে উপেক্ষা করে হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তারাদেশ জারী হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

এমন দেখা গেছে যে হাসপাতালে ফুল করে ভর্তি রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্লেষণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়ের কেস করায় ভুল ধরা পড়েছে। বেতার অনুষ্ঠানে যেখানে সব কিছু ঘড়ির কাঁটায় চলে সেখানেও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তন করতে হয় 'নির্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে' অনেক সময় কোন বরপক্ষের সুযোগ মিলে যায় গান শোনাবার। অনিবার্য কারণে ট্রেন ও প্লেনের যাত্রার সময় অল্প বহুল করতে হয়। কিন্তু আদালতের চৌহদ্দীতে নির্ধারিত ন্যায়ের মামলার বিনে রায়ের মামলার শুনানী হয় বলে শোনা যায় না।

তার মানে এই নয় যে কোন মামলার বিচার মুলতুবী রাখা হবেনা। যা কিছু হয় সবই একটা প্রচলিত রীতি মেনে। একজন প্রবীণ আইনজ্ঞের কাছে শুনেছিলাম একটি যৌথ পরিবারের সম্পত্তি বাঁটোয়ারার মামলার কাহিনী প্রায় ২০ বছর এই মামলাটি চলেছিল বিভিন্ন আদালতে। প্রথম যৌবনে যখন উনি মামলাটি হাতে নেন তখন পক্ষিক ছিল বারো জন। পরে বাড়তে বাড়তে পক্ষিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় চৌষট্টিতে। পরিবারে একজন মারা গেলে অথবা শিশুর জন্ম হলে মূল আর্জির রদবদল প্রয়োজন হয়ে পড়ত। এর পদ্ধতি সময়-সাপেক্ষ। পরিবারে নাবালক ও বিধবা

হাকার অটিলতা বাড়ত। এরপর মেয়েদের শৈশব সম্পত্তির অংশ স্বীকৃত হল নতুন আইনে। জটিলতা বেড়েই গেল।

মামলাটির যখন শুরুয়াত হয় তখন দুই সম্পত্তির অর্ধেক হইল। উকীলবাবু বললেন যে এই মামলা তাঁর জন্মী। একে মেয়ে করে তার পক্ষে, প্রতিপক্ষ ও আইনের জ্ঞান রেখেছিল। দীর্ঘদিন মামলাটি চলেছিল—সবই আইনের গভীর মধ্যে। ওঁর মত আরও অনেকজন উকিল এর সঙ্গে যুক্ত থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন। তাঁদেরও সদা প্রচেষ্টা ছিল কি করে আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়!

আমরা সবাই শান্তিপ্রিয়। কেহ কাহেলায় জড়াতে চাইনা। আদালত পুলিশ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চাই। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার দুচারটি নমুনার উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে আমরা কেমন আইনের অনুগত।

যেমন আমরা জানি চাকুরীক্ষেত্রে জন্ম তারিখ ও বয়সের সঠিক প্রমাণ কত প্রয়োজনীয়। প্রবেশিকা পরীক্ষাতে পাওয়া সার্টিফিকেট এ ব্যাপারে চরমপত্র হইল। অভিভাবক সোজাসুজি এ বিষয়ে সচেতন না হলে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়তে হয়। আমাদের সকলের পক্ষে সঠিক বয়স প্রমাণ করার প্রচেষ্টা সহজ হয়না। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির মামলার কথা আমরা দেখেছি। ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে মেয়েকে ভর্তির সময় বুঝিয়ে পড়েছিলেন এক ভদ্রলোক। স্কুলের নিয়ম ছিল যে ছাত্রীর বয়স কোনক্রমেই পাঁচ বছরের বেশী হওয়া চলবেনা। কিন্তু ওঁর মেয়ে সেই হিসাবে পাঁচাত্তর বছর। ডাক্তারদের পরামর্শে ব্যাংকশাল কোর্ট একটা এফিডেভিট করে তিনি হলফ করলেন যে তাঁর কন্যার "আসল" বয়স চার বছর আট মাস। হলফনামার নকল নিয়ে কর্পোরেশন অফিস থেকে বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন। প্রায় দু সপ্তাহ লেগে গেল আমার অফিস আদালতে যাতায়াতে। ইতিমধ্যে ইস্কুল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে আর আসন খালি নেই। অগত্যা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য খোঁজ করতে লাগলেন। একটি স্কুলের সন্ধানও পেলেন। এখানেও ইংরাজী মাধ্যমে পড়ানো হয়। তবে নতুন নিয়ম চালু ছিল এখানে। ছাত্রীর বয়স পাঁচ বছরের বেশী হতে হবে। আবার ছোটাছুটি সুরু করলেন। স্কুল ও ব্যাংকশাল কোর্টের হলফনামার নকল নিয়ে কর্পোরেশন অফিসে হাজির হলেন। আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই বার্থ সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন। মেয়ের ভর্তির আর সমস্যা হইল না। ঘটনাক্রমে একজনের দুবার দুরকমের সার্টিফিকেট পাওয়া গেল প্রায় একদিনের ব্যবধানে। অথচ কেহ কোন কোর্টে আইনের অমর্যাদা করেন নি!

মেয়েটির পিতা, আমরা জানি, একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন অফিসার। পাওনাদারের প্রাপ্য সহজেই মিটিয়ে দেন। বাড়ী ভাড়া, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, ইলেক্ট্রিক লাইসেন্স ইত্যাদি যথারীতি দিয়ে যাবেন। অফিসের কাজে টুরে গেলে যাওয়ার খরচের পাই-পয়সার হিসাব পেশ করেন। সঙ্গে থাকে বেল ভাসবেরো ও অন্যান্য ঘড়ি। পাকা অডিটরও কোন গলদ ধরতে পারেনা। ওপরওয়ালা খুশি হয়ে বলেন, তোমার খরচের হাত বড় ভাল!

বয়স কমানো ও বাড়ানোর কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক সহকর্মীর কাছে শোনা কাহিনী। সদাহাস্যময়ী এক অফিসে ছেলে অবসর গ্রহণ করে গেলেও বাবা চাকরী করে যান কয়েক বছর। বাবা যখন কাজে ঢুকেছিলেন তখন সাহেবের মুখের কথাই আইন। ছেলের বেলায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল করার বেওয়াজ চালু ছিল। তাই সঠিক বয়স লেখানো হল। ছেলের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা সভায় বাবা একটু বিব্রত হয়েছিলেন। তবে সেটা সাময়িক। যারা চাকুরী করছেন আর ছোটকাই অবসর নিয়েছেন এ আমাদের জানা ঘটনা। এরা সবাই ছেলেদিগকে দিয়ে লাভবান করেন এবং প্রচলিত আইন মেনে চলেন।

বয়স বিকল্প করার জন্য অনেক দেশে ইস্কুলে ছোট্ট রেখাঙ্কন প্রথা আছে। পাঁচ-দশটাকা দিয়ে প্রয়োজনমত কালীঘাট থেকে ছোট্ট সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। শুধু আপনার বয়সটি করতে হবে যে কত বয়স হলে সবদিকে সুবিধা। আইনত এতে কোন বাধা নেই।

কনিষ্ঠা কালিকার বিয়ে উপলক্ষে যেদ কয়েকদিনের ছুটির দরকার হয় আমাদের পরিচিত এক বন্ধুর। একদম ছুটি পাওনা নেই। বন্ধুটি বয়স বাড়াতে মন স্থাপন পেয়েছিলেন সরকারী ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে। মোটা ফি-র বিনিময়ে ডাক্তারবাবু লিখে দিলেন যে অন্তত দু সপ্তাহের পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। ইতিপূর্বে হাত ফ্রেসারের সোলবাদের জন্য ছুটির সুপারিশের নজির ছিল। এদিকে ছুটি মঞ্জুর করার মালিক অফিসের বড়কর্তা যথারীতি বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। এঁরা কেবল আইন মেনেই চলেন না, সামাজিক সৌজন্যবোধ সম্পর্কেও সচেতন।

বাস্তবের দেখাদেখি, অনেক অফিস-আদালত ফুল-ফলের শিওন-বেয়ারারা

ছুটি বেড়ানোর কৌশল শিখেছে। কলম কাটার বয়সেও প্রায় অনেক ভুলভ্রান্তি শেষ হয়। সঙ্গে থাকে বিহার, উত্তর প্রদেশ অথবা ওড়িশার কোন গ্রাম থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম : "মাদার সিরিয়াসলি ইল কাম হোম।" এই জ্বালাময়ী দাবী কোন স্নেহ অভিসের বড়বাবুর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না।

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের ছুটির মধ্যে কোন স্বজনের মৃত্যুসংবাদ বিশেষ সহজ করার ব্যবস্থা আছে। যাত্রা করার আগে ট্রেনের টিকিট যেখানেই ভাড়ার টাকা পাওয়া যায়। টাকাটা নিয়ে যদি কেউ টিকিট কেনার লম্বা কিউ-এ দাঁড়ায় তাহলে সামান্য আর্থিক লোকসান হয় কিন্তু বে-আইনী হয় না।

যোগার বাড়ীতে যাবার আগে আমি যদি পাঞ্জাবীর পকেট না ঝেড়ে থাকি সে ভুল আমার। পকেটে থাকা লটারীর টিকিট নিয়ে খোঁজা যদি পুরস্কারের দাবী করে তাহলে আবার আপশোষ হতে পারে কিন্তু তার কাজটা মোটেই বে-আইনী নয়।

ধরুন, আপনার নামে বেয়ারার চেকটা হঠাৎ আমার হাতে পড়ল। আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে জেনে চেকটা ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে নিলাম। এতে আপনি অসন্তুষ্ট হলে আমি নাচার। কারণ আমি ত আইন ভঙ্গ করি নি।

আমার ছদ্মবেশে যেতে থাকায় আমার ছেলে বলেছে বিনামিটে ক্লাস করতে পারে নি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কেরানীদের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সারা বছরের ক্লাসের উপস্থিতি সম্পর্কে সে যদি গোপন ব্যবস্থা করে আইনসঙ্গতভাবে তাহলে কি আমি নিশ্চিন্ত হই না?

অবাধ বয়সে দেখে। আমাদের আর যদি ফেরেন্সবাবুর মত সর্বকারের হওয়া চলে না। বিমানের যাত্রার পথে একজন ফেরতাবীর আচরণে উনি কেমন খুব হয়েছিলেন সে কাহিনী আমরা পড়েছি। বোলপুর থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অমৃতসরের দিকে ছুটছে হয়। ফোন একটা বড় রেলের গাড়ি পেয়েছে। টিকিট চেকার তাঁর কামরায় উঠে টিকিট দেখতে চাইল। ফেরি দু জনের দুটো টিকিট দেখালেন। একটা পুরো আর একটা আধেক। কবির বয়স তখনও বারো বছর পূর্ণ হয় নি, তাই হাফ-টিকিট কাটা হয়েছিল। বয়সের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে বেশ বড় মনে হত। টিকিট চেকারের সেই ধরণের সন্দেহ হলেও কাটা ফলের যাত্রীকে কিছু বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না। তিনি নেমে গিয়ে আর একজনকে সঙ্গে করে আনলেন। ফিটার সাহেবটি খুব কাঁচুমাচু হয়ে মেমে গেলেন।


বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায়
এবং
অনুরাগী ক্রেতা সাধারণের স্বার্থে
"তন্তুশ্রী"

কম দামে সেরা গুণমান, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী সকল রকম
রেশম ও তাঁত বস্ত্রের বিচিত্র সমারোহ
'তন্তুশ্রী'র সম্ভারে আপনার পূজোর দিনগুলোকে রঙীন করে তুলুন
বিক্রয় কেন্দ্র :—কলিকাতা, নয়াদিল্লী ও অন্যত্র
ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )
৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩
ফোন নং : ২৭-২২৫০ এবং ২৭-২২৫১

এরপর এলেন আর একজন, বোধহয় ট্রেনের যাত্রীর বিষেই। ইনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের বেশী না? মহর্ষি জবাব দিলেন না। কর্মচারীটির বোধহয় বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন, এই ছেলের পুরো ভাড়া লাগবে। দেবেন্দ্রনাথ তখনই বাক্স খুলে থলি থেকে নোট বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তারপর কর্মচারীটি যখন ভাড়ার টাকা দিয়ে বাকী টাকা ফেরত দিলেন তখন তিনি সে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন প্লাটফর্মে। তিনি যে অতোগুলো টাকা বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলায় মানুষ বলে রেলকর্মচারীটি বোধহয় এতক্ষণে তা বুঝতে পেরেছিল।

একটি বড় কারখানার ম্যানেজমেন্টের পক্ষে প্রাই এক যুবক সুপারিশের জন্য এসেছিল। নিয়োগকর্তা আমাদের বিশেষ স্নেহভাজন এ সংবাদ সে রাখত। প্রার্থী হয়ে ওকালতী করতে গিয়ে জানা গেল যে দরখাস্তের তারিখ পার হয়ে গেছে। বেআইনী কিছু না করে ছেলেটির যাতে চাকুরী হয় সেই অনুরোধ করে এসেছিলাম। পরে জেনেছিলাম যে চাকুরীটা পেয়েছিল সেই যুবক এবং গল্প-কাহিনী কিছু হয়নি। দরখাস্তে কোন তারিখের উল্লেখ ছিল না। আগের তারিখ বসিয়ে দিতে নিয়মরক্ষা হল। সকলেরই মান বজায় রইল।

ট্রাম অথবা ট্রেনের দিনের টিকিটে অনেক সময় ছাপা থাকে "নট-ট্রান্সফারেবল"। তাই বলে কি যার যাবে টিকিট তিনিই একমাত্র ব্যবহারের সুযোগ নেবেন এটা কি এই যুগোপযোগী ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত?

ইন্টারভিউ-বোর্ডের ব্যাপারে সব সময়ই কি প্রতিদিন ঘাটে যেতে পারেন? তাঁদের রেজিস্টার্ড কার্ড নিয়ে পাড়ার বন্ধু-বান্ধবরা কেউ যদি মাঝে মাঝে দেখা করার আনন্দ দান তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা হওয়া উচিত নয়। দামে কার্ড আছে কিনা সেটাই প্রধান বিচার্য। বিনা কার্ডে ঘাটে প্রবেশ করা বে-আইনী নয়?

কোন বিপত্তি না হলে এ ব্যাপারে আমাদের মনে হয় কোন আপত্তি নেই। সম্প্রতি এক বিমান দুর্ঘটনায় এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে নতুন চিন্তা এসেছে। হয়ত কোন দুর্ঘটনাও ঘেরিয়ে যাবে একদিন। রাম-বাবু টিকিট কেটেছিলেন বোম্বাই যাবেন বলে। শেষ মুহূর্তে যাওয়া হয়নি। ওঁর টিকিট নিয়ে শ্যামবাবু রওয়ানা হলেন। পথে দুর্ঘটনায় বিমানটি ক্রাশ হয়ে গেল। শ্যামবাবু এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন নিয়তির জোরে। কিন্তু শ্যামবাবুর আত্মীয়স্বজন কি ক্ষতিপূরণ পাবেন? তিনি ত আরেকজনের নাম ঠিকানা দেখিয়ে টিকিট নিয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে আমরা কি দেখি নি কিভাবে জমির উচ্চসীমার আইনের ফাঁক আবিষ্কার করেছেন বড় বড় জমির মালিকরা? বাড়ীর পাচক, গরুর রাখাল, এমন কি দেবতার নামে জমি রয়েছে। যদি আইনের প্রয়োগে এটা বোঝা যায় যে ভাগ বিক্রয় বা দানিকরা ফাঁকী মাত্র।

জমিদারী সেরেস্তায় ছয় টাকা মাইনের গোমস্তা অনায়াসে দুশো আড়াই শো বিঘা জমির মালিক হয়ে যান এমন আমরা জানি। বাকি বাজনার যারে চাষীর জমি বীমার ছলে নিজের পরিবারের লোকের বেনামে ভেস্টে নিজের এই সব গোমস্তারা। এঁদের উত্তরাধিকারীরা আজকে শহরে চাকুরী করেন। মোনাদ ও মাইনে বাড়ানোর আন্দোলনে মদত দেন। আর গ্রামের বর্গাদারা যাতে তাঁদের ভে-ভাগার বাবে "হুতভাগা" না করেন সেজন্য ফসল কাটার সময় হাজির থাকেন। ন্যায্য পাওনা কোন দিকেই ছাড়া ঠিক নয়, কি বলেন?

সর্বভারতীয় একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা সম্প্রতি "আইন মাফিক কাজ" করার আন্দোলন করেন। সেই সময় বণিক সভার প্রতিনিধিরা হৈ হৈ করে প্রচার করলেন যে এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ও সরকারী কাজকর্ম একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। যে সব সেক্টারা কর্মীদের নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করার উপদেশ দেন তাঁরা "ওয়ার্ক টু রুল" আন্দোলনকে মদত দিতে চান না কেন? তাঁরা কি ভুলে যান যে, যে ইমারজেন্সী জারী করা নিয়ে এত লোমহর্ষণ সেই আদেশও হয়েছিল সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই? আমরা আইন মানছি, মানব।

# প্রভুজী অন্ধ ও চক্ষুষ্মান

## চিত্ত ঘোষাল

প্রফুল্লীর বন্ধুপ্রীতি এমনিতে ছিল তেমনতেই-ভোলা তিনটি উপাধানের অবলম্বনে।

আশ্রমের সর্বত্র, এমন কি প্রফুল্লীর এই চিত্রাঙ্কনকেত্রে, মনোময় সর্বদা অবাঞ্ছিত-থাকে। প্রফুল্লীর যে কল্পনা কলাহাত্র লাভে বড় হয় বহুজন, তাই-ই প্রাত্যহিকতার মতো ধ্বনিত হয় যে কতিপয় তালাবানের ঘিরে, মনোময় তাদেরই অন্যতম। বলা বাহুল্য মনোময় বিত্তবান, খ্যাতিমান। সে এলাকের এক খ্যাতকীর্তি লেখক।

মনোময়ের প্রায় পাঁচাত প্রতিপাতের উত্তরে প্রফুল্লীর নয়নযুগ নিমীলিত হল, ওষ্ঠদ্বয় নিঃশব্দে কিছু উচ্চারণ করল। আশীর্বাদরত মনোময় আসন গ্রহণ করল প্রফুল্লীর পদপ্রান্তে—চরণ ছুঁয়ে।

—এত শীঘ্র আবার তোমাকে দেখতে পাব আশা করিনি মনোময়। কলকাতা তো খুব কাছে নয়।

প্রফুল্লীর স্নিগ্ধ মৃদু উচ্চারণে মুহূর্তে যেন উচাটন চিত্ত কিছু শান্ত হল মনোময়ের।

—প্রফুল্লী, আমি বড় ক্লান্ত, বড় যন্ত্রণা আমার।

—কেন মনোময়? এই তো সংবাদ-পত্রে দেখলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার সুরভী-মোহন পুরস্কার এবার তোমাকেই দেয়া হচ্ছে। তোমার মতো অল্প বয়সে কোনো লেখক আজ পর্যন্ত এই পুরস্কার পায়নি। তোমার পুলক লাগা উচিত মনোময়?

—তা প্রায় ন' মুহূর্ত প্রফুল্লী।

—তার মধ্যে ক'টি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে?

—তুমি-একটি বোধ হয়।

—পরশ্চন্দ্র সারা জীবনে তোমার এক-চতুর্থাংশ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তোমার তুলনা অবশ্যই অর্জন করার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তবে কেন তুমি কষ্ট পাও মনোময়?

—প্রফুল্লী, ওরা বলে আমার লেখা নাকি আদৌ লেখা নয়, লেখার চাকরি। আমি নাকি রাশি রাশি বিদ্যে কথা লিখে যাচ্ছি, বুদ্ধি বুদ্ধি বানানো গল্প, বানানো মানুষ···। হঠাৎ থেমে গেল মনোময়।

—মনোময়, তোমার নিজের কি মনে হয়? প্রফুল্লী ধীরে প্রশ্ন করলেন।

—আমি না, জানি না প্রফুল্লী, ওরা বলে আমি সমাজ বুঝি না, রাজনীতি বুঝি না, মানুষ বুঝি না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ঠিকই বলছে। নইলে এত লিখেও কেন মানুষের আসন হতে পারলাম না। এমন কি আমার স্ত্রী···

প্রফুল্লী মনোময়ের দুহাতের হাত তুলে নিয়ত হতে আদেশ দিলেন মনোময়কে।

—শান্ত হও মনোময়, তুমি শিল্পী, তুমি দ্রষ্টা, একে সীমাবদ্ধ রাখা কি তোমার পক্ষে সম্ভব না স্বাভাবিক। তোমার স্ত্রী মূঢ় মহিলা, সে বিশ্বলীলার সূক্ষ্ম তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। ইচ্ছা হলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর।

—বড় ঘাই প্রফুল্লী, খ্যাতি বলে আমার অন্য অধিকার নিয়ে যাওয়া বড় কষ্ট। বাধা হয়ে মনস্থির করি···

—তবে কই কি মনোময়, তুমি দ্রষ্টা, গগন প্রেমের অধিকার তোমারই আছে। তবে দেখো মহত্ত্বের যাতে ক্ষতি না হয়।

—প্রফুল্লী, একটি নিবেদন ছিল।

—বল মনোময়।

—সুরভীমোহন পুরস্কারের অর্থের টাকা আমি আশ্রমে দান করতে চাই। আপনি গ্রহণ করবেন তো প্রফুল্লী?

—বহুৎ উত্তমে দানকর্ম থেকে কি আমি তোমাকে বিরত করতে পারি! সে অধিকার কি আমার আছে। তুমি আরো লেখো মনোময়, লিখে যাও।

—প্রফুল্লী, ওরা বলে

বাধা দিয়ে প্রফুল্লী বললেন—আচ্ছা মনোময়, বারংবার এই 'ওরা' শব্দটি দ্বারা তুমি কাদের বোঝাতে চাইছ?

মনোময় নিঃশব্দে মুখ নত করল মনে মনে তো, ওরা কারা? তার বইয়ের প্রকাশকের অভাব নেই, নিশ্চয়ই তার বই বিক্রি হয়, নইলে প্রকাশক এত টাকা তাকে দেয় কেন? কেন সুরভীমোহন পুরস্কারের মতো মূল্যবান পুরস্কার দেয়া হয় তাকে? এ কথা ঠিক যে বিশ্ব ও প্রভাবশালী বিরাট এক চক্রের সমর্থন রয়েছে তার পেছনে। কিন্তু সেটাই কি সব? তার নিজের কি কিছুই নেই? আছে, আছে, না থাকলে এত অর্থ খ্যাতি সম্মান সে পায় কি করে? আবার খটকা লাগে মনোময়ের। অর্থটা বাস্তব। কিন্তু খ্যাতি সম্মান? শুনতে যেন সাজানো বানানো মনে মনে হয়। যেন তার পাওনা নয়, কিন্তু ব্যবসায়ীরা এসব জিনিসগুলো দিয়ে তাকে সাজিয়ে রেখেছে নিজেদেরই স্বার্থে—সো-কেসে ভরি, ঘরের বাসন, প্লাস্টিকের ফুলদানী দিয়ে সাজিয়ে রেখে যাদের বিক্রি বাড়াতে চায় দোকানী।

আর 'ওরা'? ওরাও যেন আছে বলে মনে হয় মনোময়ের। ওরা কারা? বহু মানুষের ছায়াময় উপস্থিতি যেন অনুভব করে মনোময়, যারা তাকে ঘোরোহিব আপন বলে মনে করে নি, করবে না। অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে মনোময়, জেগে জেগেই, ওরা যেন সংখ্যায় কোটি কোটি—অথবা, আর পাঁচটি সাতটি হলেই কি পঞ্চাশটি স্ফীতকায় হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষ তাকে এই কোটি কোটি মানুষের মাথায় মাথায় পা ফেলে ফেলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে···

উদ্‌ভ্রান্ত দুই চোখ মেলে প্রফুল্লীর দিকে তাকাল মনোময়।

—প্রফুল্লী, ওরা বলে আমি লেখক নই, লেখার চাকরি করি।

—মনোময়, একটু আগেও এই কথাটাই তুমি বলেছ। ওরা যে-ই হোক, ওরা ঠিক বলে না। সবার লেখা কি এক? সবার বলা কি ঠিক?

—কিন্তু আমার যে বড় ভয় হয় প্রফুল্লী। ওরা···ওরা বলে, আপনাকে আমি যে রচনা উৎসর্গ করেছি সেটাও নাকি চুরানো মাল।

—বলে বুঝি, প্রফুল্লী স্নিগ্ধ হাসলেন, লেখার চোখ আছে সেই মনোময়। আমি তো ঐ গ্রন্থে লেখেছি শিবানীজায়ই প্রকাশ।

তুমিও নিশ্চয় সে কথাই লেখতে চেয়েছ।

হ্যাঁ···তা···বা···হ্যাঁ···মানে···। ইতস্তত করতে লাগল মনোময়।

—স্বাভাবিক, স্বাভাবিক, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ মহলের রায় না জানাই তো যথার্থ শিল্পীর লক্ষণ। নিজের মহত্তার চেয়ে গুরুতর আর নেই। বেশ, বেশ।···আচ্ছা মনোময়, ছুটে ছুটে বার বার তুমি আমার কাছে আস কেন?

নিজের কাজগুলো যখন নিজের কাছেই একেবারে অর্থহীন মনে হতে থাকে, আপনার কাছে সবই স্বীকার করা যায়, মন বাস্তবিক কিছুতেই হতাশার দুর্গ হতে চায় না,

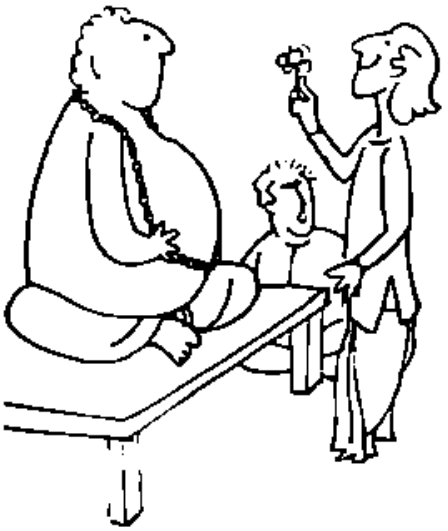

তখনই আপনার কাছে চলে আসি। আমার কাজের অর্থ তাৎপর্য আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দেন···

—তাহলে আজই তোমার নিজেকে দেখার চোখ, কি বল! প্রফুল্লীর মৃদু হাসে মুখ ভরে গেল।

বৈরিকথারী এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বার-প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

—কি ভাই হরিহর? প্রফুল্লী বললেন।

—কায়স্থের সেই লোকটি আবার এসেছে প্রফুল্লী। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য হাতে-পায়ে ধরাধরি করছে। বলছে কোন্ সাপ্তাহিক কাগজে চাকরি করে, আপনার একটা ছোট ইন্টারভিউ···

—আচ্ছা, আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

একটি সাধারণ-দর্শন যুবক ঘরে প্রবেশ করে কৃতার্থমন্যতায় প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

প্রফুল্লী বললেন—বসো।

যুবক আসন গ্রহণ করল। মনোময় লক্ষ্য করল যুবকটির চোখ দু'টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কৌতূহলোজ্জ্বল।

—বল, কি চাও। প্রফুল্লী বললেন।

—আমি সাপ্তাহিক বঙ্গ পত্রিকার একজন সাংবাদিক। আপনার দৈবী ক্ষমতার কথা দেশের ঘরে ঘরে, আমি সে সম্পর্কে কিছু, মানে, বলতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না···

—বুঝিছ বন্ধু কেন, প্রফুল্লীর প্রেরণায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হল যুবকের যুবের ওপর, প্রমাণ চাও, এই তো? বেশ—

প্রফুল্লী দক্ষিণহস্ত পুড়ে তুলে ঈষৎ আন্দোলিত করলেন, আবির্ভূত হল একটি চন্দনচর্চিত ফুল।

—নাও, যাও। প্রফুল্লী যুবককে বললেন।

আমীরার দু'টি অমর হাতে এখন করে যুবক প্রকৃতীর অস্থান করিতে যুক্ত হাত বোলান। সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ রক্ত-গোলাপ দেখা দিল তার হাতে। প্রকৃতীর পায়ের কাছে গোলাপগুচ্ছ রেখে যুবক প্রণাম করল।

প্রকৃতী অপলক তাকিয়ে রইলেন যুবকের দিকে। মনোহর লজ্জা ভরা প্রকৃতীর চোখে চোখ রেখে যুবকও স্থির।

এভাবে কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার পর প্রকৃতী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—এর অর্থ কি?

—যথার্থই। অস্ফুট যুবকের উত্তর।

—এর পরিণাম সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? প্রকৃতীর প্রশ্ন।

—আছে। যুবক পূর্ববৎ দৃঢ় অকম্পিত।

প্রকৃতীর মাথে হঠাৎ তাঁর ক্রোধের উপাদানের দেখতে পেল। বাইরে কোথাও সিঙা শব্দ ট্টাং করে উঠল। মুহূর্তমধ্যে ঘরে সেনাধ্যক্ষী দুই বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রবেশ।

প্রকৃতী তাদের বললেন—এই লোকটিকে আমাদের বহির্দ্বার দেখিয়ে দাও।

দুই সেনাধ্যক্ষীর সঙ্গে যুবক বেরিয়ে গেল ধীর বেগে।

কিছুক্ষণের অখণ্ডিত নীরবতা।

মনোহর লজ্জা ভরা প্রকৃতীর মুখে যে রক্তবর্ণের ছায়া পড়েছিল তা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক প্রেমময় দীপ্তি।

প্রকৃতী সহাস্যে বললেন—দীপায়নের কি অদ্ভুত লীলা দেখ মনোহর, হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেল। একটু আগেই আমরা দেবার চোখ দিয়ে আলোচনা করছিলাম না?

—হ্যাঁ, প্রকৃতী।

—এই যে ছেলেটি এখানে যা করল তা দেখাতেই মানিক—তাই। আর আমি এখন যা দেখালাম তা শ্রেণী কল্পনাই বলা যায়। কিন্তু ও কি তা বুঝবে, ও যে অজ্ঞ। ও মনে করেছে দু'টোই এক। কিন্তু এ ভুল তো তুমি কর না, তুমি চক্ষুষ্মান, তাই তুমি এত বড় হতে পেরেছ, আর ঐ মূঢ় কোন্ ক্ষমাতিক্ষুদ্র পরিজন সাংসারিক হয়ে বিবাহিতার মতো যাচ্ছে।

অকস্মাৎ প্রকাশ্যে মনোহরের মুখের মধ্যে ভক্তভক করে উঠল। ভক্তিভাবের চক্ষু বাহন ছুঁয়ে গেল।

# আবার হিমালয় ঃ এবার কুয়ারীর পথে

## অরুণ ঘোষ

অনুভূতিগুলি দুরন্তগতিতে ছাড়া পেয়ে হাওয়ার মত দুর্গমের পথে ছুটে বেড়ায়। বার বার মরতে মরতে সুদূর পাহাড়ের পথ বেয়ে ওঠে। বার বার মরতে মরতে আকাশ পাহাড়ের ডানা মেলতে থাকে। বার বার মরতে মরতে হিমশিখর হিমালয়ে পথ বের করে চোখে। এ যাওয়া ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে সম্বিতে। হিমালয়ের কুহেলিকা কি আমি কেন আমারও টানে।

আমার শক্তিকে সঞ্চালিত করি। চলে যাই হিমালয়ে। পনেরো শত মাইলের ব্যাপ্তি নিয়েবহমান বিস্তৃত হিমালয়ের কতটুকু দেখবো? আমার ওজনের পথে পা বাড়ালুম। হিমালয়ের গহনে ক্ষুদ্র গ্রাম। লতাপাতা এঁকেবেঁকে ওঠানির ঘেরাটোপে সংরক্ষিত কিছু প্রাণের দাড়া জাগানো ঐ গ্রাম। যেন স্বেচ্ছা নির্বাসন।

এখানের গন্তব্য কুয়ারী পিঠিয়ার। খবর নিয়ে জেনেছি, সুদীর্ঘ এ পথের টিকানা। একে একে অনেক গ্রাম, অনেক পিঠিপিঠা, অনেক পর্বত প্রাকার, তারপর চূড়া থেকে চূড়ায় আমাদের কুয়ারীর তীর্থ পরিক্রমা। গ্রামে ভয়ও আছে, আমার ঐ তীর্থযাত্রার অনির্বচনীয় আকাঙ্ক্ষাকেও রোখা যাচ্ছে না। সর্বাগ্রে মাথু সিং ওর পাহাড় চড়ার আন্তিক জোর নিয়েই আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা চলতে থাকি। ও পথ দেখায়। আর চলতে চলতে হিমালয়ের বিরাটের বৃহত্তের অনুমান করি।

কুকীনা খাল পেরিয়ে জমোল থেকে সুতোল হয়ে পাইয়ারীগাঁওয়ের পথে দুধারেচ্ছের পর্বত প্রাকার। আকাশের আভাস দূরে রেখে কেবল মনে হচ্ছিল, ঠিক এটাকেই ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা জোগায়। আমার ভাবি আমার মধ্যে এই চঞ্চলতাই বা কেন? ভয়ের এই সমুদ্র তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়েই থাকি না।

আমার পইয়ারীগাঁও থেকে দারতোলির পথে দেখেছি, ডাহিনে ধারে, দূরের রেখাঙ্কিত সুনীল পর্বত শ্রেণী। কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে ঘন ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য। সেখানে অরণ্যে একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে পাতাঝরা, ফলহারা। অত্যাশ্চর্য বিবর্ণ শোভা। দূরে বহুদূরে দেখেছি রশারি বিস্তৃত মত দীর্ঘ পথ এঁকেবেঁকে রায়নী, বিস্তৃত বিহারী তালকে পাশ কাটিয়ে অরণ্যে উধাও হয়েছে। আরো দেখেছি মন্দাকিনী, অলকনন্দা, ধৌলি, বিরহী বিহারী নদীকে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী ঝোরঝুরে, ফেনিয়ে ফুলে, নেচে কুদরত করে পাথরগুলোকে সরাস দিয়ে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছে। পড়ন্তবেলার হরিণ শিশুর মতই এরা আমাদের সহচর। চলেছে। হঠাৎ দক্ষিণ থেকে বাঁয়ে এসে এক অজানা সংকীর্ণ সৈকতপথে অন্তর্হিত হয়—একবার দক্ষিণে, একবার বাঁয়ে, একবার অন্তরালে। বিচিত্র কৌতুকচারী। আবার হয়তো চলতে চলতে কোন এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

ইতিমধ্যে পাঁচদিন ক্রমাগত হাঁটা হল। কখনো নিঃসীম ধারে, আবার কখনো উঠেছি গিরিশীর্ষে। যেন নিরবধিকাল এই চলা। ক্লান্তি ছেয়েছে সর্বাঙ্গে। মনে হয় লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি কোন অতীতে। পায়তোলি ছুঁয়েছি। উপযুক্ত আস্তানা বেছে ছাউনি পড়বে। পরম আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম। চারদিকে ঘন অরণ্যানী ছেয়ে আছে। কেমন একটা ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। পায়তোলির এ আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। বাতাসে হাত ঠেকে ফেলে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা। আকাশের দিকে

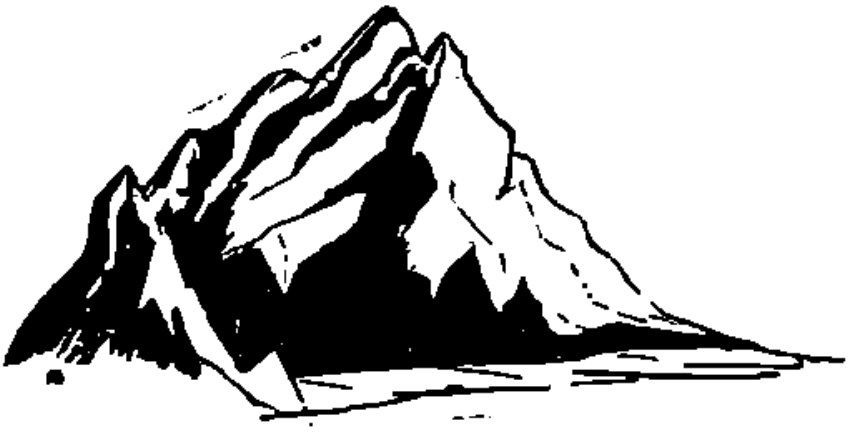

আবিষ্কার করি যেখানে যেন ধরিত্রী হয়ে উঠেছে। যেন তাদের আওয়াজ নেই। মনের যা থাকে তপাশে। আমি মনে মনে প্রণাম করি। ভাবছি এই বিকট-দুর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে দুয়ারীর পরীর স্পর্শ করা যাবে তো?

চারদিক নিস্তব্ধ। অথবা একটুখানি বিক্ষোভ, একটু যেন নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ। ছায়াঘিরিড় অথবার পথগুলি যেমন শির শির ঝির ঝির কাঁপা কাঁপা বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন। এখন দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে। ছাউনি ফেলার অবকাশে কিছু খাদ্য খেয়ে নিয়েছি। শরীরে ক্রমাগত উত্তাপ চাই। এবারে ওঁবুর ভেতর ঢুকে ঘুমোবার চেষ্টা করতুম। ঘড়িতেদেখলুম আনলুম এখন সবে সন্ধ্যে ছ'টা। বাইরে ক্রমাগত জলবাতাসের গর্জন আমার মনে অসহায় ও করুণ অনিশ্চয়তার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। আমার ঘুমের সঙ্গে আমরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকে। ঘুমোচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি না। এদিকে বাতাস তেমনি শব্দময়। ওঁবুর শিখরের একটুখানি ফাঁক করে দেখি মেঘগুলি জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লেগেছে। রাতভর ঝড়োবৃষ্টি। এমনি করেই সকাল হয়। বৃষ্টি ধরেছে। শীত শীত ভোর। কুয়াশা কুয়াশা উত্তাপ। আবার চলার শুরু। এবারে দুয়ারীর দেখা মিলবে। নিয়তরহাটা চলবে।

রাস্তা বলতে এখন আর কিছু নেই। পথ ভয়াবহ, বিকট ও দুর্গম। বেয়ে বেয়ে উঠছি। বসে বসে হাঁটছি। পরীর শির শির করে। জাকোয়ারী পেরিয়ে গেলুম। এখান থেকেই বুনিয়াল শুরু। পাহাড়ি খাঁজে বিশ্রামরত ভেড়ার পাল। চড়ে বেড়ানোর অপেক্ষায় সময় গোণে। খোকা খোকা কুয়াশা ভেঙে ভেঙে চৌচির হয়ে আকাশে উঠে চলে। ভেসে ভেসে যায়, পাতা, অরণ্যময়। গাড়োয়ালী রাখাল ছিপছিপে হাউনির আড়ালে। হয়তো ঘুমোয় নয়তো আগুন পোহায়। আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এগিয়ে চলি। এবারে শেষ চড়াই বেয়ে ওঠা। পরে পরে অধিরোহণ প্রহর গোণা। সম্মুখে এক রাখাল চলে। দীর্ঘ পোশাক, মাথায় টুপি। সে যাবে পাটোয়ারীধাও। কোল ঘুরে এক নিটোল ভেড়া পাবক। ওর বোঝার ওপর বোঝা। আমি চলি পাটোয়ারীধাও—সে তো অনেকদূর। ও বলে, সাব—এ আমাদের নিত্য যাওয়া আসা। কোলের ভেড়াপাবকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি—এটাকে কোথায় নিয়ে চলেছো। একটু হেসে জবাব দেয়—বলছট হয়ে বিপাশা বুনিয়ালে দিশেহারা ছিল—তাবলুম সেয় খেয়ে ফেলবে, তাই নিয়ে চলেছি। ভেড়ায় বল হলে ছেড়ে দেবো। আমি ভাবি—এ পথে যেন জন্তুপাখির বিচিত্র আনা যাওয়া—এদের চোখে বিচিত্র ভালোবাসা। এ ভালবাসা কত বিরল। এমনি ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে কখন দুয়ারী ছুঁয়ে ফেলি। আমার বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে সুবিশাল তৃণভূমি, তুষারাবৃত পর্বতমালি নীরবে নিভৃতে যেন করুণ আহ্বান বিস্তৃতি করছে। আমি বার বার নতজানু হয়ে যাই। প্রকৃতির মহত্ব বুঝি এই নির্জন অরণ্যহীন হিমগিরি, কঠিন পাহাড়ের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। এ যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে এসেছি। আত্মিক ধ্যান ধারণা, সবকিছুর মূল্যবোধ একমুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে মনে অদ্ভুত এক ভাব আসে। মন এখন কত ধীর, কত স্থির কত শান্ত। বুনিয়ালের সব কিছুই মহান। তাই মর্ত্যের মানুষের কাছে ওর আচরণের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি ঠেকে। যেমন সবুজে সবুজে ছয়লাপ, তেমনি তার মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা। যেমন যোজন ব্যাপী বিস্তারিত প্রস্তরময়তা, তেমনই আবার শিরশিরে হাওয়ার ঝলকানি। সবই চলা হয়ে কথা বলে যায়। এ বুনিয়াল কত ঘাস কত প্রপাত—তাঁর ঐশ্বর্যের ভাষা বুঝতে বুঝতে ধরিত্রী তুষারে একাকার হয়।

অপরূপ শীত, বরফ ছোঁয়া হাওয়ার কাঁপন, দিগন্তে নিথর শুভ্র পর্বতমালি, নিসর্গ প্রকৃতির অবয়বহীনতে এক অতীন্দ্রিয় পুলক আমার। নিত্য চেনা সুখ দুঃখের বাইরে এক পরম উপলব্ধির জগৎ এ নির্জনতাও যাদের হয়ে ওঠে। নীরবতা যে কত বাঙ্ময় হতে পারে অনুভব করি।

বুনিয়াল শব্দটা মনে মায়া ফেলে। যারা বুনিয়াল দেখেছে তাদের কাছে ঐ শব্দটা স্মৃতির মূর্ছনা হয়ে তিরতির করে মনকে ছুঁইয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হিমালয় গিরিশিরে। যে উচ্চতায় মানুষ বাস করেনা। ওর অবস্থানটা যেন অনেকটা কৈলাস মানস সরোবরের কাছে মুক্তোদানোর সমুদ্র চূড়া পাওয়ার মতোই। হিমালয়ের চূড়া যদি হয় মস্তকের মুকুটমণি তাহলে বুনিয়াল হবে বক্ষদেশে শোভিত পান্না সমুদ্র মতোই। হিমালয়ের পাদদেশে, সমতলের পথে বৈদিনী বুনিয়ালের বিস্ময়কর রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, সমুদ্র জাগিয়েছিল। এবারে দুয়ারী গিরিশিরের সুমহান বুনিয়াল আমায় মায়ায় বাঁধলো। বুনিয়ালের মায়া এখানে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে। আর কত নামে এই বুনিয়াল চিহ্নিত। এ পথে আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে থাকে বৈদিনী বুনিয়াল, আলি বুনিয়াল, ঘুনা বুনিয়াল। আরও কতশত রয়েছে আমার গোচরের বাইরে যার না জানা। প্রতিটি লোকের মুখে বুনিয়ালের মাহাত্ম্য ধ্বনিত। তাই যখন

পদ্মার স্বামী ( ওরা বলে বরষ ) বুনিয়াল থেকে ভেড়া চড়িয়ে ফেরে পদ্মা গোধূলির উষৎ আলোয় সবার চোখ এড়িয়ে সবাকের আড়াল থেকে সুর করে কবিতার ভাষায় একটু হেয়ালি করেই বলে—

বুনিয়াল কি বুনি
খাবি ভেড়ি কুলবুড়িয়া
মিছি ফেলে ভরি।

"ওরে আমার বাপরে—দেখেছি তোমার চোখের ওটাকে বুনিয়ালের তাজল খালের মতই লতেজ কিন্তু তোমার ছাতা ঠোঁট কেন শুকনো।" পদ্মার এ ধরণ বরষী কথায় বুনিয়াল ভাষা পায়। বুনিয়াল কবিতা হয়ে ওঠে। বুনিয়ালের খাল হয়ে ওঠে দুই প্রেমিক প্রেমিকার কথার উপকরণ। আমিও বসন্তের চোখের তারায় দেখেছিলাম সেই বুনিয়ালের লতেজ খালের মতই চলমান চঞ্চলতা। হাওয়ার বাপটায় লম্বাই আচল নাচন ভাব। এতদাল হেসে আমায় সপ্রতিভ নমস্কার জানিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাপু সিং পরিচয় করে দিয়ে বলেছিল বসন্ত এবার আমাদের পোর্টার হয়ে কুয়ারী পাস যাবে। বেশ পছন্দ হয়েছিল। সুন্দর লতেজ সপ্রতিভ গাড়োয়ালী ছেলে। বয়স সবে উনিশের কোঠায়। আর ওর ঠোঁট ভেজা শীতের হাপটে শুকনো হবেই।

এক নিবিড় উচ্চতায় এ বুনিয়ালগুলির অবস্থান। এর প্রয়োজনীয়তা ওদের কাছে ঈশ্বরের এক আশীর্বাদ বিশেষ। সমস্ত কুয়াশুদ্ধ গাড়োয়ালের পর্বত ভেদা দুর্গম গ্রাম ছাড়িয়ে এ বুনিয়ালের অবস্থান। এ উচ্চতায় অন্য গাছ পাওয়া যায় না। অরণ্যের জটিল জট ছাড়িয়ে শেষ মুক্তির আশ্বাস। বৈরাগ্যের হাতছানি। কুটিল জটিলতে বর্তে ফেলে রেখে একে একে সব ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে যাবার পালা। সুবহান নরুল প্রান্তর। এ নরুল ছাড়িয়ে আরও উচ্চে, আরও উচ্চে শুধু শুভ্র শান্ত শুভ্রতা। নরম মৃদু রঙ ছাড়িয়ে অপরূপ শুভ্রতায় বিলীন। পর্বতের সুবিশাল রূপ, ঘাঁর চূড়ায় তার পূর্ণতার বিকাশ।

দুরূহলঙ্ঘিত পার্বত্য মানুষের জটিল জীবন যাপনের প্রয়োজনে বুনিয়াল মানুষের কাছে ধরা দেয়। এ বুনিয়াল নিত্যদিনের উপকারে আসে তাই পার্বত্য গ্রামবাসী বুনিয়ালকে ভক্তি করে। শতাব্দীর রস পায় বলেই ভালবাসে। মনে পড়ে গত বছর বৈদিনী বুনিয়াল ছাড়িয়ে বক্সাধারোর পথে এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে হতবাক করেছিল। একটা ১ ১ বিশালতার মধ্যে দিয়ে আমরা পথ চলেছিলুম। যেদিকে তাকাই শুধু ধূধূ নীল আর কালোর মাখামাখি। ক্লান্তি ছিল চোখে শরীরে মনে। মাথার ওপর অনন্ত নীল। অদূরে বৃষ্টি বরফের ঝলমলানি। ঘুরে বয় ঘুরে নীচে পাহাড়ী ঢালুতে চোখ পড়তেই দেখেছিলুম একটা বিশাল ধাবাকী অ্যাবিস্ট্রাক্ট আকৃতি মনে চলে যান পরিবর্তন করছে। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। তাবি যাত্রাবিরতি প্রান্তিরে চোখে ধাঁধা লাগছে না তো? মনীষের ডেকে দেখাই। অবশেষে আমাদের গাইড মাথো সিংকেও ডেকে দেখিয়েছিলুম। ও ছেলে মনে উঠেছিল, ও কৌতুক কিছু নয়। বুনিয়ালের ভেড়ার পাল এগুলোকে চরে বেড়াচ্ছে। দূর গাঁয়ের হাজার হাজার ভেড়া এমনি করে হিমালয়ের বুনিয়ালগুলিতে চরে বেড়ায়, কুয়ারীর পথও বুনিয়ালের পথ। গাঁয়ের মানুষের বুনিয়াল এক বিরাট সম্পদ। ভেড়া একটি অর্থকরী দুরূহলঙ্ঘিত পশু। ভেড়া চরানোও একটি নিবিড় পেশা। বৎসরের প্রায় ছ মাস হাজার হাজার ভেড়াকে হিমালয় প্রকৃতি পর্যাপ্ত লতেজ ঘাসের যোগান দিয়ে প্রাণবাসীদের অন্নের ব্যবস্থা ভরিয়ে দেয়। উন্মুক্ত আকাশের সুবিশাল চরে বেড়িয়ে খায়ে ও লৌকর্যে নিটোল হয়ে শীতের বরফঘরে গাঁয়ে ফেরে এই ভেড়ার পাল। এই ভেড়া দেখেই খাল বহন করে। পশমী উলের যোগান দেয় আমার দরকার মত পুঁজে। পাবনে মানুষেরও যোগান দিয়ে থাকে।

আমার ওয়ান গ্রাম। এ গ্রাম পর্বত অভিযাত্রীর কাছে বিশিষ্ট। সুদূর গাঁয়ে হাঁটা পথে দুর্গম পর্বত মধ্যে ক্ষুদ্র এই গ্রাম। সাকুল্যে ৭ চালেক লোকের বাস। ছবি কাছে বিয়োজিত গ্রাম। প্রকৃতির অনুসারী।

সোনালবনে এসরাত থেকে পর্বত মধ্যে পায়ে হেঁটে যাত্রার প্রস্তুতির শেষ পর্যবেক্ষণের ভার অমিতের। তাই যাত্রার সরঞ্জাম, রেশন, আলানী তেল ইত্যাদির লটিক হিসেব করে ব্যাগ বন্দীকরে কুলিদের কাছে গঁপে দিয়ে তবে অমিতের রেহাই। আমি যাত্রার সময় গুনি। শীতের রেশে সকাল একটু ঘরে। ঘুমটে বেঁধে থাকা। এখন চা খেলে ভাল লাগতো। কিন্তু গরম চা আরও ঘন্টাখানেক পর মিলবে। একটু একটু করে রোদ উঠছে। সোনালবন পরিবেশটাও শরীরে উল্লাস রেখে জেগে উঠছে। পাহাড়ী সোতা দেখছি, মনোরম সোতা। দুপাশারে পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা চোখের সামনে মিথ্যা হয়েছিল। সূর্যদেবের আবির্ভাবে আকাশ পথে যাওয়া করেছে। দূরে বন দূরে নন্দাঘুন্টি ত্রিশূল এক ঝলক দেখা দিয়েই মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে বাপু সিংয়ের চেলার চা এসে গেছে। চা পান শেষে একটু বেশ ব্যস্ততা। কুলিরা একে একে মালপত্র তুলে নিয়েছে। যাত্রা শুরু। বাপু সিং আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলবে। এবারে যাত্রী আমরা দুজন, আমি ও অমিত। ১১৭৭ সনে উপযুক্ত যাত্রার আমরা ত্রিশূর সংখ্যার পাঁচ। সংখ্যার বিচারে আমরা এবারে কি ক্ষুদ্র

নই। আমরা দুটি প্রাণ। এখান পর্যন্ত এ পথ আমাদের চেনা। এগিয়ে চলেছি। ঘোটর মন্তক থেকে ঠাণ্ডা অনেকখানি কম। সর্পিল পথে ঘোরে যেতে হবে। আমাদের আগমনে পুলকিত আমরা। থাকে থাকে চন্দন সমুদ্র পত্রকেতু। ছোট পাখিরা গ্রাম, বাস চিটিকা, পার হয়ে যাচ্ছি। সামনে মন্দকেশরী তারপর দেবদা। ডাইনে বাঁয়ে যেখানে একটু পত্রকেতুর বিচ্ছেদ সেখানেই পুঞ্জ পুঞ্জ বন-বনাস্তর, সুন্দর মাটির গন্ধ। সুন্দর জোপজাতের ভাষা। কত চিন পাইন তাই গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঝ বা আনো আলাপচারিতা বৃক্ষের ভীড়। বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ছায়া। কোথাও শুধু অন্ধকার-ছায়া-কুয়াশায় লুকোচুরি। রোদ কখনো প্রবেশ পায় নি। ঘাস পাতার ভেতর দিয়ে ঘুমের পুঞ্জ আর একটা ঘুমন্তের হাতছানি। কোথাও দুরন্তময় স্তব্ধতার বুনো গাছ লতা পাতা বেঁধে দিয়ে বাঁধা। কখনো নীল আকাশের গায়ে শিকারের ছবির মতো মাঝারি বৃষ্টিকণা ঝড়, রঙের স্পন্দন। মন মাতানো ভালবাসা। অদূরে শিওর পর্বত জল কল শব্দে ঝরে চলেছে। আমরা মাঝোলী গ্রামে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যেতে চাই। তাই একটু পা চালিয়ে দেবদা বিশ্রাম নেয়ে মাঝোলীর পথ ধরব। দেবদা থেকে মাঝোলীর পথ একটু জটিল। দুটো নদীর সঙ্গমে দেবদা। জোরেল পর্বত আপন সত্তা হারিয়ে একাকার হয় উজ্জ্বল বাবেমান শিওর পর্বতে। শিওরী এখানে বেশ গাঢ়ে পর্বতের যৌবন দেখা, উজ্জ্বল হল। সমস্ত দুপাশুরে শিওরী যৌবনের অন্তরঙ্গ উজ্জ্বল নদী। মাঝোলীতে যখন পৌঁছলুম তখন বিকেল। প্রায় ষোল মাইল পথ চড়াই উৎরাই ঘরে উঠে এসেছি।

গাড়ে ঢুকে আবলুশ ইঞ্জিন বাড়ি, ডাকবাংলো সব দখল হয়ে আছে। তিন তলের একটি ঘর আগে ভাগে এসে আমরা দখল নিয়েছে। ওরা যাবে তপস্থল। এ ঘরে সকলেই অল্পবয়সী যুবক এবং সবাই অভিযাত্রী হিসেবে এই প্রথম ওদের প্রচেষ্টা। তাই উৎসাহ বেশী। আমাদের ঘরে পেয়ে ঐ দলের কয়েকজন দেখা করতে এসেছে। ফুলিদের কাছে আগেভাগেই শুনে নিয়েছে গত বছর আমরা কতদূর ঘুরে গেছি। তাই খবর সংগ্রহের আগ্রহে আমাদের ঘেঁকে ধরেছে। ফুলিরা বলে এ পথে বাঙালী অভিযাত্রীর সংখ্যাই বেশী। তখনো আমরা সুনিশ্চিত বাসস্থানের হদিস পাইনি। মন কিছুটা বিশেহারা, তাই ওদের অকল প্রশ্নের জবাব কিছুটা ঘায়সারা হয়ে গেল। ওরা বিদায় নিলে বাপু ঘর নিয়ে আগে ওর এক রিজেদারের (আত্মীয়) ঘর জোগাড় করা গেছে। তোর প্রকাশে ঠাই হবে দুজনের। আমার ও অনিতের। আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যোগানের ভার বাপু সিংয়ের। এ পথে বারবার এসে দেখেছি সর্বাধিক গাড়োয়ালী কুলি বা পোর্টার পরম অভিনিবেশে প্রতি যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য জোগায়। এরা প্রকৃতির অনুগামী, তাই প্রকৃতির মতই উদার, সহনশীল ও অনলসীল। বাপু সিং ও দেওরাম সিং পরম কর্তব্য বাবাবোর তোড়জোড় করছে। অচিরেই কর্তব্য পরিবেশিত হবে নিঃসন্দেহে। ইতিমধ্যে ঘরময় আমাদের মধ্যে এসে গান জুড়ে দিয়েছে। উদাম লাস্যময় ওর চোখে মুখে। রোদের আলো আমার চোখে দুই হাসি।

"পাহাড়োবে যাওনা—ঠাণ্ডা পানি পিয়োনা"। ছোট্ট কথায় বেরা গান। সুন্দর পাহাড়ী সুর। এ সুরে সুন্দর পাহাড়ী গন্ধ। ডাইনে হাওয়ায় পরপরানিতে এ সুর আমার কানে বেজেছে বার বার। আর ভেবেছি ঝিরঝিরে হুড়ি-ছোঁয়া ঝরণার

ধারে। আমরা ওঠে এ সুর থেকে নিজের পিরিমতই মেতিয়ে গেছি বার বার। এ সুরে অনুর ছোঁয়া আছে, সামনে পাথর বলানো উঠোন। শক্তির বিশ্বস্ত উদ্ভূক। একে একে তারা ফোটে আকাশে। শীত শীত মুহূর্তগুলি তত হয়। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। ঘরে ঘরে পাহাড় কুলবধূ আগুনের পাশে মিলে মিশে একাকার হয়। বাপু সিং কফি পরিবেশন করে। প্রাণ অবশ প্রাণে উষ্ণ আরাম এক পরম সুখ।

ভোর হতেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। পরিষ্কার সকাল। সামনে লোহাজং গিরিবার। প্রায় একমাইল খাড়া চড়াই। সামনে বাপু সিং চলে। হরিণের মত চোখে পায়ে দীর্ঘ জঙ্গলী পথে চড়াই ভাঙে অবলীলায়। আমি ও অনিত ওকে অনুসরণ করি। কষ্ট হলেও ওর তালে তাল মেলাই। একটু ওপরে উঠে এলুম লোহাজংয়ের ধর্মশালা যেখা গাছের কিনারে। নিজের অক্ষমতায় আস্থা জাগে। নিঃশ্বাস ঘন হয়। একটু বিশ্রাম। নয় হাজার ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি। অদূরে সুধাময়ৌলী নন্দাদেবী, নন্দাকুটি, ত্রিশূল পরস্পরি করে আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব রহস্যান্বিতায় দৃশ্য। সম্মুখে ওরাদের পথ উৎরাই পথে নেমে গেছে। এখান থেকে ওরাদ প্রায় নয় মাইল। আমরা চলতে থাকি। ডাইনে বাঁয়ে সহস্র ঘন সন্নী হয়। অদূরে পাহাড়ী ঢালে কত শত ঝর্ণা ঝরে। ঝর ঝর শব্দ নির্জনতায় প্রাণ সঞ্চার করে। বিকেল না পেরোতেই ওরাদে চলে আসি। সেই পুরনো ইস্কুলেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হবে। আমাদের খবর পেয়ে গত বছরের চেনা পুরনো লোকজন দেখা করতে আসে। ভাল লাগে। সামনে যাত্রাপানী পাহাড় চূড়া সূর্যদেবকে আড়াল করেছে। ঠাণ্ডাপড়ে পড়া নামে। বাপু সিং আমাদের খাইয়ে

# রাজ্যের প্রয়োজনে আরো বিদ্যুৎ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। আজ পর্ষদের প্রায় ৫ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে আছেন দরজির মানুষ, আছেন চাষার হাজার কৃষক—যাঁদের কাছে বিদ্যুৎ পর্ষৎ আজ সত্যি-কারের বন্ধু, আরো আছেন অসংখ্য শিল্পসংস্থা—যাঁদের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে বিদ্যুৎ পর্ষদের সাহায্য না হলেই নয়। বর্তমানে পর্ষদের উৎপাদন ক্ষমতা হল ৬৩০ মেগাওয়াট।

সারা রাজ্য জুড়ে পর্ষদের ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য ৬৫,০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশি। বিদ্যুৎ পর্ষদ ইতিমধ্যে ১২,০০০-এর বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে এবং ২২,৫০০টি লোডের জন্যে পাম্প সেট বিদ্যুৎ চালিত করেছে।

উপরন্তু ১১১টি হরিজন বস্তি ও ৩৮০টি খাদ্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।

### আগামী দিনের কাজ

**সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র :** এখনকার ১২০ মেগাওয়াটের তৃতীয় ইউনিটটি বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে। ১২০ মেগাওয়াটের চতুর্থ ইউনিটটি ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি মাগাদ চালু হবে।

**ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র :** ২৫০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজ ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি শেষ হবে।

**জলঢাকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র** (২য় পর্যায়) : ৮ মেগাওয়াটের এই কেন্দ্রটি ১৯৮০-৮১ সালে শেষ হবে।

**কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র :** প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াটের তিনটি অর্থাৎ ৬৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি তৈরির কাজ ১৯৮৩ সালে শেষ হবে। আরো ৬৩০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে।

**রাঙ্গীত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র :** ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ১৯৮৩-৮৪ সালে শেষ হবে।

**অন্যান্য কেন্দ্র :** মোট ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে গ্যাস-টারবাইন বসানোর কাজ এ বছরের অক্টোবরের মধ্যে শেষ। জলঢাকা ৪০ মেগাওয়াটের কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যে বর্তমান লাইনের সম্প্রসারণ ছাড়াও নতুন এগারটি লাইন তৈরি করা হবে। এগুলি হল : দুর্গাপুর-কলকা ২২০ কেভি, মালদা-রায়গঞ্জ ১৩২ কেভি, দুর্গাপুর-বিষ্ণুপুর ১৩২ কেভি, বহরমপুর-এলমা ১৩২ কেভি, বেহালা-লক্ষ্মীকান্তপুর ১৩২ কেভি, হাওড়া-কলকা ২২০ কেভি এবং হাওড়া-কোলাঘাট ২২০ কেভি লাইন। এই সব কাজগুলির জন্যে এবছর যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, পর্ষদের ইতিহাসে এত টাকা আর কখনও বিনিয়োগ করা হয় নি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ**

ফিরে নিজের গৃহে ফিরবে। আপন গৃহস্বামীর হাল ধরেছে। আমাদের কৃষাণী পরিজনা খেয়ে ও আবার গৃহে ফিরবে। খেতে রুচি নেই। একঘেয়ে রুচি আর বিচিত্রি লাগে না। তাছাড়া এ পাহাড়ী গাঁয়ে উল্লিত খাদ্যের যোগান যে সম্ভব নয় সেটা পর্বত অভিযাত্রী মাত্রেরই জানা। শরীরে ক্ষয়াগত উত্তাপ চাই, তাই কিছু খেতেই হয়। স্বাদগন্ধে রুক্ষাত্রি। কিছুক্ষ বিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝপথে ভলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসে। আমরা দুজনে একে অপরকে দেখি। আগামীকালের পরিকল্পনা চলে। ভাল থেকে অচেনা রাস্তায় পাড়ি জমবে। তখন প্রান্ত শরীরে পুর ফুরিয়ে আসে।

পুর ভাঙে মাধুর ডাকে। সুপ্রভাত জানায়, রুচি পরিবেশন করে। এ মুহূর্তে মাধুকে আদর্শ হাসিখুশীর পুরুষ বলে মনে হয়। সেবাই এদের পরম ধর্ম। নিরুত্তিপর অনুবিধের মধ্যেও নিরন্তর আমাদের যাচ্ছন্দ্য যোগায়। বিশাল ত্যাবয়র পর্বত মানুষকে ক্ষেত্রীল সৌন্দর্য দান করে। রুচি খেতে খেতে প্রস্তুত হয়ে নিই। আজই কুকীনা খাল পেরিয়ে ভলোল হয়ে সুতোল পৌঁছে যাওয়া চাই (বারো মাইল)। ঘর নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছি। ওয়ান থেকে উত্তর বরাবর চলেছি। পূর্বদিকে বৈষিমী বুগিয়াল, আলিবুগিয়াল হয়ে ভলুতোর পথ। খাড়া চড়াই বেয়ে প্রায় দুহাজার ফুট উঠে যেতে হবে। উৎসাহ ভাঙে গড়ে। এগিয়ে চলতে চলতে মাধু গল্প ফুড়ে দেয়। মিঠোল গল্পে মন ভুলিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা। উদ্ভূত দুঃসাহস গল্প। দুটি বিশোর মেয়ের কাহিনী। দেবী পার্বতীর বিবাহ যাত্রার উৎসাহী সহযাত্রী চলে। চলতে চলতে কুকীনা খাল বাঁধে এসে পেছিয়ে পড়ে। আজ বিচারে তারা অবল, অক্ষম। এ পুণ্যযাত্রার প্রকৃতি তাদের অনুপযুক্ত বলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তেমন করিয়ে হতে থাকে। দেবতারা এগিয়ে চলে দূর থেকে আরও দূরে, তারপর শীর থেকে শীরে। তারা পৌঁছে গেছে শিরিষবনের শীরে এসে। সব শেষ হয়ে যায়। আজও ওদের স্মৃতি বহন করে রেখেছে গাঁয়ের লোক। ওদের নামে পুজো উৎসর্গ করে। সাধুর গল্প শুনতে শুনতে অবশীলায় উঠে আসি কুকীনাখালের শীরে। সাধু বলে আপন কোন যাত্রী ঐ টাকা দিয়ে পুজোর উপকরণ কিনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো দিয়ে যাবে। নিরক্ষর মানুষ ও তাদের সরল বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ভাল লাগে। সাদোয়াজী মানুষ আপন মতো সরলতায় একথা বিশ্বাস করে। ওদের সংস্কৃতিতে একটা সহজ মানবিকতার ভিত্তি আছে যার ওপর যুগ যুগ ধরে আচার, অনাচার, ভক্ত ও অভক্তার আস্তিত নানা সংস্কার বিচিত্র রূপকথা হয়ে ভরে ওঠে পরতে পরতে। ওয়ান থেকে ভলোল ছয় মাইল। কুকীনাখাল থেকে ভলোল মাত্র আড়াই মাইল। এখন একনাগাড়ে উৎরাই, মধ্যে ছোট বুগিয়াল। আমাদের বাঁয়ে ভয়ঙ্কাল বেশুনডাল। চারু পথে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদী গ্রাম দেখা যায়। ছোট্ট গ্রাম এই ভলোল। একটু বিশ্রামালাপ,, সঙ্গে উষ্ণ কফির অনুযোগ। আশেপাশে ভেড়া চরে বেড়ায়। কিন্তু গ্রামবাসী উদ্ভুক্ত প্রান্তরে বসে স্থানীয় পদ্ধতিতে কম্বল বুনে চলে। রুচি খেয়ে উঠে শক্তি। ভলোল থেকে সুতোলের রাস্তা কিছুটা সহজ।

আমাদের চারদিক ঘিরে আবর্তিত হয় পর্বত প্রান্তর। চির ও রাউয়ের বন আমাদের ডাইনে বাঁয়ে ছেয়ে থাকে। মৃদু হাওয়ায় দোল খেয়ে পল পল শব্দ তোলে। আমাদের কুলি বলবন্ত সিং কিছুক্ষ ভলোল থেকে যায়। আপন ঘরে বিবির সঙ্গে দেখা সেরে আমাদের সবলে সুতোলের আস্তানায়। এ অঞ্চলের আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। প্রকৃতি দেবী বিরূপ হলে এ পথ দুস্তর। পদে পদে যাত্রা বাধিত হতে পারে। সুতোলে দুরকেতো দুটি মাঠে। একটিতে নন্দাকিনী ভলপ্রপাত থেকে। জল পবিত্র। পবিত্র জলে বিধোত প্রাম সুতোল। তোমার থাকবো ভাবছি। মাধু দেখিয়ে দেয় অদূরে পাহাড়ী ঢালে ফুলবাড়ি। তক্ষণে আমাদের নিবাস ঠাঁই ঠাঁই পথে ঘোরা করে। পায়ের নীচের এইটুকু জমিতেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়। মাধুর উপায়ের জন্য পড়তেই মনে হল যেন আশ্বাসপ্রদীপ দেখছি। ঐ উজ্জ্বলবাড়ী আকাশ ছোঁয়া টিলার ওপর। গ্রামের ভীড় কাটিয়ে যাইছে। আমার উচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক সীমায় ওঠানামা করে। ইতিমধ্যে বলবন্ত আমাদের ঘরে ফেলেছে। ওর চলনের চঞ্চলতা আমায় সচকিত করে। ও কত দ্রুতই না আমাদের ঘরে ফেলেছে। আমি এবার অনুসরণ করি। দুঁড়িয়ে দুঁড়িয়ে উজ্জ্বল বাড়িতে চলে আসি। হিমালয় প্রকৃতি গ্রাম পরীর মন অতি সহজেই সচকিত করে। দুটি ঘরেছে। উজ্জ্বল গ্রামখে দাঁড়িয়ে দেখি অদূরে বরফাবৃত ত্রিশূলের দুটো শৃঙ্গ রৌদ্রচ্ছটায় ঝলমল করে। আবার দুটি। মেঘ রৌদ্রে লুকোচুরি খেলা। সামনে চমোরিয়ারকোট শৃঙ্গ। ঝলকৃতত্ত্ব পথে বওয়াবাসা ও বৈজুবিনায়কের পেছন দিকটা স্পষ্ট প্রতিভাত। গত বছরের ঝলমুখ পরিক্রমা মনে পড়ি হয়ে আসে। হাটি হাটি প্রহর চলে, সন্ধ্যা নামে, রাত বাড়ে। নিদ্রা ভাঙে। আবার প্রভাতের কর্মমুখর চঞ্চলতা। আজকের নিশানা পটোয়ারী-গাঁও (২৪ কিঃ মিঃ), রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত

বেলা। আমাদের পথের বহু নীচে বামে প্রবাহিত ঝলমলা-ঝকাকিনীর ধারা, পাশের ঢেউ ভেঙে ছোট ছুটে ছুটে চলেছে যানবাহন বহী। ঘাড় ঝিমের ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটছোট। ঝেড়া ঘাস পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। বেশ কিছুটা এগিয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের ইশারা মৌরমানা। চলতে চলতে ঝলা ঝরি দূরে ঘাট থেকে শীতের ঝনৌকোর ঝাঙা এঁকে বেঁকে চলতে চলতে হারিয়ে যায়। অবশেষে পুজোচুরি মেলে। প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর পটেয়ারীগাওয়ের সীমানা ছুঁয়েছি। এখান থেকে ঘাট প্রায় তেরো কিঃ মিঃ।

গ্রামে ঢুকতেই গাঁয়ের ইকুল শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়। অত্যন্ত সদালাপী ব্যক্তি। আমাদের থাকার আলাদা তিনিই বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করে দেন। এঁর কাছ থেকেই খবর মিলে জানি এখানেও মহালয়াতে পুজো হয়ে থাকে। হৃষ্ণপ্রয়াগ থেকে মহালয়ের ছোলা ছয়দিনে পটেয়ারীগাও হয়ে মহাপাটা চলে যায়। এখানেই পুজো আর উৎসবাদি সেরে আবার ছোলা ফিরে যায় কর্ণপ্রয়াগ সন্নীপবর্তী হৃষ্ণপ্রয়াগে। হনুর কলস বুকে নিয়ে পাহাড়ী চালে বহু নীচে গ্রাম এত পঞ্চমতা ঘোষণা করে। গ্রাম আনি বুড়া। আমরা পটেয়ারীগাওয়ের রাত কাটিয়ে আজ কি কি চলে যাবো। এখানে দুধিপাল চড়াই ভাঙার পালা। ইচ্ছে ছিল প্রাণে শক্তি সঞ্চালিত করি মহাপাবতীর তপস্যানে। রাতনী দিয়ে গেলে চড়াই ভাঙা কিছুটা কমতো। তবে দূরত্ব কমে যেতো অনেকটা। এ আমাদের অনিবার্য দূরত্বকে দ্রুত ডিঙিয়ে আবার চেষ্টা। এ চেষ্টা সফল হলে ভাল। এক নাগাড়ে চড়াই পেরিয়ে যেতেহবে, তারপর কি কি ১৫ কিঃ মিঃ)। পথের ধনের মধ্য দিয়ে কি কি পথ। অবশ্য ভাল লেগে উৎসাই নামছি। এ এক বিষম অবস্থা। আমাদের থামার অবকাশ নেই। আকাশে মেঘের ঘটনা, বৃষ্টির ইশারা। মনে মনে প্রমাদ গুনি। শুনেছি কি কি'র পর থেকে মুসাফী পর্যন্ত রাস্তা নিদারুণ কঠিন ও বিপদ। এ বছরের প্রবল বর্ষণে মুসাফীর পথ আরও কঠিন হয়েছে। হিমালয়ের পথ, এখন কপাল ঠুকে চলা ছাড়া গতি নেই। বিকেল ছুটো নাগাদ কি কি এসে এক গাড়োয়ালীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছি। কোন প্রকারে রাত্রির ঠাঁই। অনাড়ম্বরিত পরাক সেলোকিম মুড়ে শীতল হাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। দেহের কোষে কোষে প্রবিষ্টে প্রবিষ্টে অবসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। নাথু, বলবন্ত ও বাল সিং কফি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা একটু গুছিয়ে বসেছি কিন্তু শারীরিক অস্থিরতা কাটাতে পারছি না। আমার বিপন্ন মনপ্রাণ সমস্তের হাতে সমর্পিত। এই


কলকাতা মেট্রো হোক

কলকাতা মহানগরের শৈশবেই এই মহানগর আজ জীর্ণ ও দুর্গতি। অসহনীয় ভারে ক্লিষ্ট ও ন্যুব্জ। তার পদক্ষেপ আজ ব্যাহত। দুরন্ত অশ্বের মতো তার কেশর আন্দোলিত হোক। পায়ের খুরে সঞ্চারিত হোক গতিবেগ। কলকাতা দুর্বার হোক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে। স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবনের উদ্দেশে। এই প্রার্থনা আমার আপনার সকলের। কলকাতাকে যারা ভালবাসি।

মেট্রো

মন্বরতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ

মেট্রো রেলওয়ে

দুরীত্ব সময় আমার অবসর, শ্রান্ত শরীর যদি একটুও অমৃতের পরশ এবে দেয়। দিনের আলো থেকে সময় বোঝার উপায় নেই। ঘড়ি দেখে সময় জানি সন্ধে ছটা। খাবার তৈরী। খেয়ে শুয়ে পড়ি। নিটোল ঘুম চাই। কিংকি থেকে বিরহিতাল হয়ে শিপলকোঠী প্রায় আঠারো মাইল। গ্রামবাসীদের সরলতে যাওয়া আমার পথ এই শিপল কোঠী দিয়ে। এ অঞ্চল অত্যন্তরে নিরারণ স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে সারতোলীর জনসাধারণ কেমন করে দিন কাটায় আমার সময়ে চিন্তার যোগসূত্র হয় না। অথচ ওরা হাসে, খেলে, নাচে, উৎসব উদ্‌যাপন করে। পাহাড়-ঘেরা দিন মানুষের বেলা। এ বেলা কত সহজ, কত সরল কত শান্ত।

আমি ওদের প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, যুবককে দেখে বিস্ময় বোধ করি, মনে মনে ওদের প্রতি সদয় হয়ে। দীর্ঘকাল পর্বতাঞ্চলে থাকতে থাকতে ওদের ভিতরে এক ধরণের শান্ত গভীরতা এসেছে। জীবনের তুচ্ছতা বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। সহরে উপকরণসর্বস্ব লোভী জীবনে ফিরার জন্যে। আমি উৎকর্ণ হয়ে সাথী কুলিদের কথাবার্তা শুনি, ওদের হাসি গানে সামিল হয়ে যাই। ওদের পাহাড়ী বন্ধুতা ধরতে চাই। ঘুম ও জাগরণের ফাঁকে ফাঁকে এমনি কত কথা এলো গেলো। বাপুর আজে ঘুম আসে। প্রশান্তির হাতে সে তার পরিবেশন করে। বাপুকে ঘিরে আমার ঘুম জড়ানো দৃষ্টি প্রদক্ষিণ করে। বাপু আপন কর্ম দৃষ্টি চোখে কত ঘনিষ্ঠ হয়ে হিমালয়কে দেখেছে। হিমালয় প্রকৃতি বাপুকে করেছে উদার, কঠিন, সহনশীল ও অবসরীয়। কবি যেতে যেতে থৈরী হয়ে নিয়েছি। এবারে গন্তব্য সারতোলী (১১ কিঃ মিঃ)। সারতোলীর পর থেকে ছুয়াড়ী পর্যন্ত আর কোন গ্রামের আশ্বাস পাওয়া যাবেনা। কিংকি, সারতোলীর পথে ছোট গ্রাম কালিয়াঘাট। আমরা একটু দ্রুত এগিয়ে যেতে চাই তাই কালিয়া ঘাটে না খেয়ে সারাদিন সারতোলি চলে যাবো। সাধারণত যে সব যাত্রী দেবরথতে ছাউনি ফেলে, তারা পরের দিন কালিয়াঘাট থেকে যায়। আমরা যেহেতু কিংকি চলে এসেছি তাই আর কালিয়াঘাট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সোজা চলে যাচ্ছি সারতোলী। এ পথ বড়ই কঠিন কঠোর। কোথাও পাতাল গতি উতরাই, সঙ্গে ঘুরো, জংলী গহন বন পথ আগলে থাকে। আমার চারটি পথে জংলী ঘাস ঘরে ঘুরে ঘুরে ওঠা। নিরন্তর পিছিয়ে যায় নদী হয়ে থাকে। চলতে চলতে পাথর বিরহীদলার মুখোমুখি হয়ে যাই। সব জানাবোর উদ্যমতা নিয়ে ঘরে চলেছে। এ নদী পেরোতে হবে। একটা লম্বা গাছের গুঁড়ি পেতে পারাপারের ব্যবস্থা। অতি সন্তর্পণে সংহত একাগ্রতায় পেরিয়ে যাই বিরহী নদী একে একে সকলে। এমনি কঠিন পথের আঘাতে পথে মাঝেমাঝে হতে হতে দিশেহারা হয়েছি অনেকবার। কিন্তু এখন হাঁটা ছাড়া গতি নেই। গতি ছাড়া পথ নেই। প্রায় চার ঘন্টার পথ পেরিয়ে কালিয়াঘাট। দূরে সোনাতালের নল দর্পিল রাস্তা চোখে পড়ে। রাহুলী, বিরহীতাল হয়ে সোনাতাল দিয়ে ছুয়াড়ী আসার রাস্তা আছে। এ পথে চড়াই ভাঙার কাজ বেশী এবং সময়ও বেশী লাগে। আমরা সোনাতাল থেকে ছুয়াড়ী যাব তারা ঐ পথ ধরে। সোনাতালে সরকারী মাছ চাষের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। এখন সোনাতাল বিধ্বস্ত। সুবিশাল জলে সোনাতাল বিরহী নদীর সিপে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে আজ কত ছোট বড় গ্রাম পেরিয়ে গেলুম। সারতোলির পথে সর্বশেষ গ্রাম পানাকে আমরা বাঁয়ে রেখে চলেছি। বাপু আমার কাছে এগিয়ে আসে। হাতের ইশারায় বিশাল আকৃতির একটি ভালো পাইন গাছ দেখিয়ে বলে, ভীম এ পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিশ্রামের হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলেন। একটা বিশাল গাছ ঘেঁষে ভীমের বিশ্রাসন প্রতিষ্ঠিত। এ আসনে উপবেশন করে তাঁর নিম্ন প্রকৃতির লীলাখেলা দেখতেন। আমি ভাবি দেবতারা কি অন্তর্যামী? মনে আসে মহাভারতীয় যুগের পুরাণের উপাখ্যান। কৃষ্ণকে ঘুষ দেয়ে জাতিস্মরের দুর্বহ বহনে পাশুপত অস্ত্রোপলব্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশে হিমালয়ে যুরে বেড়ান। দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় মগ্ন হন। হিমালয় অপরূপ। আনন্দ, অমৃত, শান্তির উৎসলোক। এ পরলোকের পাথর পৃথা। এ দেশের জনসাধারণ এখানে আজো শরণাগতিতে পুজো দিয়ে যায়।

আমরা সারতোলী পৌঁছে যাই তিনটে নাগাদ। ঘন বসতি সারতোলি গ্রাম আজাদ। জনমানবহীন সারতোলী কিছুটা রুক্ষ। সবুজ বনে অন্ধকার জমাট বাঁধে। জঙ্গলের বিচ্ছেদ রেখে ঘাসবনে ছাউনি পাতি। কেমন একটা অন্তহীন শূন্যতা বিরাজ করে। ধীরে তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ি। চোখের সম্মুখে মহামহিম হিমালয় পরিব্যাপ্ত হয়। ঘুম ঘুম ঘরে মানুষকে আচ্ছন্ন করে আসছে। আর সন্ধ্যাতারা ঘুম ঘর হিমালয়ের বুক থেকেই প্রথম উদিত হয়েছে। হাজার বছর ধরে কত মুনি, ঋষি, যোগী, সন্ন্যাসী আর পর্যটক হিমালয় পথে বিচরণ করেছেন। দেবতারা হিমালয়ের দুয়ারেই কোন তপোবনে বসে মহর্ষি বেদব্যাস হয়না করেছেন সময় মহাভারত। শঙ্করাচার্যের তপস্যাপূত জন্মীঠ, গুরুগোবিন্দ সিংহের সিদ্ধিক্ষেত্র লোকপাল হেমকুণ্ড কথা মনে আসে। মনে আসে তিব্বতী সন্ন্যাসী কবি

হিমালয়ের হিমালয়ের কোলে বাস তার-ছিলের স্বভাবের আমার। এই আবোক অধিবের সামনা থেকে তারতবর্ষ তার সভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য নিয়ে বহেছিল।

রাতভর বৃষ্টি। রাতের শেষ প্রহরে পাকা রাস্তার দাপাদাপি করে এলো। তাঁবুর ভিতরে উদগ্রীব হয়ে ছিলাম। অন্ধকার কাটলেই তাঁবু গুটিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেবো। মাধুর কর্তব্যে অবহেলা নেই। তাঁবুর কাপড়ের একটুকু ফুলতেই চাপ কাপানো নীচ প্রবেশ পেয়ে পরীর কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। আমি দেখি মাধু এগিয়ে এসে কলি দিয়ে যায়। কুলিরা চাউনি গোটাতে ব্যস্ত। দূর পাহাড় চূড়ায় রোদ ঝলমল করে। এখনি যাত্রার আয়োজন প্রবেশ করবো। পথের দুর্গমতা বাড়ছে। এই বেলা একটু দ্রুত পদচালনা করা দরকার। প্রকৃতিদেবী যে কখন বিরূপ হবে কে জানে। নেপালরাজের মত চলেছি চাপু থেকে উচ্চতায় একধাপ থেকে অন্য ধাপে। সামনে দুস্তর চড়াই। কলহীন অনন্ত সিরিশ্রেণীর অভ্যন্তরে আমাদের যাত্রার অবসান নেই। পা টিপে টিপে আজকের মতো শেষ ধাপে হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে যেতে হবে। সংযত পদক্ষেপ সম্ভব হচ্ছে না। তাড়নায় রক্ষা করতে না পারলে অবশ্য পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত হব। বেয়ে বেয়ে উঠি, বসে বসে হাঁটি। সাঁই সাঁই শব্দে নিশ্বাস আঁনাসা করে। পথের হিসেব বেমালুম হয়। মাধু নিবন্ধ প্রহরায় আমাদের ঘরে ঘরে তুলে নেয়। একটু স্থির হাঁফিয়ে, নতুন গিরিশিখরের ঈষদ্বেশ দেখি। যেন সুখ বেড়েই চলে। তাবি যদি পাখী হয়ে উড়ে যেতে পারতুম। ইতিমধ্যে তাকোয়া পেরিয়ে গেছি (৫৭ কি: মি:)। ৬ ঘণ্টার নিরন্তর সংগ্রাম শেষে গিরিশিখরের শেষ চড়াই উঠে আসি। বিস্তৃত, অবসন্ন পরীর এলিয়ে পড়ে। চোখ বুজে থাকি। হয়তো হাওয়া ধাক্কা পরীরে মৃদু আঘাত চলিয়ে যেত। নির্জন হিমগিরি ভটিল পাহাড়, সন্তের নরম বুশিয়ান আমায় ঘুমিত করি-পাশে পরিব্যাপ্ত হয়। মাধুর ডাকে উঠি বসি। কেমন একটা ঘন আচ্ছন্নতা ছেয়ে থাকে আমার চেতনায়। অবচিতনে আমাকে বেষ্টন করে থাকে অগুন্তি নাম-না-জানা তুষারাচ্ছন্ন পর্বত প্রাকার।

মাধু বলে "ঐ হাতী পর্বত, ঐ চৌখাম্বা, ঐ অন্নপূর্ণা আর ঐ দেও-আনো।" ঘোরে ঘোরে গায়ে গায়ে পর্বতের নাম। ভূতাত্ত্বিক বছরের হিসেব ধরে পেছিয়ে যাই। অতীত থেকে ভবিষ্যৎ কেমন পরিব্যাপ্ত হয়। তাই এই মহত্তম পর্বতরাজীর যৌবন নেই, জরা নেই। কিংবা হয়তো আছে। কিন্তু পাহাড়ের যৌবন বা জরা এতই দীর্ঘস্থায়ী যে মানুষের আয়ুতে বেড় পায়না। ঐ

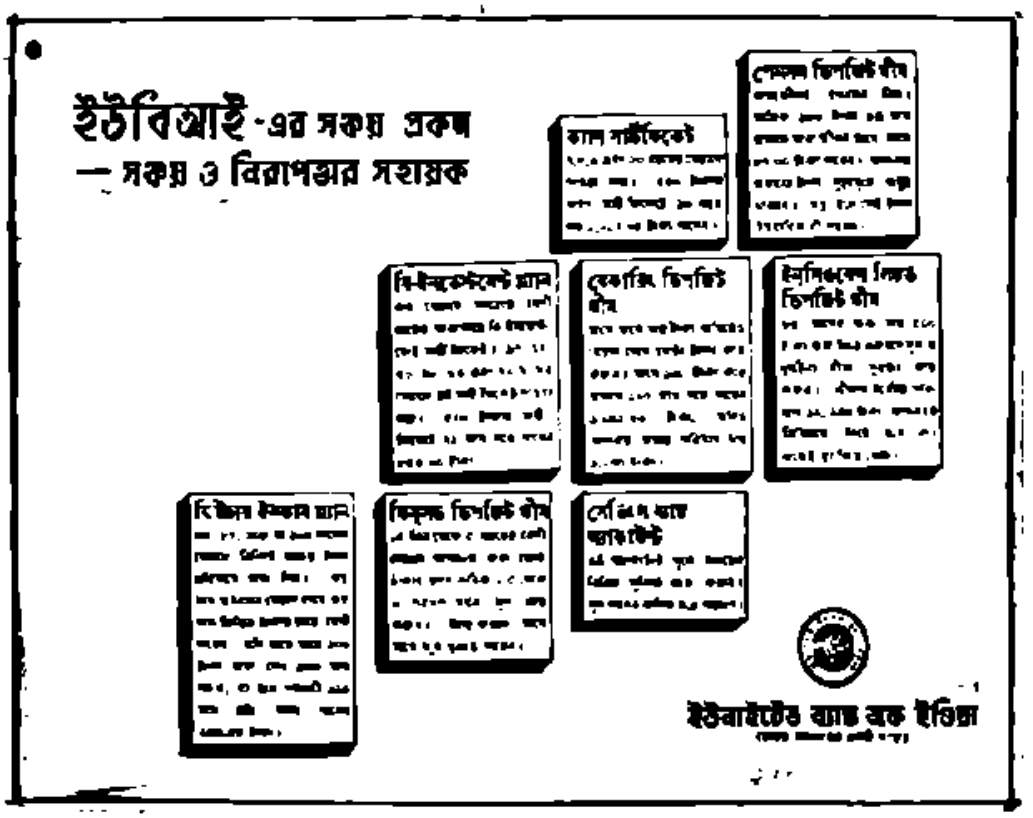

পাহাড়ে আমার জানে, উপায়ও করে। আমি পাহাড়ের ঠিক বিপরীতধর্মী মানুষ। কোন উচ্চতা নেই, কোন মহত্ত্ব নেই। নিম্নের জলকাদায় কুচ্ছ দিন যাপন।

কুয়াশা পৌঁছে দেছি বেলা দুটো নাগাদ। বেলা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরের পর্বত প্রাকারে অবিরত ঘন মেঘের অভিসার চলে। হিমেল ছুঁয়া লেগে চারা। আজকের রাত কুয়াশার রাত। নিবিড় শীতল হাওয়া হাতে কাঁপন ধরায়। তাঁবুর ছাউনিতে ঢুকে পড়ি। আমেজের গহন লেগেছে সকলের চোখে মুখে। খাবার বানাতে ব্যস্ত। কত গান কত কথা কুয়াশার হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মন মরমে সন্ধ্যা নামে। শীতে জবু থবু হয়ে থাকি। সবার বুদ্ধিমানে আগুন জ্বলায়। দূরে দেখতে পাই অনেকগুলো তেড়ার পাল বুদ্ধিমানের চালে চড়ে বেড়ায়। তাঁবুর আড়াল থেকে বাইরে চোখ পাতি। আকাশে অন্ধকারে জ্যোৎস্না ফোটে। বাঘুয়া গান ধরে। পাহাড়ি সুরে হিমালয় নাচ গায়। বুদ্ধিমানের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গানের সুর দিকে দিকে ধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে অসীম অনন্তলোকে। পরম আনন্দোপলব্ধির মধ্যে যামিনীর শেষ যামে পৌঁছে যাই।

ভোর হয়। পর্বত প্রাকারে সূর্যালোক ঠিকরে পড়ে। চক্ষু পটে পটে ছবি হয়ে উঠতে থাকে। এ ছবি সত্যের, এ ছবি পূর্ণতার এ ছবি অনন্তের। চোখ ভরে দেখি, বুক ভরে নিশ্বাস নিই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর পবনে হাওয়া চলতে থাকে। কুয়াশা ছেড়ে চলে যেতে দেরী নেই। এ পথ এখন একটানা উৎরাই পথ। আমরা এখন একটা উৎরাই বেয়ে নেমে যাবো চাক-রাতা পর্যন্ত (যাত্রা কিঃ মিঃ)। প্রায় ছয় ঘন্টা ক্রমাগত উৎরাই যাবার পর চাক পৌঁছে যাই। এখান থেকে তপোবন দূর আছে। নীচে অবতিদূরে ছোটর সড়ক পথ দেখা যাচ্ছে। আমরা এখান থেকে যোশীমঠ চলে যাবো। এ সড়ক যাত্রাপথ চলে গেছে (এখান কিঃ মিঃ)। যোশীমঠ এখান থেকে মাত্র দশ কিঃ মিঃ। বাসের অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটেই যোশীমঠ চলে আসি। গোধূলিবেলা যোশি আমাদের সঙ্গী হয়ে এঁকে বেঁকে চলে।

যাত্রারম্ভে চলায় শুরুতে বেশ কিছুটা ভয় বিজড়িত ছিলুম। পথের হিসেবের গোলায় আট দশ দিনের হাঁটাপথ সুদীর্ঘ মনে হয়। মনে আমার কতটার উৎসে এই অহেতুক ভয় বার বার আমায় হারাতে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের যাত্রাটা যে এখন অত্যন্ত ছোট তা পূর্বে কখনো নিঃসংশয়ে বুঝিনি। কেবল-মাত্র তিনটা দিন। দিনগুলিও চব্বিশ ঘন্টা এক মিনিটও বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত। আমাদের এযাত্রের পথযাত্রা যেন এক লহমায় ফুরিয়ে গেল।


# পশ্চিমবঙ্গ খাদি গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

২নং রিপন ষ্ট্রীট. কলিকাতা-১৬

• পর্ষদ থেকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতি ও ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগে ও খাদি ও বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়।

• সুলভমূল্যে, আধুনিক ডিজাইনের সুতী খাদি ও রেশম খাদির পোশাক পরিচ্ছদ, পর্ষদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'গ্রামীণ' থেকে সংগ্রহ করুন। সস্তা দামে উৎকৃষ্ট মানের সামগ্রী এখানেই পাওয়া যায়।

ঠিকানা—১২নং বি বি ডি বাগ, বাইটন বিল্ডিংস, ভবানীপুর, গোলপার্ক, বেলঘরিয়া, ডনলুক, সুপারপুর (বেনাচিতি), বসিরহাট, মালদহ, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট

• গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামোন্নয়নের কথা জানতে পর্ষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রামীণ' গ্রাহক হোন। বার্ষিক চাঁদা সডাক ছয় টাকা মাত্র।

# গণতন্ত্রের মিঠাই

## অনার্য মিত্র

বুড়োরা বলে আজকে
সেটা না হয় সুখের
তফাতটা কি তুলছ তুমি
দেখাও দেখি চাঁদে।
বয়সটা তো কম হল না
ষাট বছরের বাদে?

বুড়োরা বলে হটছে
সেটা না হয় মুখীর
তুমি ক'পা এগিয়ে এলে
দেখাও দেখি তারা;
একটু গভীর ধ্যানে পেয়েছো
তাতেই ভাবী পাড়া?

বুড়োরাতো বলছে
তামাই ঘোরার ছবি,
বুক পকেটে রেখে তোমার
করছে রাজীমাৎ
বুড়ো তোমায় বাৎ বলেছে
অবাবস্তার ছাত।

দুই.

এমন নেতা একটা পাবে
লক্ষ হাজারে,
সিদ্ধিদাতা বুদ্ধ বাচে
সিদ্ধিক বাজারে।
ঠাই যেমনি তার দুয়ারে
নিজেই হলেন ঠাটা,
পায়না পাতা চলমঘোর
আহাম্মকের ঘাটা।
শৈলনগর হাজিলিং
সেই বাকি তার ঠাই,
ঘটক বাওয়া অতই সোজা
উঠল হঠাৎ বাই?

তিন.

ওলো সখী আয়রে তোরা
উলুধ্বনি দে,
দিল্লী থেকে পাত্রী চলে
জামাই এসেছে।

জামাই আমার লোহাস জামে
গাইতে বেহাস সুর
ওলো সখী আয়রে তোরা
উলুধ্বনি দে,
ঘর বিবাগী জামাই আমার
ঘরেই ফিরেছে।

চার.

গণতন্ত্রের মানে বলতে
একটাই তো মানে
দিনের মধ্যে কে কতবার
ভোট চাইতে জানে।

ভোটের খেলাই বিষম খেলা
কে খেতে কে হারে
কে তার পিছু ঘায় ঘুটে যায়
কে করে বল ছাড়ে।

গণতন্ত্রের গান বলতে
একটাই তো গান
যার কতটা নকল হয়ে
দেশপ্রেমের তাণ।

মানুষ মানার দুঃখন
আর বেশপ্রেমের দুঃখ
কথায় কথায় বলতে পারেন
মিথ্যে অমর্গল।

গণতন্ত্রে নেতা মানে
তিনিই আসল নেতা
ভেতরে যার পাঁচ পয়জার
বাইরে আছে কেতা।

নেতার পিতা টাকের কিছা
কালোবাজারে ঘর
তিনি রাখের তিনিই মারেন
তিনি দণ্ডেশ্বর।

গণতন্ত্রের মানুষ মানে
অর্ধভোজী প্রাণ
যতটুকুই খান, তবু তার
ভোটের বেলায় মান।

গণতন্ত্রের মানে বলতে
একটাইতো মানে
কে কতটা তাড়াতাড়ি
দেশ ভোবাতে জানে।

পাঁচ.

কেন ভোট কিসের ভোট,
কে কার সাথে বাঁধল ভোট,
ভোট বলে না, গণভোটা
আর ছুটি যায়, কে ভোঁতা।

ভোট মানে তো আবার ভোট
মন্ত্রী পতন, আবার ভোট,
যে ব্যাটাদের গুঁড়িয়ে যে
হাটে বাধা মুড়িয়ে দে।

ছয়

'ভোট হাও ভোট হাও' ক্যাম্পেন,
খেয়ে যাও দু' বোতল স্যাম্পেন।
চিৎকারে দুংকারে ভোট চাই
গলাটা তিজিয়ে নেব বড় ভাই।

সাত.

তার যা আছে থাকবেই তা
দলাদলি আর কলাকলি,
সে বলবে ভোবটা কিসের
কার ঘাড়ত্তি ভোপাদী।

পুঁজ যদেই আবার সেই
অভিশাপকে বরণডালি
ভরে তোলা ঘোড়াই কেয়ার
ভোরনা দিলে চরণডালি।

আট.

বাইরে ও বোমাল তো পাচ্ছেন,
দি কি এর ওপরি আসছে,
এইবারে কেলাবাটা বরবে
'বেওদাবারী'ও আজ হাসছে।

বাজারে টাকার টাকা হয়মাস,
হয়হায় বাড়ছে ও বাড়বে,
মুদ্রার মানুষে চাহিবা
অর্থনীতির খুঁটি নাড়বে।

# পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ

## সুমন্ত সেন

ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ বাস করেন গ্রামে এবং তাদের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত ধনের উপর কোন সময়েই কোনভাবে কর বসান হয়নি, কৃষি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ফুলাবীরা যে বিপুল অর্থের মালিক হয়ে বসেছেন তার কোন অংশই কখনও সামাজিক কল্যাণের খাতে ব্যয় হয়নি। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণী বরাবর যে জমিদার-জোতদারদের মুখ চেয়ে চলেছেন তার একমাত্র কারণ হল এই ফুলাবী গোষ্ঠির সমর্থনই এঁদের ক্ষমতার মূল উৎস। তাই ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনে আইন তৈরী হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় না. দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে আসার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে ওঠে, উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে প্রচুর পরিমাণ আয়ের ফলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। জাতীয় অর্থনীতি প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং দেখা দেয় সেই অদ্ভুত দৃশ্য যেখানে একদিকে মানুষ আধপেটা খেয়ে রয়েছে, আরেক দিকে খাদ্য রপ্তানী করা হচ্ছে কারণ দেশের মধ্যে তা বিক্রী করা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের এই অবস্থা বর্তমান এবং আরও খারাপ হবে এই সংকটের শেষ দিকে যখন বিনিয়োগ হ্রাস পাবে তিমিত পর্যায়ে যাবতে। কেন্দ্রের বিভিন্ন সরীকারেই এই কথা বলা হয়েছে।

কেন্দ্রে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো। এবং যদি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা করা যায় তাও কতদিন থাকবে না বলা যায় না কেন্দ্রে শাসক শ্রেণীর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে সে অভিজ্ঞতের কথা এবং বর্তমান যুগে কোন্ পথে সেই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব সেই বিতর্কে যাওয়ার অবকাশ এই প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে নিহিত নয়। আমরা বিচার বিশ্লেষণ এঁদের সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও কোন রাজ্য সরকার আইনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র ও মাঝারী কৃষককে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন কিনা। তার অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়ে, তার ক্রয়ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন কিনা।

ভারতে বর্তমানে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যে সরকার আছেন তাঁদের কাছে উপরোক্ত প্রত্যাশা করা যেতে পারে। বিগত আড়াই বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভূমির ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছেন তা দেখা যাক।

এই আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে কৃষিজাত উপার্জনের আয়করের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন সম্পর্কে। এখন বর্তমান আইন অনুসারে আয়করের ব্যাপারটি পুরোপুরিই কেন্দ্রের আওতায়। রাজ্য সরকারগুলির সে ব্যাপারে কিছু করার নেই। কিন্তু তাই বলে কি রাজ্যগুলির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমাণ করেছেন যে উপায় আছে।

বিধানসভায় গত শরৎ অধিবেশনে তিনদিন আলোচনার পর একটি বিল পাশ হয় যার ফলে এই প্রথম ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে করের আওতায় আনা হল, যদিও এই করকে আয়কর আখ্যা দেওয়া হয়নি। বিধানসভায় জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি দুই কংগ্রেস ও জনতা দলের সদস্যদের প্রবলবাধাদানের সত্ত্বেও বিলটির ওপর আলোচনা হওয়াতে হলেও শুরু হয় এবং সভা এটিকে পাশও করে দেয়।

এই আইনের ফলে বাজনা দেওয়ার পুরানো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লোপ পেল। এই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে প্রধান অভিযোগ ছিল কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও বর্তমানে ভূমি সংস্কার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরীর বরাবরই আপত্তি ছিল। তাঁদের আপত্তির কারণও ছিল যথার্থ। জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি সত্ত্বেও দেখা গেল কৃষক যে খাজনা জমিদারকে দিত সেই খাজনা দিয়ে চলেছে সরকারকে। অর্থাৎ যে খাজনা আদায়ের মাধ্যমে জমিদার জমির উপর তার অধিকার বজায় রাখত, জমিদারীর অবলুপ্তি সত্ত্বেও সেই খাজনা থেকে যাওয়া মানে অনেক জমিদারের পরিবর্তে একজন জমিদারের উদ্ভাস, যে জমিদার সরকার নিজে। অপরদিকে কৃষকের অবস্থা যথাপূর্বং—সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল, জমির প্রকৃত মালিক হয়ে উঠতে পারল না।এবং

৫ অবিশ্বাস্য, তেমনি অবিশ্বাস্য চরণ মহিলার মেঝে পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার ইন্দিরাকে চন্দ্রশেখরের টে মি কো রে অভিনন্দন জানানো। অথচ দুটি ঘটনাই সত্য। এরকম আপাতঃ অবিশ্বাস্য ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে এবং দেশবাসী চোখকান বুঁজে মেনে চোখ বুঁজিয়ে যাবার ঘোষণা। এমন সব ব্যাপার রাজধানী দিল্লীর মত বেতুখাসের রাজনীতির শীতাগার ঘটেছে, চরণ প্রসঙ্গেও যেগুলির সত্যতা মেনে নিতে সহজ বুদ্ধিতে আটকায়। অথচ কোন ঘটনাই মিথ্যে নয়— প্রত্যেকটি ঘটনাই কাল হয়েই সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতায় অপরিবর্তনীয় রূপে লেপ্টে রইলো।

কে ভাবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে-চরণ সিং একবার ইন্দিরা গান্ধীর বিচারের জন্য স্যুয়েমবার্গ ধরনের আদালতের সুপারিশ করেছিলেন তিনিই কয়েক মাসের মধ্যেই এই ইন্দিরার সঙ্গে গোপনে পাঁঠছড়া বাঁধবেন সরকারে সমাসীন হবার জন্য? ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে চাওয়াটা কিছু মন্দ অভিপ্রায় নয়, সেটা প্রকট উচ্চাকাঙ্ক্ষা হলেও তার নিন্দে কোথে দেখি না; কিন্তু তার তাড়নায় সমস্ত রকম সম্ভব-অসম্ভব গোপন অগোপন উচিত অনুচিতের বেড়া ডেঙে চরণকুল দুবিবাবাদে গা ভাসিয়ে দিতে দুবে উৎকট কয়তাদিপার এর চেয়ে নির্লজ্জ রাজনীতি এই নির্লজ্জ দেশেও কি এর আগে খুব বেশী চোখে পড়েছে আমাদের স্মরণ কালের মধ্যে? ইন্দিরা গান্ধীর কথায় কী মূল্য যে তাঁর "নিঃশর্ত সমর্থনের" আশ্বাসে চরণ ভুলেছিলেন? এই অকল্পনীয় মিথ্যা কথা বলতে মুখে আটকায় শুধু সে তো একটা সুবিদিত তথ্য। তা যদি হয় তো তাঁর সমর্থনেরই বা কী দাম আর অসমর্থনেরই বা কী দাম? দাম যে বিশেষ নেই সে তো চরণ কয়তারোহণের চল্লিশ দিনের মাথাতেই হাতে হাতে বুঝলেন। তবে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কেন?

আর বলিহারি যাই জনতা পার্টিকেও। তাঁরা কী বলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন পাবার আশায়? দুই দলাতেই এ ব্যাপারে তাঁদের যেকর্ড ছিল। প্রথম দলাতে চি, এন, বেজয়াদীকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে যোয়াহাটি ভাইয়ের উলটপালটমান গলীকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে জনতার দুরদর্শিতার প্রকট হতে আমরা দেখলুম, দ্বিতীয় দলায় আদর্শের তড়াতুবি ঘটতে দেখা গেল যখন জগজীবন রামকে প্রধানমন্ত্রী বানাবার আগ্রহে পুরনো ইন্দিরা গান্ধীর দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো, এবার একপ্রকার প্রকাশ্যেই কোনরকম লুকোছাপার আশ্রয় না নিয়ে। যে-ইন্দিরা দুদিন আগেও অন্যত্র ছিলেন জনতালাভের পরেও তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে জগজীবনের বা বাধতে পারে, এককালের "তরুণ তুর্কী" চন্দ্রশেখরেরও বাধলো না এইটাই দরদের তাজ্জব। তাহলে কি বুঝতে হবে রাজনৈতিক শুভমিত্র কথাগুলি শুধু জনসাধারণেরই উদ্দেশে তাক করে প্রয়োগ করা হয় –কথাগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই?

## শত্রুমিত্রের তত্ত্ব

বলা হবে রাজনীতিতে স্থায়ি শত্রু বা স্থায়ী মিত্র বলে কোন কথা নেই। রাজনীতির সমরে আজকের শত্রু কালকের বন্ধু হতে পারে, কালকের বন্ধু আজকের শত্রু হতে পারে। কথাটাই বলে রাজনীতির কারবার আর কিছু নয়, ঘন ঘন সন্ন্যাসরোগ বদলাবার কারবার। এখানে সন্ন্যাসরোগ মুখ চেনবার প্রয়োজন হয় না, লক্ষণটাই আসল কথা। তা না হয় হলো। তা সে যদি নির্বাচনে ন্যূনতম গোত্রবত্তা বজায় রাখারও দায় থাকবে না এ কেমন কথা? তুললে চলবে না যে, জনতা পার্টি কয়তায় এসেছিল ইন্দিরার জরুরী অবস্থাজনীয় স্বৈরাচারকে নির্বাসনে তাদের দলের প্রধান নির্বাসনী ইস্যুরূপে ব্যবহার করে এবং সেই সমস্যের শাসন ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিতে। সেই জনতা দল কোন মুখে এবং কী যুক্তিতে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন যাচ্ঞা করতে এগিয়ে গিয়েছিল সাধারণ বুদ্ধিতে তার আদৌ কোন ব্যাখ্যা মেলে না। দিনশেষের হলে দিনেহারা হয়ে মানুষ এমন আচরণ তার পরে তার জন্য তাকে লজ্জা হয়। জনতা দলের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে তেমন লজ্জা-বোধের উদ্রেক হয়েছে, এমনও তার কোন প্রমাণ নেই।

এদিকে চরণ তাঁর দলের নতুন নামকরণে প্রস্তাব রাখতে গিয়ে নামের শেষে 'গান্ধীবাদী' কথাটা জুড়তে চান। গান্ধীবাদী হওয়া যেন দুখের কথা। সবাই গান্ধীর নাম ভাঙিয়ে তার থেকে কায়দা তুলতে ব্যস্ত। যে যত গান্ধীর আদর্শ থেকে দূরে তাঁর মুখে তত গান্ধীর বুলি। ইন্দিরাও গান্ধীর দোহাই পাড়েন, তাঁর নামে কসমটি খেয়ে। এ ঘটনায় হাসবে কি কাঁদবে বলতে পারিনে। পৃথিবীর সমাজতন্ত্রের চেয়েও এটা অধিক বিস্ময়কর সংকেত—এই ইন্দিরার মুখে গান্ধীর নামোচ্চারণ। একমাত্র বৈধায়িক সূত্রে নিজের নামের শেষে পাশী 'গান্ধী' পদবীর অপভ্রংশ গান্ধী কথাটা ব্যবহার করার অধিকার ছাড়া তাঁর গান্ধী নাম ব্যবহারের আর কোন হক আছে বলে দেশের লোক মনে করে না।

যাই হোক, ইন্দিরা প্রসঙ্গ থাকুক। চরণের কথা হচ্ছিল, সেই কথাতেই ফিরে আসি। চরণ গান্ধীবাদী মন তো আর কে আমাদের দেশে গান্ধীবাদী হবার যোগ্যতা রাখেন? যিনি বলছটের পাতাপিরোমণি,

পৈশুক হল থেকে মাঝারিব জোতাদির হাত ছাড়ি দেখিয়ে অনেককে তাদিয়ে নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী হবার লোভে হলমুটদের সাহায্যে নন্দা হল গঠন করেন, যুখে তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও শৈরতন্ত্র বিরোধী বলে আপনাকে প্রচার করলেও দেশের লোক সেকথা মেনে নেবে দেশের লোক এত হাবা নয়। তবতে পাই চরণ ব্যক্তিজীবনে দুর্নীতির উর্ধ্বে। দেকথা এক সময় সত্য হলেও হয়ে থাকতে পারে, এখন আর এই গৌরব তাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে মোরারজি দেশাই তাকে অবতা বলে ফিরিয়ে দিয়ে অকতর উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন সেই মোরারজির, বিরুদ্ধে হলের অভ্যন্তরে থেকেই অবিরত বতযন্ত্র করতে যাঁর বাধে না এবং অবতা হলকে ভাঙবার প্রেরণায় ইন্দিরার দলে অতি অযন্ত হবদের খাঁতাত করতে যিনি ইতস্তত: করেন না, তিনি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি না হন তো কে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এই প্রশ্ন অকতভাবেই করা যায়। যুখে যিনি বলেন রাষ্ট্রনারায়ণের আন্দোলনে তিনি অসংযোজন করেন না এবং রাষ্ট্রনারায়ণের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেছেন অবচ ভিতরে ভিতরে তিনি তাঁর দলকে অভিনবি হাসিল করবার জন্য আপাতদৃষ্টিতে শুভাবী মতলবে পরিপূর্ণ এই হাস্তপ্রেরণ সঙ্গেই চক্রান্তে লিপ্ত থাকেন, তাঁর নীতি নিষ্ঠায় আরও আস্থা থাকতে পারে কি? যেন শুক তেমনি তার চ্যালা। অবিশ্যি অকচর হালাদুলাল বক্সী। বক্সীর মতে এখন একটা কুস্তী যুটলেই যোলকলা পূর্ণ হয় হনুমানের তাই আমদানি।

## অশ্রুবের পশ্চাদ্ধাবন

সি পি এম দলের সরকারতীয় নেতৃত্ব—যার ভিতর আপাতদৃষ্টিতে রামমূর্তি হরকিষণ সিং সুরজিৎ মানুষ্টিপাদ প্রমুখের কৃষিজাটাই প্রধান বলে মনে হচ্ছে—সংকটের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন পরেই স্থির বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন এমন কথা বলা চলে না। তাঁরা নিজের যোদ্ধব্যবসায়ের আগে নিজেরাই বন্দী হয়েছেন এবং একাধিকবার সংকর পরিবর্তন করেছেন। একটি সুসংহত আদর্শানুগত সরকারতীয় দলের নেতাদের পক্ষে কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকরণের এই দ্বিধা তাঁদের সুনাম বৃদ্ধি করে না বরং তাঁদের অব্যবস্থিতচিত্ততারই পরিচয় দেয়। প্রথমে চাবনের অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন জানানো হবে না বলে স্থির করে

পরের দিনই সব পাত্রটে সমর্থন ঘোষণার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ের অধিরচিত্ততার পরিচায়ক। জনতা সরকারের প্রতি আটাশ মাস যে-দলের নিরপেক্ষতার মনোভাব অক্ষুণ্ণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার কল্পিত অথবা বাস্তবায়িত অভিযোগে হঠাৎ তাড়াহুড়ি সে-দলের পক্ষপাত জনতার কক্ষচ্যুত হয়ে একটি চরমের দিকে সবেগে ধাবিত হওয়ার সিদ্ধান্তে যা আছে যুক্তি বা আছে দূরদর্শিতার সুযোগ। এ এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গেরও ব্যাপার, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সি-পি-এম নেতৃত্ব চালিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি মোরারজির মনোভাব বরাবর অনুকূল ছিল, অন্ততঃ বিরূপ ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেই মোরারজির শেষ মুহূর্তের একক আবেদন অগ্রাহ্য করে চরণের ঝোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তে যা পাওয়া যায় মানবত্তার পরিচয় না পাওয়া যায় বাস্তববুদ্ধিরও পরিচয়। ভোটা বুদ্ধির হিসাবটাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। বাস্তববুদ্ধির অভাব এইজন্য বলছি যে, এতে করে পশ্চিমবাংলায় ও ত্রিপুরায় সরকারকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা হয়েছে। উত্তর ভারতে কতকগুলি অনিশ্চিত আসন লাভের আশায় নিশ্চিত সুবিধাকে খরচের খাতায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। একেই বলে অঙ্কের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ফলের বিনষ্টি। এমনতর আঙ্কিক গণনায় কম এবং অঙ্কে দুই-ই বড় হয়ে যেতে পারে সে-সম্ভাবনা রয়েছে পুরোমাত্রায়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাকে ইন্দিরা সংকটের মোচ্চার ছিলেন তার কারণ হতাবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ করে ক্ষমতার পাদপ্রদীপের আলোকে ফিরে আসার এই তাঁর সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর আগ্রহের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু সি পি এম-এর আগ্রহের কারণ বোঝা যায় না। উত্তর ভারতের কিছু এলাকায় জনতা (এস) আর কংগ্রেস (আ)-এর সঙ্গে সমঝোতা করে দলের ভিত্তি সম্প্রসারণের যদি কিছু ক্ষমতা বৃদ্ধিই যদি তার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডাকার একমাত্র কারণ হয় তাহলে বলবো সি পি এম নেতৃত্ব এই ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা একদিকের লাভের অঙ্কটাই দেখেছেন, অন্যদিকের ক্ষতির সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখেন নি। রাজনৈতিক অস্থিরতার তীরফলের চাকে ঘা দিতে গিয়ে তাঁরা নিজের পায়েই নিজে কুড়োল মারার উপক্রম করেছেন। এ প্রশ্ন নিজের কবর খোঁড়ার সামিল এক অবস্থা। কেন যে তবু বলি

সাম্প্রতিক ঝামেলা থেকে সরকারের লাভবান যদি কোন দল হয়ে থাকে তো সে ইন্দিরা কংগ্রেস দল। ইতিমধ্যেই এই দলের তহবিলে জল পাওয়া যায়। বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে এবং আগামী নির্বাচনের অবশ্যম্ভাবী ঘর ভোট বাঁধা


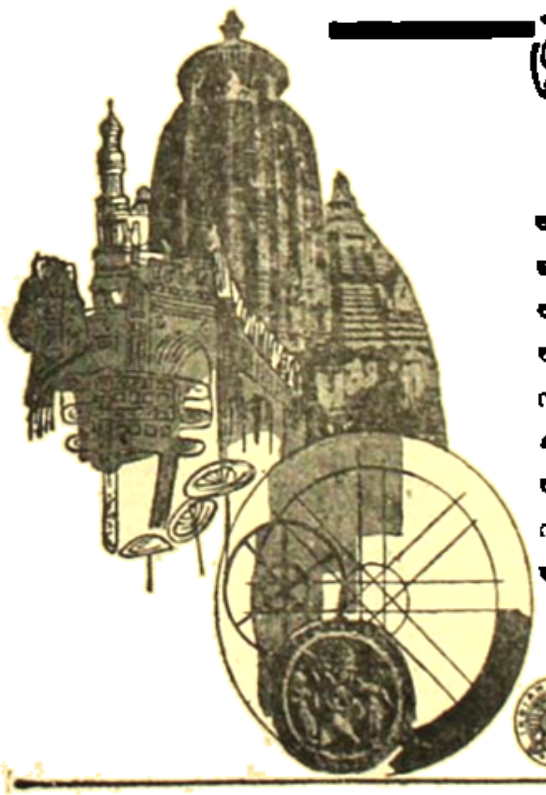

ঐক্যের চক্র

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয়দের [illegible]
ভারতের সুমহৎ সংস্কৃতি [illegible]
আকৃতিগত পার্থক্য [illegible]
অন্তর্নিহিত প্রবাহ [illegible]
দেশবাসীকে এক ও অবিচ্ছেদ্য [illegible]
এই সাংস্কৃতিক সংহতির ভারতীয় রেলওয়ের
প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল ও [illegible]
[illegible] এক প্রান্ত
[illegible] প্রান্ত—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—
ভারত ভারত রাখী বাঁধা চলেছে রেলওয়ে চক্র।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

বীথির ঘোষ-বিরোধের ফলে ইন্দিরা যদি কোনক্রমে ক্ষমতায় পরীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন তাহলে প্রথম কোপেই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারকে তিনি ফোপল করবেন—এ ব্যাপারে ঘোরতর অংকশাস্ত্রীয় নির্ধারণ ছাড়া বলে দেওয়া যায়। আমাদের অতিপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে বাঁচার পথ রেখে দি পি এম এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উঠে পড়ে লেগেছেন—এ ফোনক্রমেই সহ্য করা যায় না। রামমূর্তি কিংবা হরকিষণ সিং সুরজিতের পশ্চিম-বাংলার অথবা ত্রিপুরার কোন কিছু হারাবার ভয় নেই, তাই তাঁরা এখন অকৌশলে জনতা (এস) ও কংগ্রেসের সঙ্গে হর-কথাকষির খেলায় মেতেছেন। কিন্তু আমরা পশ্চিম-বাংলার মানুষ এ দৃশ্য চোখ চেয়ে দেখতে পারছিনে, যথাসময়ে নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে ততই আমাদের চিত্ত প্রতি পলকে পেলবতায় ভরপুর করছে। উত্তর ভারতের বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শক্তির জন্যটা কী পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে জানি না কিন্তু পশ্চিম-বাংলা ও ত্রিপুরার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে সে লক্ষণ অতি স্পষ্ট।

## স্বৈরতন্ত্রের বিপদ প্রধান বিপদ

সুতরাং কী করবার ছিল এই মুহূর্তে ছিটাবন্ধাকে আমূল নাড়া দিয়ে জল ঘোলা করার। আরও বিস্তৃতির জনতা সরকারকে সবল খুশিয়ে শক্তিশালী করার দায়টাই কি সি পি এম ও অন্যান্য বাম দলগুলির উচিত ছিল না? জনসঙ্ঘ ও আর এস এস-এর অন্তত মিতালি ব্যাপার ছিলিন সে কথা এককোথায় মানব এবং হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ যে একটা অত্যন্ত অতিচিন্ত্য তত্ত্ব সে কথাও অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু কথা এই যে, এই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ অপেক্ষা স্বৈরতন্ত্রের বিপদ অনেক বেশী বাস্তব অনেক বেশী গুরুতর অনেক বেশী অবধারিত। ইন্দিরা ক্ষমতায় এলে [illegible] করবেন আর কী করবেন না তা বেতারাজের অন্তর্যামীরও জানা অসাধ্য। সুতরাং সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতার ভয়ের কথা পরে ভাবা যেতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতার ভূত যারা ভয়ে যারে দেখতে পাচ্ছি তাকে বশমানা দিয়ে বশিয়ে রাখা যেতে পারে কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নের সমাধান হয় না। গত কিছুকালের মধ্যে দেশের যারা স্থানে যে সব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে তার সব কটিরই মূলে জনসঙ্ঘ আর এস এস-এর কারকতা রয়েছে তার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এই যাবদে জনতা পার্টিকে নিশ্চিত দায়ী করে তার উপর থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেওয়ার যৌক্তিকতা দেখা যায় না। কংগ্রেস (আই), কংগ্রেস চরণের জাঠ জোট, ডিমাপ সম্মিলন ইত্যাদি ঘুরানী দল ও জোটগুলি যে এই সব বিষয় ঘটবার পিছনে শক্তির নেই তার নিশ্চিত প্রমাণ কে দাখিল করবে? বিহারে ইন্দিরার দল হারা যাবার চেষ্টার ছিল তার অজাটা ধরিল পাওয়া গেছে। নরীয়ার (চাপড়া) হাঙ্গামার পিছনে দুই সম্প্রদায়ের সমাজবিরোধীদেরই ভূমিকা ছিল প্রধান, আর এস এস এর জিনীয়ামাত্রও ছিল না। সুতরাং প্রতি হাঙ্গামাহাঙ্গামার পিছনেই জনসঙ্ঘীদের হাত আবিষ্কার করতে যাওয়া নিরপেক্ষ রাজনীতির পরিচায়ক নয়। দুর্মুখকে ঠাসীতে ঝোলাতে হলে তাকে একটা বদনাম দিয়ে ঝোলাতে হয়, জনতা দলকে নির্বাসনে পাঠাবার মূলে যার দলগুলির মনস্তত্ত্বে এখনতর মনোভাব কাজ করছে কিনা সেটা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়েই রইলো।

দেখে শুনে মনে হয় অন্য বাম দলগুলির অতীত এতে সিদ্ধ হোক বা না হোক, সি পি আই দলটির অতীত এতে সিদ্ধ হয়েছে। কেননা এই দলটি জনতা পার্টি সরকার আসার পর থেকেই তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতা বৃহৎ পুঁজিপতির অভিযোগ চালিয়ে এসেছিল এবং ইন্দিরার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওই সরকারের পতন ত্বরান্বিত করে আসছিল। জনতা সরকারের পতনে ওই নীতির ধারাবাহিকহীন সঙ্গীবাদ দলটির মনস্তাপ পূর্ণ হয়েছে। অন্যান্য বাম দলগুলি বুঝে-না বুঝে ওই দলটির কৌশলের শিকার হয়েছে। সি পি এম-এর মত এমন বুদ্ধি-সচেতন সজাগপ্রাণ রাজনৈতিক দল সি পি আই-এর মত যন্ত্রের অনুলিহেলনে ওঠ-বোস করা এবং ইন্দিরার সঙ্গে এখনও গোপন মিতালিতে আবদ্ধ একটি সার্থসর্বস্ব দলকে তার হাতে তাবাধ খেয়ে যেতে দিল—এইটাই বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে শোচনীয় দিক।

# রাজনীতি ও জনসাধারণ

## নারায়ণ চোধুরী

দেশের সাধারণ মানুষকে যত বোকা মনে করা হয় তত বোকা তারা নয়। রাজনৈতিক দলগুলির এবং ওই সব দলের নেতাদের কার্যকলাপ তারা প্রায়শঃ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে। কিন্তু যেহেতু জনসাধারণের কোন সংবেদ্য অ্যাটেনা বা কোয়ার্স নেই যেখান থেকে টাঙিয়ে তারা কথা বলতে পারে বা তাদের মতামত জানাতে পারে, সেই কারণে ফুল ফুটে তারা হয় তারা অচেতন বা মূক বা দেশের সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ে নিস্পৃহ। মোটেই তা নয়। মোটেই তা যে নয় তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে। আর একবার দেখবার অপেক্ষায় আছি আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময়, যে নির্বাচন ডিসেম্বর মাসের শিতর শেষ হওয়ার কথা।

### উৎকট ক্ষমতার লালসা

গত চার-পাঁচ মাস ধরে রাজধানী দিল্লীতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির কাণ্ডকারখানা যা দেখা গেল তাতে অতি বড় সরল মানুষেরও চক্ষুস্থির হবার যোগাড়। দুর্ভাগ্য দলের ছুনীতি, দল ভাঙা ভাঙি, আয়ারাম-গয়ারামের খেলা, কালো টাকার লেনদেন, পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি ইত্যাকার নানা রকমের কদর্য আচরণ উৎকট ক্ষমতার লালসাকে কেন্দ্র করে এমন নির্লজ্জভাবে অবারিত হয়ে পড়েছিল এই সময় যে, এ দেশ যে প্রাক্-স্বাধীনতা অধ্যায়ে দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চলা কালে এক ধরনের তাগ নিঃস্বার্থতা ও সংযমের আদর্শে চালিত হতো সেটা বোঝবার কোনই উপায় ছিলনা। যে সব মূল্যবোধ আমরা এতকাল বরণীয় ও অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে এসেছি, সেগুলিকে প্রকাশ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের সমাধিভূমির উপর হলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের ধ্বজা এমন উদ্ধত ভাবে উত্তোলিত হতে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। দেশের চিত্ত একটা কথার কথা, নিজের ও নিজের আপন জনদের হিতটাই যে সবচা দেশচিত্তের বলয়ে মূল প্রেরণা রূপে কাজ করে—এই বিধি এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে অলিখিত আকারে প্রচলিত ছিল, এখন সকল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একেবারে কেন্দ্র জুড়ে বসেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলির মূল নিয়ামক নীতিরূপে অলিখিত থেকে লিখিত আকার লাভ করে জনজন অক্ষরে মুখব্যাদান করে রয়েছে। এদের প্রতিটি কাজের চিত্তর এখন এই এক নীতিরই প্রাধান্য—অন্য কোন নীতির বালাই নেই।

জনতা, জনতা দল থেকে বেরিয়ে আসা জনতা (এস), কংগ্রেস, কংগ্রেস (আই) এ-আই-সি-এর কে, আকালী, সি-পি আই, সেমাই অ্যাণ্ড ওয়াকার্স পার্টি কর্ণাটক কংগ্রেস —প্রত্যেকটি দলতান্ত্রীয় বা আঞ্চলিক দলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে নিকট ভবিষ্যতের সুবিধাবাদের কালো কালিতে কালিমালিপ্ত। এমনকি সি পি-এর দলও এই তামাতোলের মধ্যে থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই দলের আদর্শনিষ্ঠার খ্যাতি ছিল পৃথিবীর সমাজতন্ত্রবাদ ও দলীয় শৃঙ্খলার জন্য এই দল বিরুদ্ধবাদীদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। কিন্তু অধিক্ষের দলেও এ কথা আর বলে পারা যায় না যে, সি-পি-এর-এর সেই সর্বজনস্বীকৃত উজ্জ্বল ভাবমূর্তির গায়ে কিছুটা কাদা লেগেছে তাতে দলের আভার আইডেন্টিটি বা দলীয় নেতৃত্ব মোকদ্দমায় চাবন করুক অন্যান্য দলগুলির মোটিভ আরী হওয়ার কাল থেকে ঐ পর্যন্ত পরিস্থিতির মেজাজে মোকাবিলা করবার চেষ্টা করেছেন তার ভিতর অস্থিরতা, অসংলগ্নতা, বিশ্বাসভঙ্গ, আশ্বাসের ফোড়, ফুটিয়োরা সব কিছুই প্রকাশ পেতে পারতো বেশ। অধিকন্তু অন্যান্য এইসব উদ্দেশ্য দুরাশা বেশ কিছুটা চরিতার্থ হয়েছে এ কথা না বললে সত্য গোপনের দায়ে পড়তে হবে

### অবিশ্রান্ত নটনার মেলা

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কতকগুলি সুচিন্তিত মত ও পথ থাকে, যার দ্বারা সেই দলকে অন্য দল থেকে পৃথক করে দেখা যায়। বস্তুতঃ সেই পৃথকটির মূল নীতি যেখানে নুন হয়ে গিয়েছে। অথচ যে থাকায় ও অথচ অথচ দলের চক্ষুরুন্মীলনী দৃষ্টিভঙ্গির পাকে পড়ে দলগুলির মধ্যেকার ভেদবিভেদ ঘুচে গিয়ে সব দল অথচ-বৃথচার ভরিবদলের মেলায় একাকার হয়ে পড়েছে। যে যে কোন্ দলের ছিল আর কে যে অধিক কিছুই বোঝবার যো নেই জনসাধারণের সবচেয়ে বড় মুশকিল হয়েছে এই যে, তাঁরা চরমতম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে—এমন সব দলের সমস্যের মধ্যে অথচাতা দলা-সমাধর্ম প্রতিযোগিতা চলছে আর ভোট চাওয়া হচ্ছে বা ভোট বাগাতে চাওয়া হচ্ছে, কোন অঙ্কের হিসাবেই যেসব দলকে পরস্পরের কাছাকাছি করা যায় না। সমস্ত শাসীর সঙ্গে রাজনারায়ণের যেন তুলনা গোপন রৈখিকে মিলিত হওয়াটা যেমন

পাওয়ার হার একই থাকার ফলে বহু চাষীর হল পাকে পাঁচ না আখিয়ে বেশ পাকিতেই ছিল।

যে নতুন আইন হতে চলেছে তার ফলে প্রথমেই যেসব চাষীর জমির হার পঞ্চাশ হাজার বা তার কম তারা কোন রকম করের আওতার মধ্যে আসবেন না। জমির ক্রয়মূল্যের মূল্য অনুযায়ী এর দ্বারা উপকৃত হবেন এমন চাষীরা যাদের সত্তরভাগ জমি চার একরের বেশী নয় এবং এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা চাষীদের আনুমানিক পঁচিশ ভাগ। এঁরা হলেন ছোট ও প্রান্তিক চাষী।

পঞ্চাশ হাজারের বেশী যে জমির দাম তার এক দশমাংশের উপর কর ধরবে। যেমন যদি জমির মূল্য হয় পঞ্চাশ হাজার তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার উপর কর ধরবে। যেমন জমির দাম বেশী হবে তেমন করের হার বাড়বে যার ফলে এই করের সিংহভাগ আসবে হবে জোতদার শ্রেণী থেকে, যাদের উপার্জন ধরনাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সেচের জল, আরও উন্নত ধরনের বীজের যৌলত্বে। জমির মূল্য নির্ধারণের সময় শুধু তার আয়তন দেখা হবে তা নয়, তার সঙ্গে বিচার করা হবে তার অবস্থিতি, কি ধরনের শস্য সেখানে উৎপাদিত হয় এবং তার বাজার দর এবং তা বাজারীকৃত করার সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে সহরাঞ্চলের সম্পত্তির ভ্যালুয়েশনের নীতিই অনুসৃত হবে গ্রামীণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে। একদিকে যেমন মাঝারি ও বড় চাষীর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হল অপর দিকে তেমনি দাম আরের একাংশের উপর এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও বৃহৎভাবে সরকারের হাত পড়ল। যে সম্পদের উপর এতদিন সরকারের কোন অধিকার ছিল না এখন নতুন ব্যবস্থার ফলে সেই সম্পদের একটা অংশ পাওয়া যাবে গ্রামের জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে সংবিধানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতন পশ্চিমবাংলারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি চাষ হয় বর্গা অথবা জোতদার প্রথায়। ১৯৭৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট হয় জমিদারের দল যারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা সরকারকে জমা দেওয়ার পরিবর্তে লাভ করলেন প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালানোর এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণের সম্পূর্ণ অধিকার। সময় পালটেছে কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের প্রায় দুশো বছর পরেও এবং ইংরাজ শাসনের অবসান সত্ত্বেও সেই শোষণ রয়েছে অব্যাহত। আজ থেকে ৩১ বছর আগে চাষীর জমিদারের হিসেবে যেভাবে জোতদারী তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন থেকে জোতদারী উৎখাত শুরু হয়। এই প্রতিবাদ স্বরূপ অধিবক্তা বাংলার শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হল বর্গাদারের অধিকার রক্ষার্থে বিশু আইন এবং জোর করে জোতদারী উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হল। এই প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তার চার বছর পর জমিদারী দখল আইনে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা হল।

কিন্তু এ সবই হল শুধু নামে। বর্গাদারের পক্ষে বার এমন কোন আইন স্বাভাবিক-ভাবেই জোতদারের অত্যাচারের বিপক্ষে।

সমবায় আন্দোলনের সাহিত্যবাহন
কবিতার প্রেমিক

'ভাণ্ডার'

নবকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে।
দেশ বিদেশের সমবায়ের কথা গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে দেবার একমাত্র বাহন
'ভাণ্ডার'

'ভাণ্ডার' আমাদের সকলের
'ভাণ্ডার' পড়ুন ও পড়ান
গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, ভাণ্ডার,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা ৮০০ ০০১

সমবায় উন্নয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন,
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

কিন্তু যেখানে জোতদার ও সরকারী প্রশাসন একই শ্রেণীভুক্ত সেখানে এই আইনের সঠিক প্রয়োগ ঘটবে এটা আশাই অন্যায়। তাই বিভিন্ন আইন সত্ত্বেও বর্গাদার ঠকানো বর্গাদার উচ্ছেদ সমানে চললো।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলেই প্রথম ভূমি সংস্কার, বিশেষ করে বেনামী জমি উদ্ধার করা এবং বর্গাদার ক্ষেতমজুরদের অধিকার রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা চালানো হয়। তবে এই দুই মন্ত্রিসভা বেশীদিন স্থায়ী না হওয়ায় এ কাজে বেশী-দূর অগ্রসর হওয়া যায়নি। অবশ্য একটা ব্যাপার ঘটেছিল, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন জেলায় লুকোনো জমি নিজেরা খুঁজে বের করে চাষ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই জমির অধিকার তাঁরা অনেকাংশে হারালেও তাঁদের চেতনার বিকাশ রোধ করা সম্ভব হয়নি। দু বারের ভোট বাইশ মাসের যুক্তফ্রন্টের শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এইখানেই।

১৯৭৭ সালে তৃতীয় বিল যাযফ্রন্ট সরকার। নিজেদের অনেক বেশী সুসংহত অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই সরকার বর্গাদারের অধিকার রক্ষার জন্য যে আইন করলেন তার গুরুত্ব অনেকখানি। এই আইনের একটি প্রধান দিক হল যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত বর্গাদার নয় একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব জমির মালিকের উপর বর্তানো, অর্থাৎ যেদিন থেকে সেন সরকার এককলমের খসড়া থেকে উৎখাত করে দিয়ে বলা হত যে যদি পারো সে যেন আদালতে প্রমাণ করে যে সেই প্রকৃত বর্গাদার। বর্গাদারের অধিকার রক্ষার জন্য জমির মালিককে আরও বলা হল যে তাকে ফসলের অংশপ্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ রসিদ দিতে হবে। অন্যথায় জেল জরিমানা ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হল।

এরই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অপারেশন বর্গা বা সরকারী উদ্যোগে সেটেলমেন্ট খতিয়ানে বর্গাদারের নাম লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড করা। বর্তমান আইন অনুযায়ী এইভাবে নাম রেকর্ড করা থাকলে কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপারেশন বর্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে জোতদার শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এই কাজ বানচাল করার জন্য সবরকম চেষ্টা হতে থাকে এবং হচ্ছেও। যেসব অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন দুর্বল সেখানে বর্গাদারদের বোকানো হয় যে নাম লিপিবদ্ধ হলে তাদের বিপদ ঘটবে। তবে এ সত্ত্বেও বর্গাদাররা এগিয়ে আসছেন এবং নাম রেকর্ড করাচ্ছেন।

আমাদের দেশে ছোট চাষীর উপর জোতদারের অর্থনৈতিক শোষণের একটি প্রধান দিক চড়া হারে ধার দেওয়া, যে ধার শোধ করতে বহু ছোট চাষী পরিণত হয় ক্ষেত-মজুরে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়া সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে গরীবদের জন্য দেওয়ার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যাযফ্রন্ট সরকার আসার পর এই প্রথম এদিকে নজর দেওয়া হয় এবং আগামী বছর মধ্যে আনুষ্ঠানিক এজেন্সি বর্গাদার এই ঋণ পাবেন। সংখ্যার দিক থেকে ঘটনাটি খুব বড় না হলেও মহাজনী শোষণের হাত থেকে গ্রামের গরীব মানুষকে রক্ষার কাজে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যত বর্গাদারকে জোতদার মহাজনের হাত থেকে বের করে নিয়ে আসা যাবে ততই সে সাহস পাবে যারা তুলে চাপিয়ে নিজের প্রকৃত অধিকার বুঝে নেওয়ার বৃহত্তর সংগ্রামে শিল্প হতে।

আইন তৈরী করা এবং তা প্রয়োগ করা মোটেই সহজ নয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতিরোধ যে শুধুমাত্র জোতদারদের কাছ থেকেই আসে তাই নয়, প্রতিরোধ আসে প্রশাসনের মধ্যে থেকেও। তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ এই সমাজ ব্যবস্থার যখন ভবিষ্যতিটা সরকার গঠিত করেন তখন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতাকে বাড়িয়ে তুলে তার রাজনৈতিক সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ জানেন সরকার তাঁদের জন্য কি করতে চাইছেন এবং কোথা থেকে বাধা আসছে। যত দিন যাবে ততই এই প্রতি-রোধ বাড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা অতিক্রম করার সংগ্রাম। ফলাফলে এই সংগ্রাম সফল হোলাই হবে বামফ্রন্টের সার্থকতা।

# আমাদের অগ্রসৃতির পূর্বশর্তগুলি

## গুরুদাস ভট্টাচার্য

বছরখানেক হল, ইউনাইটেড নেশনস-এর 'কনট্রাকটর রাইটার' হিসেবে 'প্রচার-সামগ্রী' তৈরির কাজে লিপ্ত আছি। ইউ, এন,-এর নিজস্ব লিটারেচার। অর্থাৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নেই এর রিপোর্ট ও ডেসপ্যাচ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কনফারেন্সের প্রতিবেদন, বিভিন্ন 'এজেন্সী' বা উপসংস্থার (ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ও, ই এস সি···) গবেষণা-ফল—ইত্যাদির ভিত্তিতে আমাকে তৈরি করতে হয় প্রবন্ধ-সূচীপট, ইংরেজিতে। যতো পড়ি, ততো অবাক হয়ে যাই: মানুষ নামক জাতির খাওয়া-পরা থাকা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানান সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, কী বিপুল পরিমাণ কাজ চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে, জাতিসংঘের প্রেরণায় ও প্রযোজনায়, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক, উভয় ক্ষেত্রেই! বাস্তব তথ্য এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ফলিতগুলিতে ওতঃপ্রোত। তার মধ্যে আছে এমন এক-একটা নিটুট উচ্চারণ, গতকাল আজ বা আগামীকালের ইতিহাসে যা নিখাদ সত্য বলে প্রমাণিত।

যেমন: অনুন্নত/উন্নতিশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান প্রসঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু ক'রে ঔপনিবেশিক শাসন, তাকে পেরিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর দিন-রাত্রি—তথ্যের পর তথ্য সাজানো, বিশ্লেষিত, এবং শেষে, পর্যবিক্ষণের সংকেত। এই সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করেছি—আমাদের অগ্রসৃতির পূর্বশর্তগুলি। যা পাঠ করার সঙ্গে-সঙ্গে চতুষ্পার্শে তাকালেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সত্যান্বেষণের কারিক।

।২।

প্রথম শর্ত: অনুন্নত/উন্নতিশীল দেশগুলির পরিবেশ অর্থাৎ রাজনীতিক-অর্থনীতিক শক্তি ও সংস্থাগুলিকে হতে হবে অগ্রসৃতির অনুকূল; এবং সেই অনুকূল পরিবেশে দেশবাসীর মনে জাগ্রত হতে হবে অগ্রসৃতির বাসনা। (২) এই বাসনা জাগবে তখনই, মানুষ যখন বুঝতে পারবে এই সৃষ্টি তথা প্রকৃতির তপস্যা বিফল, আরো অনন্তর নয়, অর্থাৎ দৃষ্টি হবে বিজ্ঞানসম্মত এবং কার্যধারা হবে নিরীক্ষামূলক; যে-দেশে এই স্তরের শিক্ষা যতো বেশি, সে-দেশের উন্নতি ততো দ্রুত ও অধিক হবে। (৩) বাসনা আছে, মানুষের ক্ষমতায় ও সৃষ্টিতে বিশ্বাস আছে, তবু অনেক মানুষ কর্মতৎপর হয় না; তার কারণ—অন্তর্হীন অলসতা ও বিলাসিতা; অন্য কারণ—অন্ধ্যাত্ম বা যে নিষ্ক্রিয়তা, ভাগ্যবাদ, যার ফলে আগতিক উন্নতিকে মনে হয় অন্তবাদী ক্রিয়াকলাপ অতএব পরিত্যাজ্য। এই আলস্য ও অন্ধ-নিষ্ক্রিয়তা ছাড়তে হবে। (৪) অনেকে আবার আত্মিক প্রবন্ধে, অর্থাৎ পারলৌকিক মঙ্গলের আধ্যাত্মিক ধর্মাচারে অবলম্বন বলে মনে করে, বেশি ধর্ম বোধ অবতার পক্ষপাতে। এই দোষার চার্চেজ্ঞানাদের বর্জনাতে হবে দৃষ্টিভঙ্গিতে। (৫) পুরুষ, অর্থ ও ক্ষমতা একত্রিত হলেই যে উন্নতি অবধারিত, তা নাও হতে পারে, নানা বাধা থাকতে পারে, যাদের পেরিয়ে যেতে হবে। (৬) যেমন: শাসনযন্ত্র যদি দুর্বল হয়, দেশে অশান্তি-অরাজকতা বিরাজ করে, হানাহানি-মারপিট চলতে থাকে। তেমনি শক্ত আইন-শৃঙ্খলা; (৭) ঠিক একইভাবে, পরিবারিক অশান্তি-অসাম্য ও অন্যোন্যোগের উৎসাহ নিভিয়ে দিতে পারে; এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। (৮) বাস্তব ও মানসিক তথা মিশ্র অর্থনীতির সাম্য অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো থাকতে হবে। (৯) প্রচলিত আইনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে ও যখন অ নি বা র-জো ত দারের স্বার্থের বা হ ন হয়ে ওঠে তার বাধা-উপধারা। এদের বদলাতে হবে জনগণের স্বার্থে। (১০) সামাজিক বিধি-বিধানও অনেক পিছিয়ে পড়া দেশে নতুন পথ ও পদ্ধতিতে মানুষকে যেতে দেয় না। ধর্ম-ব্রত-কুসংস্কার দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখে। এদের থেকে সাবধান হতে হবে। (১১) জাত-পাত-সম্প্রদায়ের বাছবিচার ভাগাভাগি যেখানে, অর্থনৈতিক অসততা যেখানে, যেখানে একমুঠো মানুষ শোষণ করে সংখ্যা-গুরু জনগণকে, সেখানে সমাজ শুধু ঘুরপাকই খায়, এগোয় না—না অর্থে, না সাম্যে। সামাজিক বিবর্তন তাই অপরিহার্য। (১২) অনগ্রসরতার অন্যে দায়ী সেই সব অ-বিজ্ঞান, যেখানে কৃষকের মজুরি, হরিজনের মহাজন হওয়া নিষেধ, মানুষ চিহ্নিত হয় সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, সংকীর্ণ রাজনীতি

উৎসাহ দেয় দলবাজীতে, আত্ম-বেচাকেনার হিসেব করে! এর জন্যে প্রয়োজন সমাজের চরিত্র-বদল। (১৩) একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতি বা মূল্যবৃদ্ধি চাপসৃষ্টি। উভয়ই খসড়া করা হতে থাকে মুষ্টিমেয়ের হাতে, যারা পায় সামগ্রিক উন্নতি। এই নীতি ও চাপের অবসান ঘটাতে হবে। (১৪) সার্বিক উন্নতি যদি সত্যিই কাম্য হয়, তাহলে পুরনো তত্ত্বকথা সব ভুলে যেতে হবে। জীর্ণ সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে হবে, জাতি ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের বাধাগুলিকে সমভূমি করে দিয়ে সমবেতভাবে এগিয়ে যেতে হবে; দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতির জন্যে উন্মুক্ত দ্বার দিতে হবে—প্রত্যেককে। (১৫) অধিকাংশ অনুন্নত দেশে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত, আপন স্বার্থ-রক্ষার্থে তারা দেশের স্বার্থকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়ে চলেছে। একমাত্র সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এর কোন প্রতিবিধান নেই। (১৬) এই বিপ্লব নির্ভর করে দেশনেতাদের ওপর: রাজনৈতিক নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সাংবাদিক, শিল্পপতি —এরা যদি দেশের আর্থিক-পারমার্থিক উন্নতি চান, এবং সমাজ গড়ার জন্যে উদ্যোগ নেন, যেখান থেকে সামাজিক-আর্থনীতিক-রাজনৈতিক, তাবৎ শোষণ চিরতরে উৎখাত; যেখানে সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব এবং জন-বাসনা যুক্ত, সেখানে কোনো সমস্যাই দুরারোগ্য নয়। নেতার অনুসরণ করে জনতা। নেতা যদি স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতিগ্রস্ত, জনগণ হয় চক্রে পিষ্ট হয়, অথবা বিমর্ষ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। নেতা যদি সত্যিকারের অগ্রগামী, সৎ, সমদর্শী ও নিঃস্বার্থ, জনতা সেখানে এমনভাবে জেগে ওঠে, গোটা দেশটা তরতর্ করে সামনে এগিয়ে চলে।

(১৭) তখন, পুরনো দেশের কায়েম শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করে চলে, নেশার ঘোরে যিরে সব-ঘুণী বাধা উপস্থিত করতে হবে। (১৮) দেশীয় সমস্যা ও প্রয়োজন যাচাই করে তৈরি করতে হবে সুপরিকল্পিত গ্রাম এবং তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। (১৯) এই প্রয়োগও হবে দেশজ জ্ঞান বিজ্ঞান কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে ও সাহায্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় হতে পারে, সব ক্ষেত্রে নয়। যেহেতু, উন্নত দেশের জটিল মেশিনসর্বস্বতা নয় ও কারিগরীর ভান নামলাবো অনুন্নত এমন কি উন্নতিশীল দেশের পক্ষেও সুবিধা হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, শাসনযন্ত্রকেও হতে হবে সৎ ও কর্মঠ। যে কোন দেশেই এই দুটো দুর্লভ গুণ, বিশেষত পিছিয়ে পড়া দেশে, যেখানে দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং দক্ষ টেকনোলজিস্ট, দুটোরেরই একান্ত অভাব। তবু, আশা এবং চেষ্টা করতে দোষ কী? উন্নতিকামী সরকারের তাই লক্ষ্য হবে কৃষির উন্নতি, শিল্পের সমৃদ্ধি, এবং তার জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হলে সুফললাভ অবশ্যম্ভাবী। (২০) এবং শেষ কথা: সদিচ্ছার আয়োজন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঘিরে জনগণকে জাগিয়ে তোলা যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে তাদের আত্মনির্ভর করা যায়, তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চাই ব্যাপক শিক্ষা, সমস্ত স্তরে। এবং তার জন্যে নেতার-চলচ্চিত্র-টি বি ইত্যাদি প্রচার-মাধ্যমগুলিরও নতুন চরিত্র গঠন একান্ত জরুরী।

।৩।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে লিখিত উপন্যাস 'ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল ডাউ-লিন'-এর প্রত্যাবর্তনে ইউনাইটেড নেশনস পৃথিবীব্যাপী বেকার সমস্যা ও তার সমাধান প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে কমিশন তার রিপোর্ট দাখিল করে। প্রথম কিস্তীতে ছিল উন্নতিশীল দেশগুলির পর্যবেক্ষণ। এই দেশ হিসেবে, দ্বিতীয় কিস্তায় কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়—উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে বেকারী ও তার মোকাবিলায় পথ সন্ধানে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন: আলবার্তো হোয়ারেস (চিলি), ওর্জ হাবিব (লেবানন), আর্থার লুইস (ইংলণ্ড), থিওডোর শুলৎ (শিকাগো), জি, এন, প্যাতেলিস (গ্রীস)। অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞানের বাঘা-বাঘা পণ্ডিত। ১৯৫১-র যে মাসে 'ইউ, এন, ডিপার্টমেণ্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স' এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় এঁদের সবসম্মত রিপোর্ট: 'মেজার্স ফর দি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ আণ্ডার-ডেভেলপড্ কানট্রিজ।'

একশো আট পৃষ্ঠার চালযুক্তা বই। কোন বিশেষ দেশ নয়, সাধারণভাবে উন্নতি-শীল / অনুন্নত দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য জনসংখ্যা-অর্থ ভা ভা ন-ভা ন ই ত্যা দি বিষয় ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বেকারীর উৎস ও তার নিরসনের সূত্র সন্ধান করা হয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গেই উত্থাপিত আলোচিত হয়েছে: অল্পস্বল্পতার পূরণতত্ত্বগুলি।

তারপর আটাশ বছর কেটে গেছে। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে, তার রজত বছর হল। ইন্দিরাদেবী, তার রাজনৈতিক মঞ্চে অভিনীত নাটকের দায়ভাগ তার নয়। তবু, আজও, আমাদের সমাজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, অর্থনীতি ক্রমশই নিষ্ক্রিয় হচ্ছে। উন্নতির পথ-পালন হয়ে যাক, রিপোর্টে বর্ণিত নেতিবাচক অবস্থানসমূহ এখনও অনেক জীবন্ত, অনেক সত্য! দুর্নীতি ও অসততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে কিসী চিত্তরঞ্জনের সচিত্র গল্পকথায় মজে গিয়ে রাজনৈতিক তারকাদের বিচিত্র কিস্সা-কাহিনী বাজারে হট্ কেক্ মতো বিক্রী হচ্ছে, এক বিন্দু ক্ষোভ্ কারো পড়ছে না ক্রোধও!

আমাদের স্মৃতি 'বা-পত্ত' (পত্ত সাপেক্ষ) নয়, 'বে-পর্দা' (পত্তবিহীন)। আমাদের স্মৃতি অগ্রমুখী নয়, পশ্চাৎমুখী। আমরা বিস্মৃত জাতি!

# কণ্ঠ ও বাদ্যধ্বনি

## সিপ্রিয়ান একোয়েনসি

কটন কারিকি থেকে দল বেঁধে বাইরের নদীর ওপর দিয়ে তারা ইয়ারে, ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ভেসে চলল, শেষে মোড় ঘোরল অনিটপার কাছে। কেরীঘোট থেকে রেকর্ডিং ভ্যানটা বাড়িয়ে দিয়ে পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে তারা মুকোয়েদের দিকে এগিয়ে চলল। পথে তারা মোটামুটি ঘুরাও ঘুমিয়েছে। আজ তিন দিনের ছিন্ন বিচ্ছেদে আলফ্রেড মহড়ান রেকর্ড করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। আগেভাগেই চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছে সে, ঘুঘেও বলে পাঠিয়েছে—এই ভেবে সে খুশি অনুভব করল। এতক্ষণে মিস্ত্রি তারা জেনে গেছে।

ঘরের ভেতরে ঢুকে মোড় নিতেই আলফ্রেডের মনটা হঠাৎ একটা অজানা দুঃখবোধে, একটা ধূসর একাকিত্বে চেতনা ম্লান করল। একটা ঠাণ্ডা জলকণা হাওয়া যেন তার শরীরটাকে ছেটে ভুবানো করল। মনে হল তার ভ্রমণত্যাগের পোশাকটি যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছে। তার কাজ দিয়ে তার অস্তিত্বের পবিত্রতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বাড়িতে রয়েছে তৈরী বাড়ী, পাকালু-মানবচুয় বাড়,জেরু কলাগাছে ছাওয়া এই তার যে-আবহ যার। সত্যি, ভগবান এ দেশকে ভরে দিয়েছেন ফলের গাছে। তার ডালপালা মেলে ধরেছে ঊর্ধ্বে, আর নীচে বাড়িয়েছে শীতল ছায়া—তাতে ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করে।

গলার কাছে একটা শিও পাকিয়ে উঠল আলফ্রেডের। চারধারে মেয়েদের দেখতে পেয়ে তার মনে পড়ে গেল টকোমা সম্পর্কে তার মা তাকে কি বলেছিলেন। এরাই কি সব বিবাহের 'ধূর্ণি' মেয়ে? পীনোন্নত পুষ্টিতন্বিনী মেয়েদের (ব্রাবার করসেটের প্রয়োজন হয় না) দিকথেকে আলফ্রেড তার সপ্রশংস দৃষ্টি এড়াতে পারছিল না। হল মেঝে যারা মহড়া দিচ্ছিল, মিস্ত্রি যেসব গান রেকর্ড করা হবে সেগুলিই। তাদের কথাবার্তা, খিলখিল হাসি এবং তড়াতড়ির আওয়াজ ভ্যানের পথকে ছানিয়ে উঠছিল।

রাস্তার মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল অসংখ্য শিশু। ছোটরাই অপেক্ষাকৃত ছোটদের কোলে পিঠে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের দেখাশোনা করছে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কুকুরগুলো এবং ব্যা ব্যা ডাকতে ডাকতে ছাগলগুলো ভ্যানের সামনে দিয়েই রাস্তার এপার ওপার ছুটোছুটি করছে। শিশুকাল থেকেই ছোটরা রক্তের আর গোলির সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েছে। ও তোমার বোন, ওকে আমটা একটু ছুলে দাও, ও তোমার ভাই, ওকে তীর ধনুকটা দাও, ওই ছুঁচুক। ওরা একসঙ্গে বড় হয়েছে, ভ্রাতৃত্ব আর আত্মীয়-তার বন্ধন হয়েছে দৃঢ়। আপন ভাইদের এবং সম্পর্কিত ভাইদের আইনের বাঁধন এড়াতেও সহায়তা করেছে কখনও কখনও। পরম আত্মগত্যের সঙ্গে তারা মিলেমিশে রয়েছে বাবা-মা-ভাই-বোনি মুড়ো-মুড়তুতো ভাই, ভাইপো ভাই কি সবার সঙ্গে। তৈরী

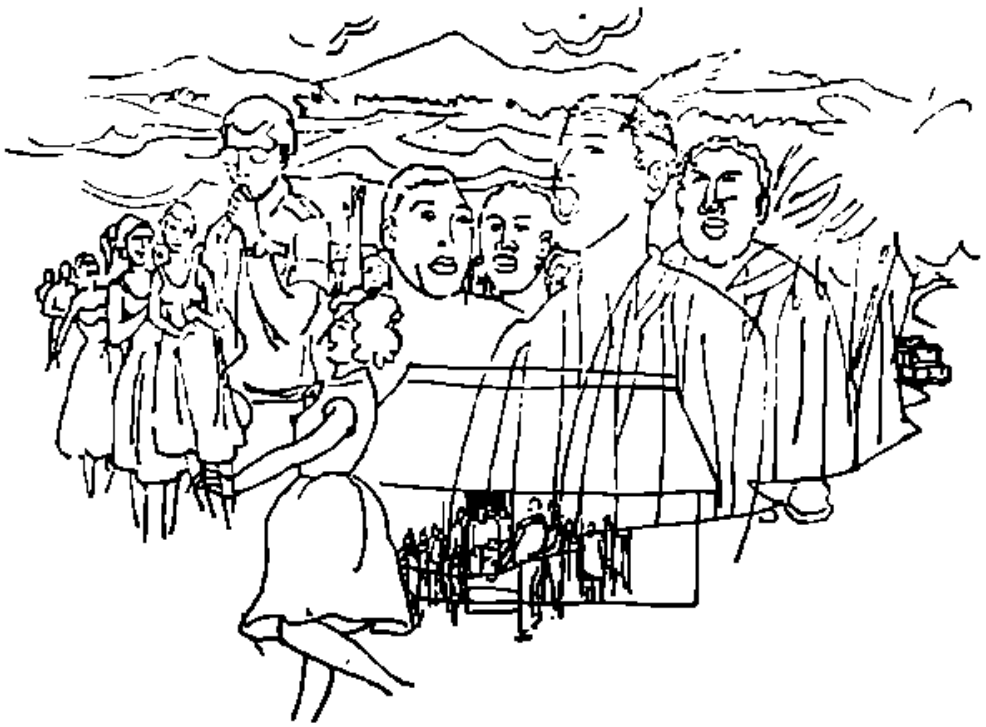

করেছে এক বৃদ্ধকে, এবং তারা মিলে তৈরী করেছে এক উপজাতিগত বৃত্ত। আলফ্রেড বাড়ীর বাইরে থাকে, মাঝে মাঝে মনে হয় ভালই হয়েছে, নইলে এত অসংখ্য আত্মীয়বর্গের সকলের সুখ সুবিধার দিকে দেখতে গেলে তাকে আর বাঁচতে হত না। বহু দূরে মাইল নদীপথে উত্তরে মোড়া-য়াতে সে ভালই আছে।

এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সে গুটিয়ে নিল। "আলফ্রেড, তোমার সময়টা তোমার কাছ হল এই গ্রামের আত্মাকে বাস্তবায় আর কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ধরে রাখা" নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিল। আফ্রিকার ভাষা, যে ভাষা কথা বলে, কিস কিস করে, যে ভাষা বাজে, যে ভাষা কাঁদে, যেভাষা দুঃখ করে, যে ভাষা ভালবাসে। কটি সন্তার ঘরটিও ঘরে যাও, গাছের তলায় ঐ মেয়েদের জন-তাকলি, ভুলে যাও কথকদের কথা···অন্তত এক মুহূর্তের জন্য ভোলো যে তুমি এদেরই একজন। নিজেকে মোহমুক্ত করো তুমি, তোমার নৈতিক বিবেকবোধই তোমাকে পরিচালিত করুক।

তারা প্রথমে এল ইকিতে গ্রামে, নুকোয়েলের পাঁচটি গ্রামের মধ্যে এটিই প্রথমে পড়ে। কাজেই লি-ই-ওজির থান —যেখানে দেবতার ভবিষ্যবাণী শোনা যায়। সে বাণীর "কালো পশমের" বিধান অনুযায়ী তার বিচার করা হয় গ্রামে। আলফ্রেড চট করে মোট করে নিল ব্যাপারটা। কালো পশমের পুরুতকে দিয়ে কিছু বলিয়ে নিতে হবে।

ইকিতে গ্রামে ঢুকেই তাদের দেখা হল এক তরুণ মাঠিয়ে হলের সঙ্গে, পায়ে তাদের ঘুঙুর বাঁধা, মাথাতে সোজা গাঁটের পালক। হাতা নাচিয়ে তারা গ্রামের মোড়ল এজোয়েন্সি একাগ্র গুণ কীর্তন করতে লাগল। আলফ্রেডকে তারা নিয়ে গেল নুকোয়েলের একের তৈরী এক বাড়ীতে; সেকথা পরে হবে, আগে ত আলফ্রেড এবং তার সঙ্গীদের আদর আপ্যায়ন করা চাই। সেটা করুক।

ওরা দুটো পাঠা নিয়ে এল, তার মধ্যে একটি দাদা—সৌভাগ্য ও দীর্ঘ জীবনের প্রতীক। আলফ্রেড ওদের কিছু পিছু একটা ধরে নিয়ে ঢুকল। সেখানে মোড়ল এবং অন্যান্য বৃদ্ধ প্রবীণরা পরম্পরা অনুযায়ী বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে বসে রয়েছেন, শিরোস্ত্রাণে ঈগল পাখীর পালক গোঁজা। দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে একটা কেরোসিনের আলো জ্বলছে। কথার ভারে আর পাম মদের গন্ধে ঘরের হাওয়া আরো ভারী হয়ে উঠেছে।

যে বাড়ি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে সে ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবলের সামনে এসে দাঁড়াল। চারধারে তাকালো সে, চোখের তারায় তার সবাইকে নিস্তব্ধ করবার আদেশ যেন ফুটে উঠেছে। বেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আলফ্রেড অপেক্ষা করতে লাগল।

"বন্ধুগণ!"

"এই যে শুরুন সবাই, উনি কিছু বলছেন।"

"বন্ধুগণ! ভাগত!" এই কথা যার ওরেক প্রতিধ্বনির মত শোনা গেল।

"বন্ধুগণ," বক্তা বলে চললেন—"ভাই গণ, আমার বেশী কিছু বলার নেই। আজ আমাদের একটি বিশেষ দিন। একটা বিশেষ কিছু ঘটতে চলেছে আমাদের মধ্যে। এই তরুণ যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখুন।" এই বলে বক্তা আলফ্রেডের কাঁধে একটা হাত রাখলেন। "এ আমাদেরই এক ভাই। এ এখন এক যন্ত্র নিয়ে এসেছে যা আমাদের গলার যন্ত্র, আমাদের কথাবার্তা সব কিছু ধরে নিতে পারবে; তার সেই যন্ত্র আমা-দের এই সব কথা আমাদের মধ্যে আমাদের আত্মজনের কথা বলতে ছড়িয়ে দেবে। সেটা ভাল হবে কিনা আপনারাই বলুন।"

"হ্যাঁ, সেটা ভালই হবে।" উত্তর এল।

"বাগত, ভাইগণ আজ এক মহান দিবস। আমরা আমাদের সাধ্যমত যা দেবার দেবো।"

কিছুক্ষণের জন্য তিনি থামলেন। আল-ফ্রেড বন্ধ ঘরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বক্তা আবার বলতে সুরু করলেন।

"ভাইগণ, শুনুন। এমনদিন রোজ রোজ আসেনা। আমাদের সেটা ভুললে চলবে না। ওকে বোঝাতে হবে যে ও আমাদেরই ছেলে, আমাদেরই রক্ত বইছে ওর গায়ে। আলফ্রেড উডেনহে নুকিটো—এই নামেই আমরা ওকে জানি। আপনারা সকলেই ওর বাবা যা তাই বোধহয় ভাল করেই চেনেন। ওর বাবা অন্তত বলবার করতে যাবার আগে বারবার উডেনহেকে আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। বহু বছর পর উডেনহে এর আগে আর যেতে পারেনি। আজ বহুকাল পরে তাকে আমরা দেখছি। তার বড় সাধ ছিল সে—আমাদের উচিত ওকে সম্মান প্রদর্শন করা —তাই নয় কি?"

"ভগবান ওর কল্যাণ করুন।" "বাগত বাগত।" "ভগবান সকলের সঙ্গেই থাকেন।"—চারদিকে এই রব উঠল। আলফ্রেড ভেতরে ভেতরে একটা অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করল। চোখে তার জল ভরে এলো। কিন্তু পুরুতের অনুপাত শোভা পায়না বলে সে চট করে অশ্রু সংবরণ করে নিল। গলাটা তার কেমন ভারভারে ঠেকল।

বক্তার কথা শেষ হতেই আলফ্রেড উঠে দাঁড়াল। সবারপ্রে সে সবাইকে ধন্যবাদ

আনাজ। সে প্রতিজ্ঞা করল, যদি সে ঈশ্বরের সাহায্য পায় তবে সে জগৎ সমক্ষে নুকোয়েলের কথা এমন করে বলতে পারবে যা তার আগে কেউ কখনও বলেনি।

সে দেখল, তারা দুধের মত সাদা বড় প্রস্তরে মেঝের ওপর খানিকটা ছিটিয়ে দিল —ইরিওজিন* উৎপন্ন করবার জন্য। তারপর বিরাট একটা লাউয়ের খোলা থেকে যে যার পশুর লিং দিয়ে তৈরী পাত্রে মদ ঢেলে নিল। ছোট একটা লাউয়ের পাত্রে তারা আনাজেতকে মদ ঢেলে দিল। দুই হাতে পাত্রটি তুলে নিয়ে সে পান করল আপন দেশের সুধা। অন্তরে কাঁপল নিজের লোকের সঙ্গে একাত্মতা।

তারপর সে বলল, "আমাদের অনেক কাজ আছে।"

কিন্তু তারা বললে, "আজ না বাবা। আমাদের তৈরী হতে সময় দিতে হবে ত। বাজিয়েরা কোথায়? গাইয়েরা কোথায়? ...আর তাছাড়া অনেক দূর থেকে এসেছ তুমি। আজকে এসো গান আহারের সঙ্গে সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাক। আগামীকাল সব গাইয়ে বাজিয়েদের ডেকে তাদের করা যাবে। মিলনের রাতে আমরা জমায়েত হবো। সমস্ত নুকোয়েলে সেখানে সমবেত হবে।"

মানুষের ঘাম, মদ আর পোড়া তামাকের গন্ধে চারধারের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আনাজেতের ভালই লাগছিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওরা তাঁবু চালিয়ে মিলনের মাঠে এসে পৌঁছল। যাত্রাই পথে সারা রাত্রা প্রায় হাবাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে। নুকিটো শুনতে পেল ড্রাইভার বলছে দু ঘণ্টা ধরে কার্ট সীমারে চালাতে ইঞ্জিনের ওপর খুব চাপ পড়েছে, রেডিয়েটরও অত্যন্ত গরম হয়ে উঠছে।

মাঠে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রায় হাজার তিনেক লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ওরা, শিকারী, কৃষক ও ঘুরোপরাণী যাযাবর, ইস্কুলের ছেলে, ছোট ছোট মেয়ে নানা রঙের লোক এসে ভীড় জমিয়েছে। প্রত্যেক দল থেকেই হঠাৎ হঠাৎ গান ও ব্যঞ্জনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই রঙে রঙবেরঙের খাটি সঙ্গীত। নুকিটো কল্পনায় দেখতে পেল রঙবেরঙের অজানা ছোট্টো মাইক্রোফোনের ওপারে রয়েছে। তার নুকোয়েলে আসা এখন আর শুধুমাত্র একটা রেকর্ডিং ট্রিপই নয়, এটা তার জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। মরুঝড়ে যদি ইকোমা ও শুকুনোকে এখানে নিয়ে আসা যেত!

ইকোমা তাই গরবে গরবিনী হত আর শুকুনো কেঁদে কেটে ব্যাপারটাকে ভেস্তে দেবার যোগাড় করত। মনে মনে সে প্রার্থনা করল যেন রেকর্ড করবার যন্ত্রগুলি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে; ঘুন পিঁপড়ে না চলে বা পাঁচশো মাইল দূর থেকে বালি টেপ নিয়ে যেতে না হয়। আগে ঠিক সময় জ্যানটা বুঝ করা হয়েছিল এবং নুকোয়েলে ই ি মী য় য় য় সময়মত যন্ত্রপাতিগুলি সাজিয়ে করে রেখেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা সন্দেহের উদয় হল। এদের এই অযাচিত অলঙ্কারণী ও উত্তেজনা নিয়ে কি করা যায়? তাকে দুই সপ্তাহের জন্য অতিথি হয়ে এরা সমস্ত ব্যাপারটাকেই পণ্ড করে দেবে, দেবেই, কোন সন্দেহ নেই তাতে। অতএব কাজ হাসিল করতে হলে তাকে তাকে থাকতে হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কি করে এই জনসমূহকে সামলাবো যায়? অসম্ভব। চোখের সামনে এই বিপুল উল্লাস ও জনসমষ্টিকে দেখে তার মনটা ঘুরে গেল।

বি ভি ি ন্ন স্থান থেকে এরা এসেছে, এজিকোয়েলে প্রান্তে, আমাজেনী থেকে, আমুচে, আমাণ্ড আর ইকিতে থেকে,— সবাই এসে জুটেছে। ঘরে আজ আর কেউ নেই। সকালে যে সব মেয়েকে কুড়ি কাঁধে করে বাজারে যেতে দেখেছে তারাও এসেছে, শুধু নিজেদের বয়স ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী রঙচঙে বসনে সুসজ্জিত হয়ে এসেছে। নুকিটো তাদের সবাইকে চিনতে পারল—একই বৎসরে এদের জন্ম, একই সময়ে এদের কুমারীত্ব ভঙ্গ করা হয়েছে একই সময়ে বিবাহ ও সন্তানাদি হয়েছে। রঙচঙে


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশনা

১। পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি / শ্রীদেবজ্যোতি রায়। ৩০·০০

২। সংখ্যাতত্ত্ব / শ্রীরাজকুমার সেন। ২১·০০

৩। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সংস্করণ) / ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী।

৪। সমাজতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) / শ্রীপরিমলভূষণ বসু। ১৫·০০

৬৩, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩


* বিখ্যাত খুন্ (উপদেবতা)

চাপাকাপড়ের পোশাকের তলায় এরের শরীরকে ঘরে রেখেছে আরো সুন্দর এক বস্তুসমূহ।

রাজার শিকারী এসেমি ওপাহেরও দেখতে পেল, চিতাবাঘ আর বেবুনের চামড়া দিয়ে মুড়ে পোশাকে তারা সজ্জিত। তাদের হাতে ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র-বর্শা, শিকারের ছুরি, তেলপাত্র। ইস্! আনন্দোচ্ছল পদ বেরিয়ে এলো নুকিটোর মুখ থেকে—"এ ত রেস্তিওতে ধুলিয়ে উঠবে না, এ ত আসলে টেলিভিশনে দেখবার জিনিস।" কি করে জোতায়া—তা তারা যত কল্পনাপ্রবণই হোক না কেন এই উৎসাহে তাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের পুরুষদের মনস্তত্ত্বকে দেখতে পাবে?

গাড়ী থেকে বাহাদুরে সে অনুসরণে গিয়ে গেল, মাইক্রোফোনটি ঠিক কোথায় বসানো যায় তাই ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে এবং ইন্দিলীয়ার দুজনে মিলে ইস্কুলের হলটি বেছে নিল রেকর্ডিং করবার জন্য। হলের মাঝখানে মাইক্রোফোনটি বসানো হল, কিন্তু আলফ্রেডের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। মেয়ে-পুরুষ, বয়স্কদের দল, শিশুরা (সবে মিলে হাজার তিনেক হবে) নুকিটোকে কাছে পাবার জন্য আকুল। মুখে হাসি বজায় রেখে প' পাঁচেক মিনিট সে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর দিল ডুব। বয়স্ক মানুষদের অবশ্য হেলা করেনি সে। অর্ধবৃত্তাকৃতি বেঞ্চের ওপর যেখানে তাঁরা বসে আছেন তাঁদের সামনে গিয়ে সে মাথা নত করে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। তারপর মেয়েদের পালা, তাদের মসৃণ হাত, মসৃণ বক্ষ, সুগন্ধবহ বাতাস তাকে একটু অন্যমনস্ক অবস্থায় ফেলেছিল। তারপর তরুণ যুবকের দল, বলশালী বক্ষপেশী হাত, উজ্জ্বল চাহনি এবং ঝকঝকে দাঁতের সারি। এদের সঙ্গে যখন সে করমর্দন করছিল তখন রেকর্ডিং ইন্দিলীয়ার হৌতে এসে বললেন—"আলফ্রেড, বাইক মিয়ে ওরা ঘটোপাটি শুরু করে দিয়েছে, সব গেল বুঝি!"

শিরাচায় বাঁধ দিয়ে আলফ্রেডের সোনা হৌতে গেল মাঠের ওপর দিয়ে ঘুরে বাড়ীর দিকে। এক লাফেই ছোলা পোশাক পরা তেওয়ার ব্যক্তি চাঙারো মাইক্রোফোনটি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উপরে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে।

"এই আমার হল আগে রেকর্ড করবে।"

"না না আমার হল আগে, আমরাই আগে বায় দিয়েছি, টিকিট দেখ দিয়ে।"

আলফ্রেড ছোলা পোষাক পরে টান দিয়ে বলল, "এই যে শুনুন।"

"কিন্তু আগে আমি রেকর্ড করবো।"

"হ্যাঁ, তা ত নিশ্চয় করবেন, কিন্তু মাইকটা নামিয়ে আসুন।" চাঙারো গজ-গজে রেঁধে গেল। "ও কেন আগে বলবে, আমাদের হলকেই প্রথম বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি, বুঝে গেছ তা?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু, কিন্তু আগে যন্ত্রটাকে নামিয়ে আসুন। ওটা গেলে ত সব গেল।"

বাইরে একদল মেয়ে একটা বিমান নিয়ে যেন ঘাসের সঙ্গেই মেটাকে মাড়তে মাড়তে ছিন্ন করবার মত আও পিছু করছিল। আলফ্রেড বুঝতে পারল যে এটা তার "অভিবেচনা"র বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ। আলফ্রেড দেখতে পেল বিমানটাতে লেখা রয়েছে "উত্তরাধি যে ওয়ারেকো গানের দল", লাল অক্ষরে সোনালি অক্ষর ঝলমল করছে। মেয়েরা তাদের মহড়া দেওয়া সমবেত সঙ্গীত উচ্চকণ্ঠে গেয়ে চলেছে, কেউ তা রেকর্ড না করলেও যেন তাদের কিছু আসে যায়না। উজ্জ্বল মাহাজি হলদে আলত, তার ওপর আলো ছুরে, মাজ কালো ছাপা আলত, সব কিছুর ওপর রোদ যেন ঠিকরে পড়ছে। সুচারুরূপে বাঁধা চুল। ইয়োং অঞ্চলের মেয়েরা বেশভূষিনী। আলফ্রেডের মনে পড়ে গেল রাজনৈতিক ধারার কথা।

"ইস্তাও, ধারাও, এক এক করে সকলেরই নিচ্ছি।"

একজন জোক তার কনুই দিয়ে টোকা-টুকি করছিল। "আমি এই বক্তৃতাটা তৈরী করেছি" বলে সে চিৎকার করে উঠল, বিষয়টা হল ক্রমপথের বিখ্যাত উদ্ভিদবাণী। অবাকের মত আলফ্রেড তাকিয়ে রইল। জোকটি চেঁচিয়েই চলল, "বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ইন্দি-ওতিকে মুকোয়েলে প্রত্নবাক্যরা উদ্যানরা করে থাকেন। ইকিতে গ্রামে এঁর টাই, এবং একজন তারপ্রাপ্ত পুরোহিত এই পূজা পরিচালনা করেন। তাকে দাইয়ের খোলা আর বোতল এঁর প্রতীক, প্রকৃতপক্ষে তিনি জনসাধারণের জন্য হাঁস পাচে রেখা বিশেষ এক বাসস্থানের মালিক ইনি। এঁর সম্মতিতে হস্তক্ষেপ করলে মৃত্যু অবধারিত। এর একটি ছোট নহীও আছে। "কোনো বাবাহং সাহেব সাড়ি তার দুই পায়ে, এ পর্যন্ত কোন বাহন হোপণ করে নি"...

---

• নাইজেরিয়ার একটি জনপদোই। এরাই নাইজেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিয়াফ্রা রাষ্ট্র গড়েছিলেন ১৯৬৭ সালে। ইঁদ যুদ্ধের পর এখন এই অঞ্চল আবার নাইজেরিয়ারই অন্তর্গত।

• ছোট তালপাতার মত দেখতে, চিবুলে মাথাও নেশা হয়, তবে অনেকক্ষণ তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় বলে মাহাবা অঞ্চলের লোকদের খুবই প্রিয়।

আলফ্রেড কোরস থেকে থেকে 'যুকেডি, যা বেশ' এই বলে ওকে বাধা দিতে চেষ্টা করল।

বক্তার কণ্ঠস্বর চারধারের গোলমালে চাকা পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু সে থেমেছিল। আলফ্রেড প্রাণপণে নিজেকে চাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু লোকটি তাকে জীবনভাবে আঁকড়ে ধরে আরো জোরে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল, ইন্দি-ওজি ভবিষ্যৎবাণীকে কেউ যদি অস্বীকার করে, কিংবা কেউ যদি চুরি করে তাহলে তিনদিন তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। এই ইন্দি-ওজিই আমাদের প্রাণকে রোগ থেকে মরণ থেকে রক্ষা করেন—

না, চুপ করাবার কোন উপায়ই নেই, হতাশ হয়ে ভাবল আলফ্রেড। কোন শৃঙ্খলা নেই কোন দিকে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তাকে গ্রাস করল যেন। তাসাহেবী মনে তার মুখ চেয়ে সুপ্রসন্ন হাসি হেসেছিলেন—কিন্তু দান গ্রহণ করার জন্য যেই সে হাত বাড়ালো অমনি তিনি অন্তর্ধান করলেন! ও ভগবান, এরকম করে সব মাটি হতে দিও না; না: তাকে তার গঠনশক্তি প্রয়োগ করতেই হবে।

সে তার রেকর্ডিং ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকল, "এই গোলমাল হট্টগোল সবকিছু তুলে নেবে···আমার সেটা দর্শকদের শোনাবো।"

বিকেল তিনটে বাজে প্রায়, রোদ খুব চড়া। প্যাটের ভেতর দিয়ে ঘাম ঝরছে টপ টপ করে। মিনিট পাঁচেক পর ইঞ্জিনীয়ার ইন্দুরধাড়ীতে ফিরে এসে বলল, টেপটা এখন বাজাবার জন্য তৈরী। বুলিটো বাছাই করা তিনজন নেতাকে নিয়ে এলেন এবং টেপটা চালিয়ে দিলেন। অত্যন্ত ঘাবড়ে ওরা বলে উঠলেন—"এটা কি?"

"আপনাদের হট্টগোল!"

"অসম্ভব, আমাদের মা আমিয়ে এগুলি তুলে নিয়েছ!"

"যেদিন যেমন পেয়েছে তাই ধরে রেখেছে!"

"ঈশ্বর!" তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠলেন, "এ যেদিন কাউকেই চেনে না, এমন কি সর্দারকেও নয়? তাহলে এই যেসব হৈ চৈ আমরা করেছি এর সব এতে ধরা পড়েছে!"

"হ্যাঁ তাই যদি, যদি আপনারা গোলমালই পাঠাতে চান।

"না না না" মাঝা কোঁকড়া পাকা লোকটি বলে উঠল—

"বন্ধুগণ, ভাইগণ, আমাদের সুনাম আর রইল না।" মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে, "কি লজ্জার কথা, এইভাবে আমরা আমাদের নিজেদের মুখে চুনকালি দিচ্ছি। এসব কেচ্ছাকাণ্ড বন্ধ করো এখনি।"

চারধারে চেয়ে সে জনতার মধ্যে ওয়াহেকোকে আর ওকোডিলেকে খুঁজতে লাগল, "ওয়াহেকো? ওকোডিলে? কোথায় তোমরা? এস শিগগিরি, কোথায় গেল সাইরেন বেজের দল? এস চট করে এটা অনুষ্ঠান তৈরী করা যাক? ওই, কোথায় গেলে সব? আছ ত এখানে? হাত ধরে থাকে যে।"

মজার পরের মিনিটগুলোর মত সব চুপচাপ হয়ে গেল। শৃংখলাবদ্ধভাবে, ঠিক তালিতালে গান গাইবার মত করে একে একে তারা গান গেয়ে গেল। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলফ্রেড একনাগাড়ে রেকর্ড করে চলল। তারপর সে জায়গাটাকে সোজা সর্দারের উঠোনের ঠিক মাঝখানে এবং সেখানে উপজাতির সংঘের ইতিহাস, নকোয়েলে শহরের ইতিহাস, ইন্দি-ওজি ভবিষ্যৎবাণীর ইতিহাস রেকর্ড করে নিল। পঁচিশ বছর ধরে যে জায়গাটার মেরামত করানো হয় নি, তাদের তা দেখানো হল।

এবার আলফ্রেডের মনে হল সে একেবারেই একজন। তাকে আবার ঘিরে এসেই উপজাতি হবে। তার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ, যাকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। হাতঘড়িতে যেখন কখন যে রাত এগারোটা বেজে গেছে তার খেয়ালই নেই। সে এখন জায়গাতে পৌঁছেছে যেখানে কাজ মানে আনন্দ। রাত দুটোতে সে প্রতিযোগ করতে লাগল। ড্রাইভার অবশ্য এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল তাই সে চাকা ঘোর করছিল। উঠ্ করে লাফিয়ে উঠে সে বলল—"কেন? ঠিক সকাল ছ'টায়।"

জোরের কুয়াশায় মাঝখান দিয়ে পথ কেটে সে চলল। বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আলফ্রেডের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। কৃষ্ণ পথের ধার ঐ যে দেখা যায়, সবশক্তিমান, একক ও নিখর। পক্ষ-প্রাণের ঐ চক্ষুকর্তা কি এখন ঘুমোচ্ছেন? মধ্যরাতের পর তিনি নিশ্চয়ই মানব মূর্তি ধরেন কিনা তাতেই তার রোমকূপের ভেতর দিয়ে একটা শীতল ঘর্ম গেল। আমুচোলে গ্রামের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। হেডলাইটের আলোতে কয়েকটা ঘুপ্টি কালো গরু দেখা গেল। এরা "কৃষ্ণ পথের"র সম্পত্তি। এদের হত্যা করলে রহস্যজনক উপায়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা নেই। ড্যানটা খুব আস্তে চলতে লাগল এবং ড্রাইভার মৃদু উপায়ে তাদের রাস্তা থেকে বনের ভেতরে সরিয়ে দিল।

হঠাৎ সেই পুরোনো এক অনির্দিষ্ট ভাব আলফ্রেডকে আচ্ছন্ন করল—ছোটবেলাতেই সেই ভয়ের অতীত সে হয়েছিল বলে তার ধারণা ছিল। বুকোয়েলেদের এই কালাতীত দেবতার মধ্যে ব্যাখ্যার অতীত কিছু আছে নিশ্চয়। কয়েক'শ গজের ব্যবধানেই রয়েছে এক ক্যাথলিক মিশন, ইন্দি-ওজিকে তারা এত করেও এই বনভূমী থেকে তাড়াতে পারে নি।

অনুবাদ : প্রদ গুপ্ত

# তিন দুনিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্থবিরদশা

## রমাপ্রসাদ মল্লিক

দশক দশকের শেষাশেষি কে জানতো এমন অঘটনপুর ঘটবে!

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের দুর্বল ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যাকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির শীর্ষে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ চোটিতে এক আগ্রাসী ভূমিকায় দেখা যেত, যার আণবিক পরমক্ষমতার মোকাবেলা করতে পারতো একমাত্র সোভিয়েত রুশ অস্ত্র বোমা প্রয়োগবিদ্যার অধিকারী হওয়ার ফলে, যে মহাশক্তি (super power) চোখিয়া থেকে ভিয়েৎনাম, মালয়েশিয়া থেকে মিডল প্রাচ্যের ইসরায়েলী সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি পর্যন্ত তার বৃহৎশক্তিস্বার্থের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল দোর্দণ্ড প্রতাপে, কে জানতো তার অবিমৃষ্যকারিতা আসবে এত দ্রুত, কেইবা ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিল এহেন শক্তিধর রাষ্ট্রের ধারা রাজনৈতিক কাঠামো ও পদ্ধতিতে ঘটবে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। ইতিহাস কিন্তু অজানতা কাটার ঘটনাপ্রবাহের ফুটিতে। তাই আজ আমাদের অবিশ্বাস্য পরিণতিও স্পষ্ট, বোধ্য।

### তৃতীয় বিশ্বমুক্ত যখন হতে পারল না

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পদ্ধতিতে না হওয়ায় কতকগুলি সহজাত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যথা, তৃতীয় বিশ্বমুক্ত আজি হতে পারে নি বুঝি সোভিয়েত রুশের নেতৃত্বে চালিত "সাম্যবাদী" রাষ্ট্রশিবিরের কৃতিত্বে—তাদের আদর্শ রাজনৈতিক ও নৈতিক কার্যকলাপের, বিশেষতঃ তিন দশক পদ্ধতিসম্পন্ন দেশের সহযাত্রিদের কাজে। এই ভ্রান্তি উৎসর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতে দেশে জনগণের ভূমিকা ও তাদের মুক্তিকামী আন্দোলনের শক্তিকে অবহেলা করার ফলে। বিশ্বসমাজতন্ত্রি সোভিয়েত রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সমর্থক ও প্রকৃতার পক্ষাশ দশক থেকেই সহঅস্তিত্ববাদের উদ্গাতা হিসাবে Detente অর্থাৎ শক্রতাবসানের বাণী আর এক ভ্রান্তি চাউর করেছে—স্টালিন দশকের লড়াই থেকে উৎসর বিবাদের ভেদ যখন একটা স্তম্ভিত অচলাবস্থায় এসে উপনীত হল এ দুই শক্তিধর রাষ্ট্র, শক্তিমের সংবাহী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাবলিক এবং পুরোধা আধুনিক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাবলিক "বাণিজ্যের ভেদাভেদ"কে স্বীকার করে পক্ষান্তরে আদর্শ ক্ষতি ও রাষ্ট্রিয়তার বিভাজনকেই স্বীকার করে নিল। এই দ্বিতীয় ভ্রান্তির সৃষ্টি বস্তুত সত্য এবং পরিস্থিতির রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান সমীকৃত অবস্থাকে উপেক্ষা করার নীট ফল। রুশিয়া যে ভেদের আণবিক পরমশক্তির অধিকারী হতে পেরেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর "ঠাণ্ডা লড়াই"এর কালে, তাই নয়, সেই অস্ত্র দ্বারা পক্ষান্তরের অবভাসক্ষেত্রের মর্মমূলে আঘাত করবার মত আজ আন্তর্মহাদেশিক-ভেদকারী ক্ষেপণাস্ত্র (inter-continental ballistic missile) অধিকারীও হতে পেরেছিল। পরিণামস্বরূপ, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সামরিক-কর্তৃত্ব ধারণা যে, আণবিক পরমক্ষমতার প্রথম ও শেষের প্রয়োগ দিয়েই সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট "শত্রু" শিবিরকে একেবারে অকেজো, অর্থাৎ সেই দেশগুলির সামরিক ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেওয়া চলবে তেমনি ধারণা বিলাস মুক্তিকীন প্রতিপন্ন হল। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক কৌশলশক্তির চরম লক্ষ্য অথবা অস্ত্রের অপ্রতিরোধ্য প্রয়োগে শত্রুরাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষমতাকেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেওয়া—তেমনি লক্ষ্য প্রয়াস চলে দুই দশকের বিলাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বদিগন্তী সাম্রাজ্যের শীর্ষে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুক্ষি মেরে নি কেন, বিশেষতঃ ইংরেজিন নয়ী ভাবেন যেমন স্পষ্ট হয়ে চোখে বিস্তারশীল সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা নিতে সমস্তরের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন—অবশ্যই সব ক্ষেত্রে মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাকৃসামরিক দেশগুলির অর্থনীতি ও বিদেশে পাকিস্তানকি ঘাঁটিয়ে [illegible] পীঠস্থল হয়ে [illegible] যুদ্ধের পরিণতিতে [illegible] উত্তর কোরিয়ার বিরোধে, [illegible] এতাবৎকাল দেখানে করবার উদ্দেশ্যে, আমেরিকা সামরিকবাদে হস্তক্ষেপ করেছিল—আজ বিয়েতনামের মাধ্যমে সমাধান হল কোরিয়া লড়াই-পরবর্তী প্রকার শান্তি বজায় রাখার প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৫১-র প্রায় শেষাশেষি এই কোরীয় যুদ্ধের হস্তক্ষেপিতার জন্য আমেরিকাকে প্রচুর খেসারৎ দিতে হয়। আন্তর্জাতিক আলোচনা বৈঠকে এশীয় ও আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের, বিশেষতঃ ভারতের প্রতিনিধি শ্রীর বেনেগল রাজারাও-এর যুক্তিপূর্ণ দাবিদাওয়া প্রস্তাব ও সে প্রসঙ্গে উত্থিত চীন ও উত্তর কোরীয় প্রস্তাবের মতে আলাপ আলোচনার দাবী

আমেরিকা বাইরে যাওয়ার আগে তার বিশ্বরাজনীতি হিসেবে ফ্রান্স নৈতিক সমর্থন যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ে গেছে। পরবর্তীকালে, কোরিয়ার যুদ্ধে, বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের নামে চালু হলেও মূলতঃ আমেরিকার সমরবাহিনী (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সর্বাধিনায়কত্বে যে বাহিনী জোক-হট্টী চীনের সেঞ্চাসেবী-সৈনিকদের হাতে পর্যুদস্ত হয় এবং দক্ষিণ-কোরীয় সহযোগী পরস্ত যার থেকে হটতে বাধ্য হয়) সে যুদ্ধের উপযোগী অর্থবল ও উচ্চমানের পরি-সম্ভারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও লড়াই করার ব্যাপারে কোনো লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। বরঞ্চ, মৃত-প্রাণি এবং নৈতিক অধীহার ফলে হতোদ্যম আমেরি-কান সেনাবাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আন-বার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুমানকে এবার আমেরিকার মত প্রয়োগের ধরণটা দিতে হয় এবং শুরু হয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির ও জাতীয় স্তরে সংবিধানের সংশোধন করার জন্য উক্ত জেনারেলকেই বারবারই অভি-যোগে করতে হয় বরখাস্ত। (এপ্রিল ১০,

মহাজাতীয় মহাশক্তি (super power) রূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমেরিকার অবস্থা সকল দলের জোগায় ছিল বলতে গেলে অপ্রতিহত। বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জ তার প্রভাবে একরকম হাতবোতের মুঠি— মহাজাতীয় স্বার্থে চালিত হয়েছে যে সংস্থার নিরাপত্তা সমিতি এতাবিকবার। যার সাধ্যে সে যুদ্ধের জোড়িয়েত রাষ্ট্র সেক্রেটারি নিকোলে জোভিয়েত প্রতিনিধিরূপ (ম'লিউ ভিশিন্স্কি জোভিয়েত) ভিটো প্রয়োগে বানচাল করেছেন নিরাপত্তা সমিতির বৈঠকে আমেরিকান মহাজাতীয় স্বার্থে আনীত প্রস্তাবনা। তাতে দুই আমেরিকা বারবার চেষ্টা করেছে বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের সংবিধানসমূহ নিয়মাবলীতে সংশোধনী পাস করিয়ে ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা-সংকোচ বিধিটাকেই তুলে দিতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি এইজন্য যে, বিশ্বরাষ্ট্র-পুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা যে শক্তিগুচ্ছটী পঞ্চ-শক্তি, তাদের মধ্যে যাতে ঐক্যটা থাকে বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সঙ্কুল ক্ষেত্রে, উক্ত নিরাপত্তা সমিতির অন্তিম সিদ্ধান্তে সে উদ্দেশ্যেই ছিল ভিটো প্রয়োগের ব্যবস্থা।

১৯৫০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া একীকরণের সমস্যা, সমাধান খুঁজে যায়, অচলায়তনী দশায় পতিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমেরিকা তার বিশ্ব-মহাজাতীয়তা


**West Bengal State Federation of Wholesale Consumers' Co.operative Societies Limited**

P-I, HIDE LANE, AKBAR MANSION, 3rd Floor, Calcutta-700 012

Phone No. 27-7012 & 27-7013

**Join Consumers' Co-operative Movement**

Visit your nearest co-operative stores or us for

1) Pulses
2) Spices
3) Textiles (Controlled & Non-controlled)
4) Amul products, Amul spray, Amul whole milk, Amul Butter etc.
5) Customs confiscated foreign goods
6) 'Coop' Brand Powdered Spices
7) 'Coop' Brand Mustard oil (ag-mark)
8) Bangalipi, Tamralipi, Chatralipi, Barnalipi (from concessional paper)
9) Common Salt
10) Cycle, Ricksaw Tyres And Tubes

**ALSO VISIT**

RETAIL UNIT
P-12, New C. I. T. Scheme Extension
C. I. T. Buildings
Calcutta 700 012

MEDICAL UNIT
Co-operative Medical Stores, 88, College Street, Calcutta Medical College Campus
(Near Gate No. 3) Calcutta-700 012

ENROLL YOURSELF AS MEMBER. SEND CONSTRUCTIVE SUGGESTION

ADMINISTRATOR : Sri Bhabani Prasad Chatterjee, M.L.A.

ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল—অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনও এই সময় থেকে শুধু দিশা পরিবর্তনই করতে শুরু করেনি, এক ভিন্ন কৌশল পদ্ধতিও অবলম্বন করতে থাকে।

নব-সাম্রাজ্যবাদী 'মনরো নীতি':
এশিয়া প্রেক্ষাপটে

১৮২৩ সনে প্রবর্তিত মনরো নীতি আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়: যেন বিকাশমান দেশগুলিতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি যাতে বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ বিনাই বিকাশলাভ করে, সেই উদ্দেশ্যে রচিত। তৎকালীন দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি সদ্যস্বাধীন; সেখানকার স্বাধীন প্রবৃদ্ধেরা ঔপনিবেশিক দশার রূপান্তর ঘটাতে যাত্র সে সময় স্পানীয় এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানান্তে। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল, ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবক্ষেত্র দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো এবং ফিলিপিনস্ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এই নীতি ক্রমক্রমে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের তথা আগ্রাসী রাজনৈতিক আচরণের এক নৈতিক তাৎপর্যবহনী শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায়।

ফিলিপিনস দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যবর্তী ধাপের ভিতে আসে সর্বপ্রথম। এখানেই প্রমাণিত হয় মেকিনলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—উইলিয়াম ও আলেকিক-রূপে আদিম অবভাষাস সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে তার সবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষ ও সংঘর্ষে হেরে গিয়ে হটে যাওয়া। এই থেকে শুরু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে গড়ে ওঠা ভূমিকার বিকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তে এমনি সম্প্রসারণে আসে এক সাময়িক বিরতি, যার কারণ ছিল ঐতিহাসিক আকস্মিকতা—তালসাইয় উড্ উইলসনের নীতিবাগীশ পশ্চাদপসরণে ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে। ইয়োরোপে সে যুগে (১৯১১ থেকে ১৯১৮ অবধি) ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবঃ সংঘর্ষ ও টানা যেমন, আপোষে মিলে আমেরিকার প্রভাব-ব্যাপ্তিকে সঙ্কুচিত ও সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও তেমনি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা নীতি অত্ত মেকলে থেকে আপন সমস্যাদি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু "বিচ্ছিন্নতাবাদ নীতি" (policy of isolation) উড্রো-উইলসনী যুগে টিকতে পারেনি। উইলসনিয়ান নীতির ব্যর্থ বিশ্বপরিস্থিতিতে আমেরিকার তাত্ত্বিক-গবেষক মহলে নতুন কায়দায় সাম্রাজ্যবাদী অধিকার বিস্তারের তাকে লাগাতে আরম্ভ করে ত্রিশদশকের অর্থনৈতিক মন্দা-সঙ্কটের ধাক্কা সামলে ওঠার পর থেকেই। সেকালের উপনিবেশ-দেশগুলিতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিঘাত তীব্র (১৯৩০ থেকে ১৯৩১) রূপ নিতে থাকায় এবং আমেরিকায় আপন ঔপনিবেশিক মুক্তিযুদ্ধের এক ঐতিহ্যময় গৌরবের অতীত ফিরে গেলে আমেরিকার শাসকশ্রেণীর পক্ষে সহজ হয় ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের, বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে, অধিকৃত দেশগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী এক নিঃস্বার্থ বন্ধুরাষ্ট্রের ভূমিকা ও নৈতিক মর্যাদার মূর্তি তৈরী করায়। (নেহরুর রচিত "শৃঙ্খলিত ভারত" (India In Bondage) বইয়ের প্রকাশ, এবং প্রেসিডেন্ট এফ ডি রুজভেল্টের বারা বিলাতে শাসকবর্গীয় নীতি রচয়িতাদের কাছে ভারতকে স্বাধীন রাজনৈতিক প্রদানের জন্য সমোপন আহ্বান এই প্রয়াসের, অল্প হলেও, দৃষ্টান্তস্বরূপ।) অথচ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরেই বস্তুতঃ উপনিবেশিক "নব-ব্যবস্থাপনা"র এই নীতি ও তার সংস্থা অল্পদিনের মধ্যেই বাতিল হয়ে যায়। দেখা যায়, নব-সাম্রাজ্যবাদের মূলগত কর্মতাগীতি, ঘনিষ্ট এবং নতুন উপনিবেশ খোঁজা ও ভোগ-করে অধিকারের এক সুস্থ মনীষার সাম্রাজ্যবাদী চাতুরালী। প্রথম যাত্রা যায় ওয়াশিংটনের (নব-আমেরিকার পীঠে এক তুঙ্গ ধাপ), সেখানকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন আন্দোলন ঘটে উঠেছে। (১৯৪৪)

মোড়-পরিবর্তন :
ক্রান্তিকাল

পরবর্তী সময়ের প্রসঙ্গার্থে দুটি নতুন বিরোধের ধারা দেখা যায়, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ক্রান্তিকারী অধ্যায়ের সূচক। প্রথম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশ-বিরোধী দেশ-রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়, ফলে ভেবেলাচুক্তিতে সই করতে বাধ্য হওয়া। (অবশ্য ভেবেলাচুক্তির শর্তগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র শাসন করেনি, শাসন করতে চায়নি। চাতুরালি করে, অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর এবং অবক্ষীয়মান ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সমরবাহিনীকে সরে যেতে দিয়ে তার স্থলে আপন শক্তি-সমাবেশ করে। ফলত এই সময় পাশ্চাত্য-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আপাত পশ্চাদ্ধাবন সত্ত্বেও আসা রেখে সোভিয়েতপন্থী চীনের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক কূটনীতির চালে বড় রকমের ভুল করেছিল, যা পরবর্তীকালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই অকপটে স্বীকার করেন।)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির প্রসঙ্গে সেই সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনুধাবন বিচার। বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ত্রিশক্তিভিত্তিক (আক্ষ-

জাতিক রাজনীতিতে) শক্তি সমাবেশ ও টানাপোড়েনের যা দেখা দেছল, বুঝাতে তার এক বিন্দু অবশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বাকি দুই শক্তি জোটের—পাশ্চাত্য বশংবদী মিত্র-শক্তিবৃন্দ এবং সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েত রূপের নেতৃত্বে—মধ্যে পারস্পরিক স্পর্ধা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের চৌকাঠে প্রায় যাওয়াতে বসেছিল। তবু বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় মহড়া দেখা দেলনা কেন? কারণ, যে মধ্য-য়ুরোপ, বিশেষতঃ বার্লিন নিয়ে দুই জোটের সমরবাহিনীসমূহের মধ্যে যুদ্ধের শেষ অঙ্কে তীব্র হেমায়েমি দেখা যায়, সেই শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি তাস হয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ইতালি এবং উত্তরে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক সমেত ইউরোপে প্রধান পাশ্চাত্য "আটলান্টিক মৈত্রী" এলাকায় হয় অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব জার্মানি, পোলাণ্ড, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া সমেত উত্তরে ফিনল্যাণ্ড ও বালটিক তীর-বর্তী রাষ্ট্রসমূহ এবং দক্ষিণ-পূর্বে রোমানিয়া সহ সোভিয়েত রুশ প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে। অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রকে ২০ বছরের জোরে নিরপেক্ষ-কৃত এলাকা বলা হল। দুই শক্তিজোট এই অঞ্চলকে শক্তিমুক্তিতে নিরস্ত্র হয়ও। যাকে 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলা হয়, তার স্বরূপার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিকল্প রূপে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বের অধ্যায়ে। এই যুগে আমে-রিকার সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির তথা বিশ্ব-রাজনীতির নীতি-কাণ্ডারী হলেন ডীন অ্যাচিসন। এঁকে আটলান্টিক মৈত্রীর পাশ্চাত্য-আদর্শভিত্তিক রাজনীতিক-স্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এঁর প্রেরণায় মার্শাল পরিকল্পনা মূর্ত রচিত; উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পশ্চিম ও মধ্য-য়ুরোপের অর্থনীতিকে পুনর্বার জীয়োনো। সুদূর উদ্দেশ্য সোভিয়েত-প্রভাবাধীন য়ুরোপের দলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা নৈতিক নেতৃত্বের টক্কর বেধনা। এই "আটলান্টিক অভীপ্সা" (Atlantic spirit) সাম্রাজ্য-বাদী দুনিয়ার রচিত নৈতিক-সাংস্কৃতিক দর্শন। উইলসন-যুগের আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ যদি ঔপনিবেশিক শোষকের একচিপায় শোষণনীতি নির্ভর করে থাকে আটলান্টিক আদর্শ অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক রূপকে আমেরিকার সফল প্রবেশ ঘটে উপৌদ্যোগিক শোষণনীতি রচিত করবে। এর পর থেকে আমেরিকার বিশ্ব-প্রভৃতী (world-view) বলবতীয় আগ্রাসী ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছে—যে ভূমিকা সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির যারা পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পুরস্কারী, এক নৈতিক দাওয়াই। এহেন রাজনৈতিক নীতি-দর্শন বলা বাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের দুই জাতীয় দল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দুয়েরই সমর্থন লাভ করেছে। রিপাঃ প্রেসিডেন্ট আইজেনহাউয়ার যেমন, তেমনি ডিমোঃ প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিও এই আদর্শের তাত্ত্বিক পরিপোষক ছিলেন। কেনেডি তাঁর প্রসিদ্ধ অভিষেক ভাষণে (১৯৬১) আশ্বাস দেন, এই আদর্শ-বহ্নিকা জ্বালিয়ে সারা বিশ্বে তার জ্যোতি ছড়াবার জন্য সংগ্রাম করতে, "যে কোনো মূল্য দিতে, কঠিন থেকে কঠিনতর বোঝা কাঁধে নিতে।" আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণের এই অধ্যায় প্রমাণ করে, সারা পৃথিবীর রাজনীতিকের আমেরিকার নজরে এক এবং অবিভাজ্য। বস্তুত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির মৌল সূত্র হল undifferentiated globalism অভীষ্য পরিগ্রহণ করে এই সময় থেকেই।

অথচ এহেন দুরভিসন্ধি, সমকালীন আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধাতা এ্যাচিসন সাম্রা-বাদী চীনের অভ্যুদয়ে (এবং আমেরিকার বশংবদ চীয়াং কাই-শেকের কুরোমিনটাং


রেশম শিল্পী

বাংলার সিল্ক, তসর, গরদ, বুটিকা

আধুনিক ফ্যাশনের

ছাপা শাড়ী, শার্টিং, সুটিং

খাদি বস্ত্র

বিক্রয় কেন্দ্র

বি, বা, দি বাগ, কলেজ, পঞ্চিয়াহাট, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকা.

হাওড়াস্থ, আলাবেড়িয়া, দুর্গাপুর (বেনাচিতি),

তাম্রবাজার (হুগলীর বিপণীত)

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায়

মহাসংঘ লিঃ

১২১), চেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

খাদি কমিশন অনুমোদিত

সরকারের বিরোধে) এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, লোকতন্ত্রী চীনরাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত এমন অভিমতও ব্যক্ত করেন। ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারকে তখনো অনুমোদন করেন এবং পরবর্তীকালে (অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ, ১৯৬৫) প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে বৈরাগ্য ও আত্মসংযমের ভেক আমেরিকার শাসকশ্রেণী-মানসে দেখা যায়—ম্যাকার্থি-আমলের ভাইমী-শিকার মনোবৃত্তির আমলে—তার কারণ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণে সন্তুলনের অভাব।

### সাম্রাজ্যবাদী নীতির পেণ্ডুলম

অ্যাচিসন রচিত আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থভাবে "যথার্থবাদে"র ভিত্তিতে, তাঁর ভাষাকৃত আন্তর্জাতিক শক্তি সন্তুলনের নীতি অনুসরণে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়া এই realism আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর স্বার্থে। সুতরাং আন্তর্জাতিক নীতি-উপায়ের এই যথার্থবাদী বোধ "প্রকৃত" অবস্থা যাচাই করে শক্তি-সন্তুলনের (Balance of power) সূত্রে। অ্যাচিসন প্রস্তাবিত বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তাঁর উত্তরসূরী হেনরী কিসিঞ্জার বাস্তবে রূপায়িত করেন, বিকশিত করেন তাঁর পরিকল্পিত "নৈতিক-তার সমন্বয়ে রাষ্ট্রকলা" তত্ত্বের কাঠামোয়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু বিশ্ব রাজ-নীতির রঙ্গমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সন্তুল-নের সূত্র প্রয়োগে এত বিরাট গলদ থেকে গেছলো; সেটা প্রমাণ হয় ভিয়েৎনামের ক্ষেত্রে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের এত বড় বিপর্যয় ঘোষণা হয়নি। ভিয়েৎনামের মত ছোট দেশ, যার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের জনসংখ্যা মিলিয়ে তিন কোটির কাছাকাছি চাষার, যেখানকার সাধারণ মানুষ যোদ্ধা, বনকে মেরে খাবার অভ্যস্ত, যেখানকার প্রকৃতিদত্ত সম্পদ অত্যন্ত সীমিত, যে-দেশে আগামী সাম্রাজ্য-বাদী শাসক সেনাবাহিনীর কেবল-মাত্রা কিছু অস্ত্রশস্ত্রের বদলে ছাড়া তার কাছ থেকে আর কোনো উৎস মূলিয়ানার প্রশ্ন অবান্তরে উপস্থিত ছিল না, সেখানে অপ্রতিরুদ্ধ ক্ষমতা মহাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র পরাস্ত হল। আপাতদৃষ্টিতে এমন পরিণতি অচিন্তনীয় ছিল, অবিশ্বাস্যও। এর কারণ, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব প্রভাবী অধিকার সেই অন্তর্বর্তী ভবিষ্যৎ শক্তি সাম্রাজ্য-শাসন করেছিল যা তার নীতি-বিশ্লেষকরা বারবার এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নীতিমূল্যা-য়নের মাঝখানে পৃথক ও পরস্পর বিরোধী হয়ে যাওয়া। যে মানবিক অধিকারের মৌল সূত্র আমেরিকার নেতৃত্ব আপন প্রশাসনাধীন এলাকায় চালু করার দাবী করেছিলেন, সেই অধিকার খুন উপস্থিত হয় ভিয়েৎ-নামে। কেবল তাই নয়। ভিয়েতনাম-নিবাসীদের চোখে এই উদ্যম নয় ও বীভৎস রূপে ধরা পড়ে। শ্রমিক ও কৃষক-দের সর্বপ্রাসগ্রাসী-নেতৃত্ব দারা ভিয়েৎনামের জনগণকে যোকাবেলা করতে হয়, তারা কি ভয়ানক ভাবে অধিকার-বঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তাদের সমগ্র জীবন কতদূর বিকৃতির, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে তারা কত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। ক্রমশঃ ধরাটুরী প্রথম অবস্থের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভিয়েৎনাম ফেলে যায়, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে সরে যায় আপন রাষ্ট্রহিতের খেয়াল রেখে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে কমিউনিজম-বিরোধী অভিযানের একমাত্র "পুলিশ-প্রধান" রূপে চালিয়ে যায় তখন যত। ফলে, আন্তর্জাতিক নীতি-মূল্যায়নের পূরীত যান তার খাটো হয়ে তো যায়ই, উপরন্তু অর্থ-নৈতিক জটিলতা দেখা দেয় ১৯৭০ দশকের প্রারম্ভ থেকেই এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুরো কাঠামোটাই সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভিয়েৎনামী রণাঙ্গনে আমেরিকার সেনা ও আকাশবাহিনী তথা যুদ্ধাস্ত্র তথা দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের এতাদিক বিপুল সরকার ও পরে কম্বোডে আর এক বিপুল এক বল সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যোগাতে। এই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ-বাদী সম্প্রদায়ের ক্রান্তিকাল বলা যায় যেন্তু সময়ের চরম দোলনসীমা অতিক্রান্ত যাচ্ছে। মূল্যের মূল্য স্থায়িত্বের সা [illegible]। বিশ্ব আমে-রিকার মুদ্রা ডলারের মূল্য হ্রাসের পরাম্ভ এই সময় থেকেই হয় আরম্ভ। কোটি-অর্থ সমে ভিয়েৎনামী যুদ্ধব্যয়ের বোঝা দেশ স্বল্প মূল্যে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বহির্বা-ণিজ্যিক ক্ষেত্রে যার চুক্তোবোর অবস্থায় এতদিন যে মন্থরিত স্থিতি ছিল, তাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ের অবস্থা করে। [illegible] সময়ের "Shaky Dollar" শীর্ষকে লেখা যা পড়ে P.I.A. Press Agency, New Delhi এ বুলেটিনে (Special Number Feb. 10, 1971) প্রকাশিত হয় "Dimensions of inflation in U.S." শীর্ষকে দ্রষ্টব্য।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধিযুদ্ধ হস্তক্ষেপ করার পেছনে কোন চাপের (pressure group) রাজনৈতিক চাপ এবং কার কাজ করেছিল, এ প্রশ্ন ওঠা যায়। ভিয়েৎনামের সরাসরি যুদ্ধি ঘটে এপ্রিলের শেষ, ১৯৬৫ এ, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের অনুরোধিত পত্রের ফলে। পত্রের কারণ সামরিক নয়, রাজ-নৈতিক। যে সময় যে ভিয়েৎনামের সেনা-বাহিনী ছোটখাট যুদ্ধরত, উপযুক্তরূপে শস্ত্র সজ্জিত। হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ প্রধানত আমেরিকার কূটনীতিবিদ তথা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বমহাশক্তির যুদ্ধের রাজনীতি-সরকার ভিয়েৎনামীকরণের

নীতিতে পাওয়া যাবে। এই নীতি ১৯৭১-এ আমেরিকার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরকালে যৌথকমিউনিকে ও চীনের সোভিয়েত সঙ্গে যৌথভাবে আমেরিকা বিরোধি প্রস্তাবের পর।

আমেরিকা বিরোধিতে কেউ কেউ মনে করেন ভিয়েতনাম কুটকৌশলের ফল। আসলে এটা ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নবগৃহীত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক প্রসার। এটা সম্ভব হয়েছিল চীনের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী (world-view বা weltenschaung) যে কি তা আমেরিকার নীতি-নির্ধারকদের বুঝতে পারা। চীনের রাজনৈতিক প্রত্যক্ষণ (appreception) ত্রিমেরু-রাজনীতির অনুকরণে নয়। চীন মনে করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তিনটি বিশিষ্ট বাস্তবতা লক্ষ্যণীয় ভাবে দেখা যায়, সংক্ষেপে তিন দুনিয়া। প্রথম, শিল্প সমৃদ্ধ, অর্থনৈতিক পূর্ণ-বিকশিত, সাম্রাজ্যবাদী দুই বিশ্ব-মহাশক্তি (Super-power)—এক নম্বর, ঐতিহ্যগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা; দুই নম্বর, বিচ্ছিন্ন সমাজবাদী শক্তি সোভিয়েত রুশ। দ্বিতীয় জগত, শিল্প বিকশিত, অর্থনৈতিক-অর্থনীতিসম্পন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্র—যার মধ্যে অনেকগুলিই একালে স্বাধীন পদ্ধতিতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ অধিকার করেছে, কিন্তু বর্তমানে দুই মহাশক্তির যৌথপ্রভাব প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তারের ফলাফল ভোগ, সুতরাং সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ অর্জন বা রক্ষা করা দূরে থাক আপন রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার শুল্ক ও বৈদেশিক সম্পর্কস্তরে (যার মধ্যে বহির্বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ) স্বাধীনতা বজায় রাখতেই ব্যতিব্যস্ত। তৃতীয় জগত, স্বল্প বিকশিত ও বিকাশমান অর্থনীতি সম্পন্ন রাষ্ট্র, সদ্য স্বাধীন এবং অল্প-অতীতে উপনিবেশ দশায় থাকার ফলে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে সমাজ-রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের চাপে ভারাক্রান্ত। চীনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই তিন দুনিয়ার পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাতের শক্তি-আন্দোলনে আন্দোলিত। ১৯৭১ সাল থেকে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি-নির্ধারকরা মস্কোর বাস্তব চেতনা—ম্যাকনামারার "যথার্থবাদ" প্রবর্তিত চেতনা বারবার যাচাই করেছেন—নতুন আলোয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও যাচাই করবার জন্যে অর্জন করে। এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে খোলা ও উদার মনের অধিকারী কতিপয় সাংবাদিক লেখক ও পত্রকার। [যথা : Edgar Snow —এঁর প্রসিদ্ধ বইগুলি পরিচয়-প্রসঙ্গের অপেক্ষা রাখেনা—"Red star over China"; "other side of the river"। দ্বিতীয় জনের : Anna Louis Strong এঁর "Letters from China" দ্রঃ]

আমেরিকা যেভাবে হলেও বুঝতে পারে চীন দুই মহাশক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব, স্পর্ধা-প্রতিস্পর্ধার মধ্যে নিহিত বিরোধটাকে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রধানতম উপাদান মনে করে (The major contradiction in international affairs)। আমেরিকানরা এক নবীন জাতি, স্বদেশের এক বৃহৎ বেশ কাছে গত বেশ শতাব্দী ধরে ক্রত বিকাশের গতি (slang ভাষায় টেম্পো) বজায় রেখেছে শিল্পে, কৃষিগত উৎপাদনে, বৈজ্ঞানিক ও প্রাবিধিক বিদ্যার প্রসারে। তাদের পক্ষে চটপটে ব্যবহারিক জ্ঞান (pragmatism) প্রয়োগ করা স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। তার ফলে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে চীন সমাজবাদ পথভ্রষ্ট সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রুশদেশ মহাশক্তিকে অপর মহাশক্তি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী বিপজ্জনক মনে করে; কারণ রুশ তুলনায় বেশী সমাজতান্ত্রিক এবং অক্টোবর ১৭-র বিপ্লবী ঐতিহ্যের বল রেখেছে তৃতীয় জগতের কম বিকাশ প্রাপ্ত (সুতরাং রাজনৈতিক পরিপক্কতার কম প্রাপ্রসর) দেশগুলির নেতৃবর্গ তথা জনগণের বেশী বিশ্বাস করতে পারে। আমেরিকার উচ্চকোটি-প্রশাসনিক মহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে পরিপক্কবুদ্ধি বলে এ্যাচিসন-ডালেস-

তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্পীর সেবায় নিয়োজিত

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম উইভার্স

কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় :
৬১, বহীলাল চেম্বার্স ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ৩৫ ৩৬৩৮

নগর কার্যালয় :
৪৮, বিপ্লবী অরবিন্দ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন : ২৭-৮০১২

ব্যাকার্থী যুদ্ধে অন্ত কমিউনিজম বিরোধী ও তার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবার জেদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

৭০ দশকের গোড়া থেকে সেপ্তেম্বরের গতি ও দিশায় এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। ১৯৭০ সালের শুরুতেই বৈদেশিক নীতি-বিষয়ক কিসিঞ্জার ভিয়েৎনাম থেকে সমস্ত যুদ্ধবিধ্বংসকারী সৈনিক ও সমরসম্ভার সরিয়ে নিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে আমেরিকার অন্তর্ঘাত যে হস্তক্ষেপের নীতি কুটতা ও বর্বরতা তীব্রতর স্তরে পৌঁছেছিল তার জের অনেককাল ধরে চলে। সুতরাং চাইলেও ভিয়েৎনাম থেকে সরে আসা ও সরিয়ে নেওয়ার নীতি কার্যকরী করা কঠিন ছিল। তাই, প্রয়োজন হয়েছিল একটা ঠেকোর, যাতে পশ্চাদপসরণের পটভূমিকা রচনা করা সম্ভব হয়। এই ঠেকোর নাম ভিয়েৎনামীকরণ (Vietnamisation)। ভিয়েৎনামীকরণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঐ রণাঙ্গন থেকে সমরবাহিনীকে বের করিয়ে নেবার পর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা জেরা দেখা দেয়—না আমেরিকার অস্ত্র-লেনদেনের জাতীয়তাবাদী মহলে, না আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র পক্ষ-বিপক্ষের ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে Coral Bell তার গ্রন্থে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, কিসিঞ্জারের দায়িত্ব ছিল, সৈন্য সামন্ত যুদ্ধোপকরণ নিয়ে হটে যাওয়ার কাজটা এত বিলম্বিত করে চালান হয়, যাতে এর পরিণামে কোনো ঝুঁকি না আসে। এঁর ভাষায় "The dichotomy between the need to disengage and the need to minimise the consequences of doing so, was met by the policy of diplomacy, delay and 'Vietnamisation'—the latter being intended to make the South Vietnamese Army equal to the task of defending its bases without outside help except the supply of weapons...the domestic and international consequences that Kissinger felt must be avoided was avoided...Delay and the abdication of responsibility by Vietnamisation did the work admirably well." (International Affairs-" 1977 সংখ্যা)

### "বিয়োগান্তিক নাটকের চরম মুহূর্ত ভিয়েৎনাম"—কিসিঞ্জার

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ নীতি চালনায় কিসিঞ্জারকে কি এ যুগের নবজাগরণ বলব? কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, যাঁর ২৫ বছর বয়সে লেখা থীসিস দীর্ঘদিন দেকালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঐতিহাসিক মেটারনিখের কূট-রাজনীতি ও রাজনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কদের কার্যপদ্ধতির ওপর আলোকপাত করে সেই যুদ্ধজীবী কিসিঞ্জারকে ইগোয়া করতে পারেন ভিয়েৎনামী আক্রমণের পরিণাম স্বরূপ আমেরিকার মনস্তাপে তার catharctic effect অর্থাৎ আত্ম কালনের প্রভাব।

কিসিঞ্জার আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অবদান রেখে গেছেন, (১) বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা নীতি-আক্রমণ এবং রাশানক রূপে; (২) কূটনৈতিক সম্পর্ক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-কেন্দ্রাভিত কূটনীতি-পদ্ধতির (personalized diplomacy) বিস্তার সাধন করে, এবং (৩) সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণশীল ঘাতক হওয়া সত্ত্বেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী লোকপ্রসরণী চীনের দিকে আমেরিকার সামরিক-রাজনৈতিক দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, এদের কিসিঞ্জার এক বিতর্কিত ব্যক্তি। কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যখন আজ "আত্ম সংহার বেলা" এসেছে—যে ক্রান্তিলগ্নে—বিচার করতে হবে এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বর্তমান কালে এঁর ভূমিকা কিন্তু দুনিয়ার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অতুলনীয় মহত্ত্বের ছিল।

অবশ্যস্বীকার্য কিসিঞ্জারের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চালিত কূটনীতি, চিরাচরিত আমলা-চালিত কূটনৈতিক পদ্ধতির সমালোচকদের বার বার করেছে বিচলিত। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সহ-বৈদেশিক মন্ত্রীর সমকক্ষী সমালোচনী তীব্র বক্র। এঁর মতে: কিসিঞ্জার যদি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে তাঁর দিক-নির্দেশের বাহক চালানীতে পরিণত করেছিলেন। কথাটা সত্য-মিথ্যার যেলাযেলা এক হাতকর পর্যায়ের কিসিঞ্জার যে সফলভাবে বৈদেশিক সমস্ত এবং আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণের ভার ও দায়িত্ব তাঁদে নিয়েছিলেন, সে যুগে তাঁর পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ ভূমিকা না হয়ে উপায় ছিল না। এ সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব কোয়াসে যেন করেছেন: যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক দপ্তরের রাজপ্রাসাদ) "সকল সেক্রেটারিই তাঁদের উপদেষ্টাদের কথায় উঠছ বিসছ করেন সুতরাং মিঃ কাটার এবং তাঁর সহকারী নীতি বিশারদ কিসিঞ্জারের সাফল্যের দুরপ্রসারী কলাকলের তুলনায় বিশেষ তারতম্য হবেন এতে সন্দেহ নেই মজার কথা যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না তা হল, কূটনীতির প্রক্রিয়া ও শৈলীতে এক পরিবর্তন সূচিত হয়ে চলেছে, একক পরিচালনের প্রয়াস থেকে বহুমুখের যৌথ-প্রচেষ্টার দিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া ও শৈলীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রূপে এ সময় সাম্প্রতিক কার্যধারা বেশী সুবিধাজনক মনে হচ্ছে বটে, তবে

সমূহ (যা চীনে অন্তর্ভুক্ত খোলাফাতের 'সোভিটিজার' নিচে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। ফলে, সমালোচনার সম্ভাবনা যায় অনেকটা মতৈক্যের মোহাট ঘিরে। প্রধান বিষয়ে এ মতৈক্য, প্রেসিডেন্ট কার্টারের 'টীমে' যেই লোকগুলির অন্তর্ভুক্তিতে, যারাই ছিলেন হাল্লী আমেরিকাকে ভিয়েৎনামের ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলার মূল প্রবাহে।"

ভিয়েৎনামের ব্যাপারে আমেরিকাকে যে প্রচণ্ড খেসারৎ দিতে "(International Affair's—পূর্ব উল্লিখিত) হয়, তার সঙ্গে তুলনীয় তীব্র এ্যাডিসনের আমলে প্রাক-বিপ্লব রুশোমিনটাং চীনের সরকারকে ২,০০১,১০০,০০০ ডলারের অনুদান—যা কোনোদিনই উশুল হয় নি। এছাড়াও প্রায় ১,০০০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের রণ-সামগ্রী ও বেসামরিক পণ্য, যা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে বাড়তি হয়েছিল, সঞ্চয় যায়। (সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যাচিসনের লিখিত চিঠির অংশবিশেষ থেকে নেওয়া। এই চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইটপেপার দ্বারা এই আগষ্ট ১৯৪৯ তারিখে প্রকাশিত হয়।) অথচ ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী স্তালিন যে সন্ধি ব্যবস্থা করেছিলেন রুশী এবং তৎকালীন রুশোমিনটাং জাতীয়তাবাদী সরকার-অঞ্চের মাঝে (স্বাক্ষরিত হয় আগষ্ট ১৪, ১৯৪৫) তার ফলাফল আমেরিকার অনুকূলে —যত কম-বেশি—যদিওবা আসতো, সেই সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয় উপরোক্ত রুশোমিনটাং সরকারের বিদায়ে এবং তার স্থানে ক্ষমতাসীন প্রোলেটারিয়ন (সর্বহারা শ্রমিকবর্গ) একনায়কত্বাধীন লোকগণতন্ত্রী চীনের অভ্যুদয়ে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এহেন বিপর্যয় সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীতে, বিশেষ তার দীর্ঘ মহলে এক তিক্ত আত্মহননকারী আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে, ঐ শাসকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তির নিয়ন্ত্রিতপতি তথা আন্তর্জাতিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের চালকচক্র তথা প্রশাসনিক শিখরে আধিপত্য বৃহৎ আবদ্ধ ও মিলিটারী বাহিনী অধ্যক্ষদের ঝোঁক সুযোগ পায় আমেরিকার অন্তরঙ্গে এবং অভ্যন্তর ন্যাশনালিজমের দিকে (National Chauvinism) মিয়ে যেতে এবং সারা বিশ্বে কমিউনিজম-বিরোধী অভিযানের আবহাওয়া তৈরি করতে যে ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ অব-ধারিত হয়ে ওঠে।

ভিয়েৎনামের বিপর্যয় সামরিক অর্থে নয়, রাজনৈতিক এবং নৈতিক অর্থে নিতে হবে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট কিন্তু সঙ্গে আরও অনেকটি ব্যাপি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। যথা (১) ওয়াটারগেট-কাণ্ডী জাতীয় আজ সমালোচনা করার আধিকারের কাড়, যার জের হিসেবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বিদায় নিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুরোক্র্যাটদেরকেও, (২) সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী নামী গুপ্ত গোয়েন্দা সংস্থার যারা আপন দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের পেছনে লাগায় এবং বিরোধী মতাবলম্বীদের বিকৃত-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করবার যে একটানা চক্রান্তকারী ইতিহাস তা ফাঁস হয়ে যাওয়া, যার প্রতিফলন ঘটে আমেরিকার সমাজে তীব্র আলোড়ন। এ সমস্তই কিসিঞ্জার জানতেন। এ ঘটনাগুলির যে পারম্পর্য ছিল এবং এদের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া একের পেছনে একের পর্যায়ক্রমে যে বইতে থাকবে, তাও জানতেন। তাই ডিসেম্বর, ৭৮-এ নিউজ উইক পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অবসরে প্রেসিডেন্ট কার্টারের উক্তি (যে, তাঁর প্রেসিডেন্ট-পদ গ্রহণ করার সময় যুক্তরাষ্ট্রের সুনামের তল অত্যন্ত নিচে ছিল ভিয়েৎনাম, ওয়াটারগেট কাণ্ড এবং সি আই এ-র দুষ্কর্মের ফলে) তার উল্লেখ করেন ও বলেন, "এর পরিণামে আমেরিকার বিদেশীয় সহযোগিতা (কার্যপালিকা-কর্তৃপক্ষের প্রতি) পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে।"

কালক্রমে, বাস্তবিক অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট আজ আপন দলের মধ্যে প্রায় একঘরে, রিপাবলিকানদের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূর কথা। এমনটা হল কেন? আমেরিকার আত্মবিস্মৃতি?

পীতাভ গোধূলি: গণতন্ত্রের নৈতিক রসদ কি নিঃশেষ?

প্রবীণ ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিজ্ঞ ট্যোকেভিলে আমেরিকা

ভোটার হ'ন আর নাই হ'ন
আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে
অনার্য মিত্রর
হাড় জ্বালানো ছড়ার বই
গণতন্ত্রের মিঠাই
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম: এক টাকা

গণতন্ত্রকে উজ্জীবিত, সুসংগঠিত করে তোলা সম্ভব হবে। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার ভাষ্যকার ওয়াল্টার লিপম্যান ১৯৪৭ সালে লিখেছিলেন : "আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, কি করে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য এবং কার্যকরী সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়।...হেনরি কিসিঞ্জার আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলি আপাত আমরা এমন হঠকারী দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম, যা আমাদের দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাকে নিচে নামিয়ে দেয়। আমাদের প্রশাসন অবশ্যই দাবী করতে পারে যে, মানবিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটা মূল্য, আইনসঙ্গত ও বাঞ্ছিত বিষয়, এটা হল আন্তর্জাতিক আইনী মানবতা রক্ষার প্রশ্ন, মূলতঃ যে সম্বন্ধে আমাদের দেশে দু'টি দলের উদ্যম একমুখী।" ["Morality and Power" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত : হেনরি কিসিঞ্জার]।

লক্ষণীয়, উপরোক্ত বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট কার্টার মহাশয়ও ঐ এক সুরে মানবাধিকার সম্পর্কে জোর দিয়ে আসছেন, নিজে তো বটেই, প্রশাসনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানদের মুখ দিয়েও এই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কেন? সোভিয়েত রুশের নেতৃত্বকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নৈতিকভাবে বেকায়দায় ফেলা? ষ্ট্রাটেজিক ক্ষেপণাস্ত্রের বাড়, প্রসার ও সংখ্যা সমান্তরাল করার উদ্দেশ্যে S. A. L. T. বৈঠকীতে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির পূর্বাভাস? অথবা, সোভিয়েত রুশ যাতে সে দেশ থেকে লিখিত ও দেশানুশাসনী ইহুদীদেরকে ইস্রায়েল যাবে যেতে দেয়, তথাকার নাগরিকত্ব নিতে অনুমতি দেয় এবং তাঁরা যাতে সরকারী রাজপত্র বিক্রয়ন আরও অবাধ আরও সহজ করে, সেই উদ্দেশ্যে কি কোনো রাজনৈতিক তথা নৈতিক চাপ? এর প্রত্যেকটাই মূল উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে কথা সেভাবে নিয়ে সেভাবে সম্ভব হয়নি। থেকে থেকে মানবাধিকার সম্পর্কে নানা বিবৃতি দিয়ে মধ্যে কে চটানো গেছে কিন্তু কাজ হয়নি। বেলগ্রেডী মিয়াদান্তা চুক্তিতে এমন কোনো পথ সংযোজিত করানো সম্ভব হয়নি আমেরিকান প্রতিনিধির উপর্যুপরি প্রয়াসসত্ত্বেও, যার ফলে নিয়ে ইস্রায়েলে ইহুদি জনসংখ্যা বাড়ানো—সোভিয়েত নেতৃত্বের রাজনৈতিক আত্মকলহ—চলতো। মাঝের মধ্যে, কার্টার মহাশয় যখনে জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছেন—অতি নৈতিকতাবাদী, বাস্তবিক সত্যাসত্যতার প্রচারক, প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রয়োগসক্ষম দিকার নিতে অক্ষম, এই-টিপিকে তো ঐ-টিপিকে ("flip flop president") অনুসরণী হাইপ্রফাইল—এ ভেবেছেনে—এমনি অনেক বিশেষণ তাঁর জুটলো। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী 'টেডী' কেনেডি আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী মনোনয়নের দিকে এগুচ্ছেন, যাচ্ছে তাঁর ভাবমূর্তি, তাঁর আমেরিকান এ্যাটিচুডের দৃষ্টিতে, সুদৃষ্টি সম্পন্ন আচরণ বলায় হবার। এবং যাচ্ছে তাতে তাতে ডেমোক্রেসের প্রধান, আমেরিকা-ডেমোক্রেসি, উৎপাদনিক ব্যবস্থার স্বাধীনতা, মুদ্রাস্ফীতি—কি নয়?

পাদটীকা

বক্তব্যের বিস্তারের প্রয়োজনে ডেমোক্রেসি হল না। কারণ, তা বিষয়ক পরিভাষার আবহাওয়া সৃষ্টি করে, ডেমোক্রেসি সংক্রান্তে বিশেষ কাজ দেয় না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যেন কোনো ভাল লাইব্রেরিতে Henry Kissinger এবং Z BIGNIEW BRZEZINSKI-র বই ও Prof. Reich এর "The Greening of America" পড়ে নেবেন। প্রবন্ধে উল্লিখিত আমার "Dimensions of inflation in U. S : IMPACT and Policy" থেকে নিচে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিলাম। [Source : I. P. A. Special

issue 10-2-1971) "The value of Dollar has been falling almost continuously over the past thirty years or more. Compared to its purchasing power in 1939 (base year 100), it could buy only 46.9 cents(46.9 per cent)worth in 1960, 44·1 cents in 1965, and 37·9 cents in mid 1969. If the down-swing cotinues thus, the proportionate level would be 36 cents this year. Pavi passu with this fall, U. S A. has been facing balance of payments deficit, and her world export does not command the same volume and return as before. The national budget too is suffering imbalance as a consequence. President Nixon himself admitted that the total budgetary deficit of the country amounted to 5·7 billion—an astronomical figure! (State of the union message, early this year.)

Excerpt from : "The new Global Challenges" by ZBIGNIEW BRZEZINSKI : Source : The "Encounter" : August, 1972) : "As Yankee pre eminence fades, can the U. S. A strike a new balance, a new relationship of stability with the southern hemisphere? On the Soviet side, an even younger and in some respects perhaps more vigorous imperial system clearly is not acquiescing to the dismantling of its vast imperial assets.... We confront novel diplomatic and power complexities stemming from a new triangular configuration in the world. This is the Washington-Moscow-Peking relationship, which has now dramatically surfaced with urgency and importance. There is also the Washington-Moscow-European relationship which involves such issues as the OSTPOLITIK and the European security conference... new powers are stepping forth as would-be regional powers---India clearly sees itself now as the dominant power in the Southern Asian continent and perhaps as a major Asian power challenging even China." [আত্মপ্রকাশ থেকে]

# ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের স্থান

## কল্যাণ ঘোষ

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলারা অনেক পিছিয়ে-রয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে (সংখ্যার দিক থেকে তুলনা করলে) পুরুষরাই ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একত্রিশ বছর অতিক্রান্ত। দেখে এ পর্যন্ত যতবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছে তাতে নির্বাচনপ্রার্থী মহিলার সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ১৯৫২ সাল থেকে অদ্যাবধি যতবার সাধারণ নির্বাচন (লোকসভা) হয়েছে তাতে মোট মহিলা নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৮৩ জন এবং পুরুষ নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৮৮৭ জন। ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে মহিলা নির্বাচনপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৩৭১ জন এবং পুরুষ নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭৪২ জন।

ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার। ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ভোট মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা ৬১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ ১৫ হাজারে। আরও জানা গেছে যে, ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১১টি রাজ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগকারী মহিলার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ ১১ হাজার ৫৮৫ জন। ১৮টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিগত নির্বাচনে মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, মহিলারা ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে তারা এখনো পুরুষদের চেয়ে অনেক পেছনে রয়েছেন।

প্রথম লোকসভার নির্বাচনে ৪৮৯টি আসনের জন্য মোট নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৭৪ জন। তার মধ্যে মহিলা নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ জন। নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন মাত্র ১৬ জন। ১৯৭৭ সালে ষষ্ঠ লোকসভার নির্বাচনে ২ হাজার ৪০১ জন নির্বাচন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র ৭০ জন। তার মধ্যে সফল হন মাত্র ১৯ জন মহিলা। ওদিকে রাজ্যসভাতে ১৯৭১ সালে ২৪৩টি আসনে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৪ জন। বর্তমানে রাজ্যসভায় মহিলার সংখ্যা ২৩ জন।

অপরদিকে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনেও মহিলাদের অংশগ্রহণের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ১৯৬২ সালে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে ৩ হাজার ১৮৩টি আসনের জন্য ১৫ হাজার ৩৬১ জন নির্বাচন প্রার্থীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬১ জন। তার মধ্যে কেবল মাত্র ৬১ জন নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনে ২ হাজার ৮৭১টি আসনের জন্য মোট নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন ১৮ হাজার ৮৩৯ জন। তার মধ্যে মহিলা নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৭ জন এবং নির্বাচনে জয়ী হন মাত্র ৮১ জন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্বও খুব কম। সাধারণত কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবেই মহিলাদের দেখা যায় এবং যে কয়জন তাদের দেওয়া হয়ে থাকে তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অদ্যাবধি কেবলমাত্র ২ জন মহিলা ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। তার মধ্যে একজন হলেন প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী এবং তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হবার আগে পূর্ণ মন্ত্রিসভায় শ্রীমতী গান্ধী তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ছিলেন এবং তখন তিনি ছিলেন রাজ্যসভার সদস্যা। বর্তমানে এবং জোহারলী সরকারের আমলে কেন্দ্রে কোন মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী নেই এবং ছিলেন না।

সম্ভবত ১৯৬২ সালটাই মহিলা রাজনীতিবিদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেননা সে সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন ৮ জন মহিলা, রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলিতে পূর্ণমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন ২১ জন মহিলা এবং এই বছরেই লোকসভায় ৩৫ জন মহিলা নির্বাচিত হন এবং রাজ্যসভায় ১২ জন মহিলা মনোনীত হন। ৪৪ সদস্যক দেশাই মন্ত্রিসভায় গঠন হয়েছে। কিন্তু সেই মন্ত্রিসভাতেও মাত্র ২ জন মহিলা ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মর্যাদায়।

রাজ্যগুলিতেও দেখা গেছে যে, মন্ত্রিসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই

সমস্যা। কেরলরাজ্যে কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটকে অতীতে মন্ত্রিসভায় মহিলা পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। এখনকি এখনও ১৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মন্ত্রিসভাতে মহিলারা প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, গুজরাট, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ১৮ জন। এর মধ্যে কেবল ৮টি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট পর্যায়ের বা পূর্ণ মহিলা মন্ত্রী রয়েছেন। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, এবং কর্ণাটক।

যদিও পঞ্চায়েতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি তবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে, পঞ্চায়েতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই নগণ্য। কেরলে মহিলা পরিচালিত সমবায় সংস্থার সংখ্যা হল ৪ হাজার ৬৯১টি। যা কেরলের মোট সমবায় সমিতির মাত্র ১·৫ শতাংশ। মহিলা পরিচালিত সমবায় সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ ২১ হাজার, যা সমবায় সমিতিগুলির মোট সদস্য সংখ্যার ০·৪ শতাংশ।

রাজনীতিতে মহিলাদের পিছিয়ে থাকার বিষয়ে দেশের মহিলা সংগঠনগুলি এখন নতুন করে চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁরা চাইছেন রাজনীতিতে কিভাবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো যায়।

কলকাতায় সংসদে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির যে সম্মেলন হয় তাতে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় মহিলা কেন্দ্রীয় শ্রীমতী অহল্যা রঙ্গনেকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে বলেছেন যে, রাজনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে দেশের তাবৎ রাজনৈতিক দলগুলিকে নড়েচড়ে বসতে হবে। প্রতিটি নির্বাচনে (যে কোন নির্বাচন) প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলির উচিত মহিলাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়া। তা যদি না করা হয় তাহলে বক্তব্যের মূলে প্রধান রাজনীতির কোন পরিবর্তন হবেনা। তিনি আরও বলেন যে, তার দল সি পি এম দলকেও এবিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এই চিন্তা অনেক আগেই তার দলের করা উচিত ছিল। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীমতী রঙ্গনেকার কলকাতায় এসেছিলেন।

# সৎ সিনেমার স্বপক্ষে

## মৃগাঙ্কশেখর রায়

ভাল ছবি, সুস্থ ছবি, সৎ ছবি সবাই চায়, সবাই চান ভাল ছবি হবে এবং প্রচারের জন্য সবাই সচেষ্ট হয়েছে। ইদানীং এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন আলোচনাচক্রে, কিন্তু সোসাইটির কার্যকলাপে সেখাদেখি হচ্ছে বিস্তর। সরকারী উদ্যম-উদ্যোগের কমতি নেই। ছবি তৈরীর জন্য টাকা অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে, সরকারী তরফে শিক্ষাধর্মী ছবি প্রযোজনা করা হচ্ছে, ছাঁচির ছবির আমদানী, লাবরেটরী তৈরী করা হচ্ছে, চালু ষ্টুডিও লাবরেটরীর উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সর্বোপরি ভাল ছবি দেখানোর রাস্তা যাতে সুগম হয়, তার জন্যে বিশেষ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

এ সবই খুব ভাল কথা। আজকাল যখন একটা উৎসাহের জোয়ার এসেছে, সবাই যখন যেন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন, তখন হতাশার কথা, সন্দেহের কথা না তোলাই বোধহয় ভাল। কিন্তু আমার চলচ্চিত্র শিল্পের ভালোয় ভরেই কিছু কিছু সত্যি কথা এই মুহূর্তেই স্পষ্ট করে বলা দরকার। সত্যি কথাগুলো হয়ত আপাতদৃষ্টিতে একটু অপ্রিয় মনে হতে পারে, কিন্তু কথাগুলো মনে রেখে কাজে এগোলে আমাদের এই উৎসাহ আবেগের কিছু ভাল ফল দেখে। শুধু আবেগ আর অন্ধ উচ্ছ্বাসের জোয়ারেই ভাটিতে থাকবে না।

গোড়ার কথা গোড়াতেই বলা ভালো। কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও কাজের ধারা দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো ছবি তৈরী হয়ে পড়ে আছে, শুধু সেগুলো প্রচার ও পরিবেশনা করলেই বুঝি চলচ্চিত্রশিল্পে একটা যাদুর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি সত্যিই সেরকম? বছরের ভালো বাংলা ছবির (আমি "মাষ্টার পীস" বা অসাধারণ ছবির কথা তুলছিই না। ঘোটামুটি পরিচ্ছন্ন রুচি, সুস্থ বক্তব্য এবং পরিণত শিল্পবোধসম্মত ছবির কথাই বলছি) সংখ্যা তো এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায়। তাই ভালো ছবি প্রচার ও পরিবেশনার সমস্যার কথা আমার আগে আমাদের ভালো ধরনের ভালো ছবি তৈরী করবার সমস্যা। এবং সরকারী ও বেসরকারী সব নীতি সেই ভিত্তিতেই প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাথ সাথ টাকা ঢালাও বিলি করলেই ভালো ছবির সংখ্যা বাড়বে না, অহোরাত্র বক্তৃতা বা বড়ো আন্দোলনেও নয়। ভালো ছবির জন্য চাই ভালো চলচ্চিত্রকার, যারা সুস্থ শিল্পচিন্তা আর চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের জ্ঞান এই দুই মিলে আমাদের উপহার দেবেন সৎ শিল্প সত্তার।

ভালো ছবি কাকে বলব? বলব তাকেই যার মধ্যে বাস্তব সমাজ সত্যের প্রতিফলন দেখি, (তা সে সমকালীন কিংবা অতীত যাই হোক না কেন) যে ছবি আমাদের সুস্থ ও সৎ চিন্তায় খোরাক জোগায়, যে ছবি সমাজ জীবনের মানা অসঙ্গতি ও অন্যায় তুলে ধরে, যে ছবি মানবিক, আর্থ-নীতিক ও রাজনৈতিক অবিচার, বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় এবং সর্বোপরি যে ছবি চলচ্চিত্র মাধ্যমের বিশিষ্ট গঠনশৈলীর মাধ্যমে আন্তর হয়ে প্রকাশ করে। এইভাবেই আমরা ভালো ছবির বিচার করব। এই মানদণ্ডে যদি দেখা যায় যে অধিকাংশ বাংলা ছবিই ভালো ছবির দল থেকে বাহিষ্কৃত হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে হা-হুতাশ করবার কিছু নেই। বরং ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে বিচার করে ভালো মানে যাচাই করা যায় তার ওপরেই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

এরপর প্রশ্ন আসে বাংলার ভালো ছবির সংখ্যা এত কম কেন? অনেকে অনেক কারণ দেখাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় কারণ একটাই, শিল্পকলার সঙ্গে চলচ্চিত্রকারের সংযোগ কম বলেই। আমি জানি অনেক হলমা ঘুরপ হয়ে উঠবে, অনেক ভুরু কুঁচকে উঠবে। অনেকেই বলবেন, "এই তো মশাই ষ্টুডিও লাবরেটরীর অবস্থা, ভালো ক্যামেরা, অপটিক্যাল কম্পানি নেই এবং সেগুলির উপর বিদেশীদের একচেটিয়া।" কি করে ভালো ছবি হবে আমাদের দুলিতে তো ভাল ভাল চিত্রনাট্য, সুযোগ পেলে বার্গম্যান, ফেলিনি হকসোয়াকেও তাক লাগিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কি করে হবে?" সবই বুঝলাম। এবং এও জানি যে চলচ্চিত্র যেহেতু একটি যান্ত্রিক মাধ্যম, তাই যান্ত্রিক সুবিধাটা ও উন্নতির সঙ্গে নিবেদন শিল্পের অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; কিন্তু মনিবরে একটি কথা নিবেদন করবার আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি ছড়া প্রবাদ প্রচলিত আছে,

"কালি কলম মন
লেখে তিনজন।"

সেরকম নিবেদনের ব্যাপারেও আমি একটি ছড়া বেঁধেছি। একটু রূপান্তর হলেও কেমন আসে যেমন এবং দুরূহ—

"ক্যামেরা, যুক্তিতর্ক, প্রিন্টার, সেন্সিটার
সবারে ওপর নিবেদন করেন,
নিবি নিবেদকটার।"

অর্থাৎ, যন্ত্র নয়। যন্ত্রের পেছনে যে মানুষ ও মন কাজ করে, শিল্প সৃষ্টি করে থাকে। শিল্পীই হচ্ছে আসল লোক, যন্ত্র তাঁর হাতিয়ার মাত্র। তাই শিল্পীর মানস ও মন যদি ঠিক থাকে, কোন যান্ত্রিক অসুবিধেই তাঁর সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। আমাদের এই আলোচনা বহুপাত্রি এবং ভবাকীর্ণ স্টুডিও ল্যাবরেটরী থেকেই বহু ভালো ছবি বেরিয়েছে এবং বেরোচ্ছে। যদিও সেটা কোন আত্মসন্তুষ্টির কারণ নয় এবং তার মানে এই নয় যে আমরা আমাদের নিজেদের যান্ত্রিক উন্নতির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকব। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকুই যে মনকে যদি বিশ্বাস থাকে তবে ভাঙা জানোয়ারের গাড়িতেও "পথের পাঁচালী" তোলা যায়। আর মস্তিষ্কে গোবর থাকলে একেবারে হাল আমলের জন্য আমদানি করা জানোয়ার দিয়ে "সুবর্ণরেখা"র বেশি এগোনো যায় না। আর লোডশেডিং? সে তো এখন প্রায় নিত্য ঘোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যা কিছু শক্তিসম্পদ সবকিছুরই হাল চালানো হচ্ছে বিদ্যুৎ-শক্তির ওপর। একথা ঠিকই যে অন্যান্য শিল্পের মতন, ছবি তৈরীর ব্যাপারে লোডশেডিং-এর জন্যে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং উদ্যমে ভাটা পড়ছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে অর্থ-ব্যয়বৃদ্ধি, অন্তত সেটা তো ওয়ুহাতের আর একটি ছোট্ট প্রতিবেদন আনাই। সাধারণ ভালো ছবির প্যানশেনে ভাকাবীরা ভালো আবেদনধর্মী মেলোড্রামাধর্মী গল্পের জন্য কি লোডশেডিং দায়ী? দুর্বল চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে কি আলো পাখা বন্ধ থাকার জন্য? বৈশিষ্ট্যহীন পরিচালনা, তৃতীয় শ্রেণীর বিয়েটারি অভিনয়, শিথিল সম্পাদনার ম্যাজমেজে, নড়বড়ে মেট-এর দায়ও কি বিদ্যুৎ ঘাটতির? অতএব নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। নিজের দোষ স্বীকার করুন। ওপরের আত্মসমালোচনা করুন এবং নিজেদের ত্রুটি মেরামতের চেষ্টা করুন। না হলে অদূর ভবিষ্যতে একেবারে তলিয়ে যাবেন। তাতেও বহুরাত্রি রাংবাজারও সবদোষ ঢেকানো যাবে না।

সমস্যার শেকড় ঘরে টান মারলে দেখা যায় যে বাংলা ছবির রোগ শুধু শরীরে নয়, মনের গভীরে। আসলে পুরো মানসিকতাতেই ঘুণ ধরেছে। ছবি তৈরী হচ্ছে আনেক, তরুণ পরিচালকেরাও কাজে নামছেন। কিন্তু বয়সে নবীন হলেও প্রায়-ক্ষেত্রেই তাঁদের একেবারে বাস্তবতার আবহের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য এক পা বাড়িয়ে আছেন। এঁদের কাছ থেকে তাই নতুন কিছু আশা করা বৃথা। ভালো ছবি তৈরী করা কথা এঁরা ভাবেন না। এঁদের একটাই মতলব যে বাজারে যা চলছে, তারই রকমফের ঘটিয়ে সেই মাল তৈরী করা। এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে ভালো ছবি তৈরী হওয়া অসম্ভব।

তাছাড়া শিল্পের সমস্যা ও ব্যবসার সমস্যা এই দুটো জিনিস অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। এমন কি সৎ শিল্পের স্বপক্ষে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁরাও। কিছুদিন আগে কি করে ভালো ছবি তৈরী করা এবং প্রচার করা যায় এই সম্পর্কিত এক আলোচনা চক্রে এক বক্তা একই নিঃশ্বাসে দুটো আপাতবিরোধী বক্তব্য করে গেলেন। তিনি ভালো ছবির জন্য লড়াই করবার একথা খুব বিশ্বাসভাবে বোঝালেন কিন্তু পরেই আবার তিনি বললেন যে প্রায় পঞ্চাশটা বাংলা ছবি রিলিজের অভাবে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। সেগুলোর মুক্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কথা হোল ঐ পঞ্চাশটা ছবির মধ্যে দু-চারটের বেশি তো ভালো ছবি নেই। সুতরাং আমরা যদি ভালো ছবির ব্যাপক প্রচারের জন্যই লড়াইয়ে নামি প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে আমরা কোন ধরনের ছবির জন্য লড়াই করব? আমরা কি "শিল্পচর্চার", "বাবা তারকনাথ"-এর পক্ষে, না "পরশুরাম" "দুরন্ত"-এর পক্ষে। যে কোন লড়াইতেই শিবিরভাগ করে নিতে হয় এবং তা না হলেই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা যারা ভালো ছবিকে মদত দিতে চাই, তাদেরকে পরিষ্কার মেনে নিতে হবে যে বাংলা ছবির প্রাক-সত্যজিৎ পর্বের প্রবহমান বস্তুবা-নিষ্ঠ থিয়েটার-এর প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের (কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে) সঙ্গেই আমাদের লড়াই।

এই লড়াই ছবি তৈরীর সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, অর্থাৎ পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী, তাঁদের মধ্যে যারা ভালো ছবি চান তাদের একটা ছাড়া দিতেই হবে। তাঁদের বলতে হবে যে খারাপ ছবি, অসুস্থ ছবি, অনৈতিক ছবির সঙ্গে তাঁরা কোনভাবেই জড়িত থাকবেন না। আমি জানি এই মন্তব্যের ফলে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই। অনেক শিল্পী ও কলাকুশলী বলবেন "কেন মশাই, আমরা তো পেশাদার যেখানে দুটো পয়সা পাব সেখানেই কাজ করব।" আবার কেউ কেউ বলবেন "আমরা তো যাতে তাতে ভাল ছবিতে ভাল কাজও করছি। সুতরাং অসুবিধে তো কিছু নেই।" এই দুটো প্রশ্নেরই সহজ উত্তর আছে। প্রথমত, পয়সার জন্য যদি সবকিছু করা যায়, তাহলে পেশাদারী শিল্পী আর বাজারের বেশ্যায় তফাৎ কোথায়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে সে অনুরোধে তো অনেক সৎ চলচ্চিত্রকারও দিতে পারেন। ধরুন সত্যজিৎ রায় কিংবা মৃণাল সেন যদি বলেন "দেখুন ভাই, আমরা তো 'চারুলতা'

ও 'কলকাতা-৭১'এর মত ছবি করি। কিন্তু মাঝে মাঝে পয়সার জন্য 'যদি প্রেমের প্রেমায়' কিংবা 'অন্ন যা বিপদশালিনী' তৈরী করি তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাঁরা তা কোনদিনই বলবেন না। কারণ সংশিল্পী যারা সরকার বিরোধের ক্ষেত্রে কোন রকম আপোষ রফা তাঁদের স্বপ্নেরও অতীত। তাই ভালো ছবির জন্য যারা আজ লড়বেন তাঁদেরও একই রাস্তা ধরে চলতে হবে।

এরপর আসে ভালো ছবি প্রচারে সরকারী ভূমিকার কথা। দুঃখের কথা, বর্তমানে এ ব্যাপারে সরকারী তরফে দরিদ্রের অভাব নেই, টাকার বহরেও ঘাটতি নেই। শুধু সরকারী নীতির কর্পাবণে সাধারণতঃ যে পরিমল ও লালকিতার উৎপাত থাকে তার পুনরাবৃত্তি যেন এখানে না হয় সেটাই অনুরোধ। তাছাড়া ছবি তৈরীর জন্য সরকারী অনুদানের ব্যাপারে আর একটু বাড়াই দরকার। আর অনুদানের অঙ্কটা খুব বড় না হবার ফলে একটা গোলমাল হতে পারে। কারণ, অনুদানের টাকায় তো পুরো ছবি হবে না। বাকী টাকার জন্য তাই চলচ্চিত্রকারদের বাজারী সংস্থার সাহায্য নিতেই হবে এবং আবার সেই আপোষ রফার প্রশ্ন এসে যাবে। তাই এ ব্যাপারে কোন সংশোধিত নীতি নেওয়া যায় কি না তাও দরকার। তাছাড়া ছবি মুক্তির জন্য নিয়েগাগৃহের ব্যবস্থা, ইডিও সাবসেক্টরীর বাস্তিক উন্নতির জন্য যেসব প্রকল্প তৈরী হয়ে আছে সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়, তারও ব্যবস্থা দরকার।

সবশেষে আসে ভালো ছবির ব্যাপারে দর্শকের দায়িত্ব ও দর্শক তৈরী করবার কাজ। ভালো ছবি দেখবার চোখ ও লোক তৈরী না হলে ভাল ছবি তৈরী করবার কোন চেষ্টা অর্থহীন। যত বেশি ভালো ছবি দেখবার দর্শক তৈরি হবে এ ধরণের ছবির প্রাণশক্তিও তত বাড়বে। দর্শক তৈরী করবার ব্যাপারে ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিরিশ বছরের প্রচেষ্টায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রথাবদ্ধ শহরাঞ্চলে কিছুটা সংস্কৃতিমনা দর্শক তৈরী করতে পেরেছে এবং এই দর্শক সমাজ একটা মোটামুটি অল্প খরচের ভালো ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। সোজা অঙ্কের হিসেব একটা নেওয়া যেতে পারে। সারা ভারতবর্ষে প্রায় দুশোটি শহরে ফিল্ম সোসাইটি সংগঠন আছে। যদি অল্প খরচের কোন ভালো বাংলা ছবি ইংরিজীতে সাব-টাইটেল করে ফিল্ম সোসাইটি সংগঠনের মাধ্যমে এই দুশোটি শহরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একবার করেও দেখানো হয় তাহলে ছবির খরচের সিংহভাগ উঠে আসতে বাধ্য। এ ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? যারা ভালো ছবি করতে চান বা করছেন, তাঁরা যদি ফিল্ম সোসাইটির কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ধরণের সংগঠনের প্রসারে উদ্যোগী হন, তাহলে বোধহয় ভালো হয়। ফিল্ম সোসাইটিদেরও নিজেদের চিন্তাধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। সংকীর্ণ গণ্ডীর বাঁধনে আবদ্ধ না থেকে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামাঞ্চলে, যাতে বৃহত্তর দর্শক সমাজের মধ্যে সুস্থ রুচি চারিয়ে দিয়ে অসুস্থ রুচির সংক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করা যায়। আর নিছক মনস্তত্ত্বভিত্তিক শিল্প বিচারই নয়, চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধিতে যাতে ঐতিহাসিক এবং সমাজ চেতনার প্রতিফলন ঘটে তার জন্যও সচেষ্ট থাকতে হবে।

শেষে আবার যদি সেই বিষয়ের কথাতে আসি যে বিষয়ে সবচেয়ে বড় কাজের দায়িত্ব কিন্তু সৎ চলচ্চিত্রকারেরই। ভালো ছবি করুন, আরো বেশি করে ভালো ছবি করিয়ে আসুন। কাজটা খুবই কঠিন। পথও মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বাধা বাইরেরও, ভেতরেরও। বাইরের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়তে হবে। আবার নিজের ভেতরকার বিষাদ, প্রলোভনের সঙ্গেও যুঝতে হবে। তবে মাঝে মাঝে কিছু হঠকেও জড়াইয়ে পড়া হবেই। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবীর সব দেশেই প্রগতিশীল ও সৎ শিল্পধারায় বহু অবক্ষয়ীরা।

যৌবনের অগ্রদূত

# মোহন অপেরা

৮৩র নিবেদিত পালা

পৌরাণিক

আনন্দময়ের

## নরমেধ যজ্ঞ

সুর—পঞ্চানন মিত্র

সত্যপ্রকাশ দত্তের

## দেবী ভবানী

সুর—রঘুনাথ দাস ও পঞ্চানন মিত্র

সঙ্গে থাকছে ৮৫-র অবিস্মরণীয় পালা

আনন্দময় রচিত **আদ্যাশক্তি মহামায়া**

—অভিনয়ে—

মলয় মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ, বিবেকরঞ্জন, চিত্ত ঘোষ, সমীরণ চৌধুরী, সৈকতকুমার, বসুদেব সিট, সুখেন মাইতি, রঞ্জিত সাধু, বিকাশ মণ্ডল, বিশ্বনাথ ধাড়া, নন্দদুলাল চ্যাটার্জী, সুবিমল আদক, সব্যসাচী মুখার্জী, গৌড় গুড়, চৈতন্য মোহান্ত, সুনীত রায়, শুভশ্রী ঘোষ, সুপর্ণা নায়েক, জয়শ্রী বোস, কমলা চ্যাটার্জী, নিতা তালুকদার, রেখা বোস, কল্যাণী নন্দী, মিত্রা দাস, মিস ইরা, মিস বেবী ও

নায়িকা শ্রেষ্ঠা **মিতা চ্যাটার্জী**

পরিচালনা ও শ্রেষ্ঠাংশে—পুরাণে পারদর্শী মহাধিনায়ক

# মোহন চ্যাটার্জী

ম্যানেজার—শংকর কোলে

৩০১, রবীন্দ্র সরণী, কোলকাতা-৬ ফোন : ৪৫-৫৪১৩

# বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গতি ও দুর্গতি

## সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সবাক চিত্রের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হতে চলল, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ক্রমোন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রম-অবনতি হতে হতে দুর্গতির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনটি কিন্তু ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বাংলার তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ হয়েও হিন্দি ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প আজ বেশ উন্নত। ডি, পাস্তারাম কিছুদিন আগে কলকাতায় বলেছিলেন, আগের বাংলা ছবি উন্নতমানের বলে বোম্বাইয়ে যে-আদেশ লাভ করত, আজকের বাংলা ছবি আর তা পাচ্ছেনা। তিনি বলেছেন, মূলতঃ মিউজিয়েটার্সের আবেদনে বাংলা ছবি যারা ভারতকে প্রেরণা যোগাত। তিনি আরও বলেছেন, যাত্রাগান ও পাঁচালী ছবির অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ভাল নয়। উড়িয়া, অসমীয়া ছবিও বিশেষ উন্নত নয়। কিন্তু বাংলা ছবির ঐতিহ্য ও গৌরবের তুলনায় উপরোক্ত আঞ্চলিক ছবিগুলি অনেকাংশেই হীনপ্রভ মনে রাখতে হবে। বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের যে ক্রমঘনায়মান দুরবস্থা, তা কিন্তু ঐসব আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্পকে আজও গ্রাস করেনি। বিস্ময়ের কথা এই যে, যে বাংলার ছবি আজ বিশ্বের দরবারে অভিনন্দিত হয়, উচ্চ সম্মানে বরণ হয়, সেই বাংলার মাটিতেই তৈরী হয় গড়ির সংখ্যায় নিকৃষ্টমানের অপকার্য ছবি এবং সেই বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আজ অস্তিত্ব-সংকটের সম্মুখীন! 'ঘরীপের নীচেই অন্ধকার'—এই আপ্তবাক্য কত না সত্য এবং কতই না নিষ্ঠুর!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির অন্যতম মুদ্রাস্ফীতি যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের মূলে যেমন আঘাত করে, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মূল্যবোধের ওপরও আঘাত হানে। এই সময় থেকেই দেখা যায়, এই চলচ্চিত্রশিল্পে বহু অজানা অযোগ্য লোকের আনাগোনা। হাতে তাদের অঢেল পয়সা—ছবির ব্যবসায়ে লগ্নী করে তাড়াতাড়ি আরও পয়সা কামিয়ে মনের নানা গোপন বাসনা চরিতার্থ করতে তারা চায়। আবার অনেকে ছবি করতে এসে ব্যবসা ভাঙিয়ে হয়ে যায়। এটা যে একটা শিল্প—ইণ্ডাষ্ট্রীও বটে, আর্টও বটে—এ খেয়াল তাদের থাকে না—থাকার কথাও নয়। তারা আসে বেরিয়ার মন নিয়ে—শিল্প-প্রেরিক হয়ে নয়। এবং এই শিল্প আর্টের ওপর যান্ত্রিকতার যা পরিণতি হবার, তাই হয়!

এই সময়ই আরও দেখা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধির যুগে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বোম্বের চিত্রজগতের দুতা চলনের হাতছানিতে বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন বেশী রোজগারের লোভে। এমনকি নীতিন বসু, দক্ষী মজুমদার, বিমল রায়ের মত পরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্রকারকে বোম্বের চিত্রজগতের শিকার হতে হল। কিন্তু শত প্রলোভনের মাঝেও প্রমথেশ বড়ুয়া ও দেবকী বসু বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। এই দুই দিগ্গজ চলচ্চিত্রকারকে দেখেও বাংলা ছবির উদ্যোক্তারা শিক্ষা নিলেন—কারণ তাঁদের পরীক্ষাধর্মী ছবিগুলি [illegible] তাঁদের এই মনে প্রাণে অনেকেরই অর্থাগমে সহায়তা করল শুধু তাই নয়, ইতিহাসে তা স্বীকৃত হয়ে রইল বাংলার অসামান্য চলচ্চিত্র প্রেমিকদের রূপে।

বেশ স্বাধীন চলা বিধিবদ্ধ হয়ে বাংলা ছবির বাজার সংকুচিত হল। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই বাংলা ছবির প্রসার। সেই সীমিত বাজার আরও ছোট হয়ে বাংলা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যকে করে তুলল অনিশ্চিত। অথচ বাংলা ছবির বাজারকে শুধু সংকীর্ণ করে তুলল, তাই নয়, বোম্বের বিকৃত রুচির হীনতম বিষ্ঠুর অন্ধকারে হিন্দি ছবির হাপাহাপিতে বাংলা ছবি বিক্রি ঘুচিয়েই ক্রমশঃ লোকসানের হয়ে পড়ল। বাংলা ছবির ব্যবসায়ে তখন এল শুধু লোকসানের পালা। যেখানে বাংলা ছবির বছরে তৈরী হত প্রায় পঞ্চাশখানা—সে সংখ্যা ক্রমেই কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। ষ্টুডিওগুলি জনহীন হয়ে পড়ল। প্রমিক কর্মচারীরা হল বেকার।

আগেকার দিনে প্রতিটি ষ্টুডিওই চিত্র প্রযোজনার ব্যবস্থা করত—এখনকার মত শুধু ভাড়া খাটত না। নিউ থিয়েটার্স, বাণী কিন্নর, ভারতলক্ষ্মী, ভাদী কিন্নর ইত্যাদি ষ্টুডিও নিয়মিতভাবে চিত্রপ্রযোজনা করত।

নিউ থিয়েটার্স ছিল সে যুগের সেরা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ছবি তৈরী হত। একই সেটে বিভাষী ছবি করার ফলে ছবির প্রোডাকশন খরচও কম হত। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বাংলা ছবি চলত—আর বাকী দেশের বিরাট বাজার দখল করত হিন্দি ছবিগুলি। ফলে নিউ থিয়েটার্স তথা বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অবস্থা খুবই সমৃদ্ধিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তদুপরি ছিল নিউ থিয়েটার্স চিত্রের এক বিশেষ গুণগতমান। তাদের 'হাউসফুল' ছবি দেখার জন্য সারা ভারতের চিত্রামোদীর দল সারা বছরই উন্মুখ হয়ে থাকত। সেই নিউ থিয়েটার্স ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে গেল নানা কারণে। বহু গুণী শিল্পীকে তাড়িয়ে দিল বোম্বের চলচ্চিত্রলোক। প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলেও কিছু বিখ্যাত শিল্পী ও কলাকুশলী বাইরে চলে এলেন। ছবির মানও আর বজায় থাকল না—ছবির পর ছবি ফ্লপ হতে লাগল—নিউথিয়েটার্স বন্ধ হয়ে গেল। অন্য ষ্টুডিওগুলোর দরজাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল ছবির ব্যবসায়ে সাফল্যের মুখ দেখতে না পেয়ে। একদা অর্ধশতাধিক ষ্টুডিও কলকাতায় বন্ধ হতে হতে আজ মাত্র গুটিতে এসে ঠেকেছে।

চলচ্চিত্র যেহেতু আজও কাহিনী নির্ভর সেই হেতু কাহিনীর জোগাড়টা না থাকলে ছবি সচরাচর দর্শকমনে দাগ কাটেনা। অবশ্য কিছু অভিজিৎকর কাহিনী নিয়েও শক্তিমান পরিচালক ছবিকে দর্শকের দরবারে সসৌরবে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সেধরনের শক্তিধর পরিচালক এরাজ্যে আর ক'জন আছেন? সাধারণ মানের পরিচালক, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁদের প্রথমেই লক্ষ্য রাখা উচিত এমন কাহিনী নির্বাচনের দিকে, যা দর্শক চিত্তে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট কাহিনীর তো অভাব নেই—তবে কেন এই বৈদেশিক চলচ্চিত্র কাহিনীতে? অবশ্য উৎকৃষ্ট কাহিনীর উপরই চিত্রনাট্য রচনার অবকাশ থাকতে হবে চিত্রনাট্যকারের—নইলে কাজে কিছুই লাগবে না। চলচ্চিত্র পরিচালনার যোগ্যতার প্রশ্নটা কিন্তু দুরূহ। বস্তুতঃ অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়েই সম্ভাব্য বাংলা ছবি আজ প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। এই মার খাওয়া কিন্তু শুধু অর্থের দিক থেকে নয়—গুণগত মানের দিক থেকেও। এক শ্রেণীর পরিচালক আছেন, যাঁরা বিদেশীকে কদর্যিয়ানা ছবি করিয়ে বলে প্রমাণ করেন। শিল্প গড়ের কোন ধার না ধেরে, বাস্তব যুক্তির কোন পরোয়া না করে তাঁরা আবেগ আর উচ্ছ্বাসের মিশ্রণে কিছু গানের পসরা সাজিয়ে অনাসৃষ্টি ছবি বানিয়ে বাজিমাৎ করতে চান। মাঝে মাঝে তাঁরা জিতেও যান ছবির ফাটকাবাজিতে। যেন তেন প্রকারেণ অর্থাগমবৃত্তির বেসাতি করে ছবির ব্যবসা চালানোটা নিশ্চয়ই কোন সৎ লক্ষণ নয়!

চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্প। বহুজনের পরিশ্রমে ও সাহায্যে একটি ছবি তৈরী হয়। এর সঙ্গে অর্থলগ্নীর পরিমাণও বিরাট। সুতরাং প্রযোজক বা চলচ্চিত্র নির্মাতা চলচ্চিত্র তৈরী করে বাজার থেকে লগ্নীকৃত অর্থ মুনাফা সহ তুলে নিতে স্বভাবতই চাইবেন। সুতরাং চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকি একটা থাকেই। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে চলচ্চিত্রকে যদি একই দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে সেটা নেহাতই অসঙ্গত ও গর্হিত কর্ম বলেই গণ্য করতে হয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে—চলচ্চিত্র শুধু ইণ্ডাষ্ট্রিই নয়, আর্টও বটে। এই শিল্প ব্যবসায়ে তাঁদের আগ্রহই সুসংহত ও শুভফল হয়ে ওঠে, যাঁরা শিল্পরসিক ও সংগে সংগে চলচ্চিত্র প্রেমিক। বেশ্যাবৃত্তিতে অধিক উপার্জন হয় বলে সতীত্ব হারাবার মত কিন্তু কখনো গরিমা হারায় না—চিরদিনই তা বরণীয় মহিমায় উজ্জ্বল থাকে। শিল্পে বেশ্যাবৃত্তি ভয়ংকর—এবং চলচ্চিত্রশিল্পে এর অভ্রান্ত ছায়া প্রলম্বমান!

ভারতে অবাক লাগলেও এটা নিছক সত্য যে, স্থানীয় বাজারে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের ছবির থেকে যুগের হাওয়ার ছবি অধিক জনপ্রিয়! এ থেকেই স্পষ্ট হয়, এ রাজ্যের সাধারণ দর্শক সমাজের কিম্বা অ্যাপ্রিসিয়েশনের ক্ষমতা কত দূর। ব্যাঙের ছাতার মত গাঁয়ে গঞ্জে উঠেছে পঞ্চ ও পঞ্চায়েতীতে ফিল্মক্লাবগুলি, যাদের কর্তা ও উদ্যোক্তা হল ভাল ছবি কাকে বলে প্রাথমিক জ্ঞান সহ উপলব্ধি করানো। কিন্তু তার সুফল তো এখনো কিছু নজরে পড়ল না—যৌনউত্তেজক নিম্নরুচির অশ্লীল ছোঁয়াচেরা হিন্দি ছবি দেখার হিড়িক এখানের বাড়িতেই ক্রমবর্ধমান—আর বাংলা ছবির সেই অবাস্তব ভাবাবেগের জোয়ারে দর্শককুলের ভেসে যাওয়ার পরম নিশ্চিন্ততা। এই পরিস্থিতিতে গুটি কয়েক মানসিক স্তরে বিচরিত ছবির শ্রেষ্ঠ অন্বেষণে রোদন ছাড়া উপায় কি! কিন্তু এভাবে তো একটা শিল্প সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তার জন্য চাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। অযোগ্য শিল্পরুচিহীন ব্যক্তিদের হটিয়ে দিয়ে যোগ্য শিল্প প্রেমীদের হাতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের হালিশ ন্যস্ত করতে হবে। আবেদন ধর্মী শিল্পোত্তীর্ণ ছবি তৈরীর বাধা অব্যাহত রেখে দর্শক সাধারণের রুচিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ প্রচেষ্টায় দেশের চলচ্চিত্র প্রেমিক অর্থবানদের যেমন প্রধান ভূমিকা নিতে হবে, তেমনি সরকারী আনুকূল্য ও সদুদ্যোগিতাও অপরিহার্য। অবশ্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার উদ্যোগী চলচ্চিত্র নির্মাণকল্পে অনেকটা

উৎপন্ন হয়ে উঠেছেন। বিগত যুগের নিউ থিয়েটার্সের মত এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই একই ছবির বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ নির্মাণের প্রথা পুনরায় প্রচলন করলে স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্প অনেকটা উপকৃত হতে পারবে।

অধুনা চলচ্চিত্র ব্যবসায় প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী—এই ত্রিস্তরে বিভক্ত। এ রাজ্যে এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের একান্তই অভাব। প্রযোজক ছবি-প্রযোজনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পরিবেশকের কাছ থেকে মোটা সুদে টাকা ধার নেন। পরিবেশক ছবি পরিবেশনার স্বাধিক নিয়ে প্রচার ও রিলিজ চেনের ব্যবস্থা বাবদ মোটা টাকার অঙ্ক সেই ঋণদানের সঙ্গে যোগ করে ছবির মোট খরচ শেষ পর্যন্ত একটা স্ফীত অঙ্কে দাঁড় করান এবং ছবি মুক্তি পাবার প্রথম দেখ করেক সপ্তাহে যে উপার্জন হয় প্রদর্শকের দাবী মিটিয়ে, তা দিয়েই প্রহণ করেন প্রযোজককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। পরিবেশকের মোটামুটি খরচ উঠে যাবার পর, ছবি যদি তখনো চলে, প্রযোজক তখনই টাকার মুখ দেখতে পান। ঋণদানের সুযোগ নিয়ে পরিবেশকের এ জাতীয় শোষণ-প্রথা বন্ধ করতে না পারলে প্রযোজক শুধু বঞ্চনারই শিকার হবেন ও পুনরায় ছবি প্রযোজনা করতে উৎসাহ হারাবেন। উপরোক্ত তিন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রদর্শক কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ—তাঁর কোন ঝুঁকি নেই। তিনি তাঁর প্রেক্ষাগৃহ সপ্তাহ ভিত্তিক নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেন এবং সংগে সেস হিসাব বহির্ভূত কালোটাকা প্রচুর পরিমাণে সেবন পাবেন। তাঁর দাবী না মানলে ছবির মুক্তি পিছিয়ে উঠবে। তাঁদের খাই মেটাতে মোদের হিন্দি ছবির পরিবেশকরা সব সময়ই সক্ষম, কারণ তাঁদের পাল্লা সারভারতীয় মাত্রায়—আর অপরিমিত। এই হিন্দি ছবিওয়ালারা যে কারণেই কলকাতায় অধিকাংশ সিনেমা-হল দখল করে থাকে। এই অসম প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ছবল বাংলা ছবি প্রদর্শনের সুযোগ থেকে অনেক সময়ই বঞ্চিত হয়। সিনেমা হলের মালিকদের এই অজ্ঞায় দাবী ও আবদারের ফলে বছরের পর বছর বাংলা ছবি মুক্তি না পেয়ে কত যে বাক্সবন্দী হয়ে ইঁদুরের পেটে আছে, তার হিসেব আর কখন রাখেন! ফলে সেই সব আটক ছবির প্রযোজকরা সুদের টাকা গুনতে গুনতে নাকেদড়ি হয়ে ছবির ব্যবসায়ে নিষ্কৃতকাম হয়ে পড়েন। অর্থলোভী প্রদর্শকদের এই অন্যায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে উৎকৃষ্ট ছবি করেই বা লাভ কোথায়। ছবি যদি মুক্তি না পায়, তবে তো সবই জলাঞ্জলি। তাই চাই সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। সরকারী প্রচেষ্টায় আরও নতুন নতুন সিনেমা হল তৈরী করাটা বিশেষ দরকার। বাংলা ছবির বড় মুক্তিদাবের ব্যবস্থা করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

চলচ্চিত্রে তারকা প্রথা আর এক সমস্যা। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা তারকা খচিত ছবির মুক্তিদাবে বিশেষ আগ্রহী থাকেন—কারণ এ জাতীয় মোটা বাজেটের ছবি যারা করেন, তাঁরা প্রদর্শকদের প্রচুর পরিমাণে কালো টাকা দিতে কার্পণ্য করেন না। পরিবেশকরাও তারকাখচিত ছবির জন্য প্রযোজককে টাকা ধার দিতে সদাই প্রস্তুত থাকেন—কারণ তাতে তাঁদের সুবিধা সুনিশ্চিত হয়। আর তারকা প্রথার ফলে ছবির প্রোডাকশন খরচ অনেক বেড়ে যায়, যার পরিণতি তখনই শুভ হয় না। যদি তারকাদের পেছনেই মোটা টাকা খরচ হয়ে


প্রকাশিত হল

এ কালের অন্যতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী

## মিহির আচার্যের

# নির্বাচিত গল্প ১৬·০০

মিহির আচার্য নিছক গল্প লেখেন না। জীবন সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব একটি বক্তব্য আছে। তাঁর গল্পগুলি বিশেষ বক্তব্যের বাহন। সব লেখকের জীবনের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে গল্পগুলি তারই নিদর্শন। জীবন লীলা ও তত্ত্বে দার্শনিক সুষমামণ্ডিত।

অন্যান্য গ্রন্থ

জীবন নিরবধি ১৬·০০ পৃথিবীর বয়স ১৪·০০

দ্বিরাগমন ১০·০০ ধূসর পদাতিক ৮·০০

জোনাকির আলো ৮·০০

পরশুরামের কুঠার ১০·০০

চতুষ্কোণ ॥ ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

যায়—বলিত হন অজাত চরিত্রশিল্পী, কলা-কুশলী আর নবাই। যে প্রথায় ওটি কয়েক শিল্পী অতিমাত্রায় লাভবান হন ও তাঁদের নিয়ে মুনাফাবাজদের মধ্যে কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়—তা অবশ্যই বরদাস্ত করা যায় না—এ শিল্পের পক্ষে তা চরম অবলম্বনক। এই তারকাপ্রথায় অবসান যত দীঘ হয় তত্তই মঙ্গল এবং এ ব্যাপারে চলচ্চিত্র বিশ্বাতাদের সচেতন হতে হবে অবিলম্বে। বাজারে আবহমান কাল ধরে চলিতগুলির সুসংহতার অবিলম্বে প্রয়োজন। ইন্টিও ও ল্যাবরেটরীর আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল ও প্রমিক অশান্তি দূর করে শিল্পে শান্তি ও সুস্থ আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হবে। আজও এই শিল্পে বিযুক্ত প্রমিক কর্মচারীদের বেতন, মহার্ঘভাতা, প্রভিডেন্টফণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও নিয়ম নীতি নেই। সেই শোষণ আর অত্যাচার আজও সমানে চলছে। পুঁজিপতির এ দৌরাত্ম্য আর কতদিন বরদাস্ত করবেন এই বাঙালই সরকার? এই শিল্প থেকে প্রযোজকরা যাবার তাঁদের আর কম হয় না। এ শিল্পকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য হয়ে থাকার কথা নয়।

এ শিল্পের সুরক্ষার পক্ষে শত শত প্রমিক কলাকুশলী নগদিবার আশা ছেড়েছেন। শুধু আলোচনা পরিবর্তনার কথাই বেশি করে শোনা যায়—কাজের কাজ কিছুই প্রায় লক্ষ্যে পড়ে না। আজও কাঁচা ফিল্মের অভাবে অনেক সময়ই ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়—লোডশেডিং-এর উৎপাতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী বাতিল করে দিতে হয়। এ সবের কারণে প্রযোজকের অর্থের অপচয় হয় যথেষ্ট। আজকাল দর্শকদের পছন্দ হলীল ছবি—তাই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে নীতিহত করতা নিয়েই বাংলা ছবির বিশ্বাতাকে ছবি হলীল করতে ছুটতে হয় বোধে বা মাদ্রাজে। এখানে কোন 'কালার ল্যাব' আজও গড়ে উঠল না। ফলে ছবির প্রোডাকশন খরচ বেড়ে যায় এবং সে খরচ ছবি রিলিজ হয়ে বাজার থেকে তুলতে প্রযোজকদের হিমসিম খেতে হয়। ছবি চলল, ধরলে তিনি আর ছবি করবেন কেন? এজন্যেই ছবির সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। যাঁর হাতে কালো টাকা আছে, তিনি অবশ্য শখ মেটাতে ছবি করতে আসেন। কিন্তু কালো টাকা ফুরোলেই তাঁর শখও মিটে যায়—ছবি তোলারও ইতি হয়। এজন্যেই নিত্য নতুন লোক প্রযোজক সেজে ছবি করতে আসেন এবং একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে। আবার মরশুমি ফুলের মত একটা ছবি করেই তিনি বিদায় নেন। এতে যা আছে মিষ্টা, না আছে ধরছ। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পরিবেশায় এটাও এক দুর্গতির নিদর্শন বয়!

---

প্রকাশক—হীরেন বসু। প্রকাশক কর্তৃক হীরালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, ঘট লেন, কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

# এই এক সময়

আকাশে সাদা মেঘের নিরুদ্দেশ
যাত্রায় মন দেশান্তরী। কখনও
বা প্রিয়জন মিলনে ব্যাকুল।

এই এক সময়। যখন স্নেহ ও
ভালবাসায়, উৎসব ও
উজ্জ্বলতায় নিমগ্নি আনন্দঘন।
প্রকৃতি সুন্দর।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

1919-1979

Protection...in diverse areas.
Protection, in diverse areas, is our mission.
For that sole purpose, we have rallied our entire strength. And our efforts have been rewarded by steady, broad-based growth, and an ever-expanding range of quality products.
Our high-efficiency Material Handling systems, the first Indian venture of its kind, protect against waste and dispersal of materials and investments in industry.
Our sophisticated Fire Fighting & ancillary equipment are unique tactical weapons that protect life and property.
Our latest venture, Drugs & Pharmaceuticals, offers protection from sickness and disease through an ever-expanding product spectrum.
In our Diamond Jubilee year, our shield is no longer alone in its mission. It has the support and confidence of people in many areas.
People who believe in protection.

**ROBERTS, McLEAN & CO. LTD.**

(Incorporated in India in 1919)
Drugs & Chemicals Division Regd. Office 27-B Camac Street, Calcutta-700016
Regional Offices : CALCUTTA BOMBAY NEW DELHI MADRAS

ACI/RM/3-79